

# আমালুস সুন্নাহ

মুফতী মনসূরুল হক

[www.darsemansoor.com](http://www.darsemansoor.com)



মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. -এর

দীনী সংস্কার

## ‘আমালুস সুন্নাহ

সংকলন

মুফতী মনসূরুল হক সাহেব

বিশিষ্ট খলীফা:

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.  
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আকাইদ, ইবাদাত, মু‘আমালাত, মু‘আশারাত, আত্মশুদ্ধি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দীনী  
বিষয়ে সংস্কারমূলক হেদায়েতের অপূর্ব সম্ভার



মাকতাবাতুল মানসূর

[www.darsemansoor.com](http://www.darsemansoor.com)

## সংকলকের কথা

আল্লাহ পাক তাঁর দীনের প্রচার-প্রসার ও খেদমতের জন্য প্রতি যুগে এমন কিছু মানুষকে নির্বাচন করেন, যাদের ফয়েয ও বরকতে কেবলমাত্র সে যুগের মানুষই উপকৃত হয় তা নয়, বরং পরবর্তী যুগের লোকেরাও তাদের মাধ্যমে উপকৃত হয়, তাদের ইলমের আলোতে আলোকিত হয়।

ইসলামের অতীত ইতিহাস এ ধরনের বরণ্য ব্যক্তিত্বদের আলোচনায় পূর্ণ। আমাদের নিকট অতীতে এ উপমহাদেশে হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. ও তার খুলাফায়ে কেরাম এ কাফেলারই অগ্রপথিক ছিলেন। এ সকল ব্যক্তি বর্ণের মধ্যে সর্বশেষ যিনি বিদায় নিয়েছেন তিনি হলেন, মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ.। তিনি কেবলমাত্র উলামায়ে কেরামের জন্যই দীনী মুরুব্বী ছিলেন এমন নয় বরং তিনি উলামা, তলাবা, বিশেষ ও সাধারণ সকল শ্রেণীর মুসলমানের জন্যই বিরাট নিয়ামত ছিলেন।

হযরত মুহিউস সুন্নাহ রহ. দীনের বিভিন্ন শাখায় যে সংস্কারমূলক অপূর্ব খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা কারো অজানা নয়। তাঁর দীনী সংস্কারের প্রভাবেই আজ এ উপমহাদেশের মসজিদ-মাদরাসা মাহফিল-মহল্লায় সুন্নতের চর্চা হচ্ছে। সকল ওয়ায়েজ ও খতিবের আলোচনায় সুন্নাহ প্রসঙ্গে আবশ্যিক অনুষঙ্গ হয়েছে।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থ “মুহিউস সুন্নাহ রহ. এর দীনী সংস্কার আ‘মালুস সুন্নাহ”। হযরত রহ.-এর সংস্কারমূলক দীনী খেদমতের আলোকে রচিত সমাজের প্রয়োজনীয় প্রায় অর্ধশতাধিক বিষয়ে শর‘ই দিক নির্দেশনা। এটাই হযরতের সংস্কারমূলক দীনী কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক চিত্র নয়, বরং অতি সামান্য ও আংশিক চিত্র মাত্র। কেননা হযরতের দীনী সংস্কারমূলক কর্মের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। আরেকটি বিষয়ও অনস্বীকার্য বাস্তবতা। আর তা হলো হযরত রহ. ইলম-আমল, তাক্বওয়া-পরহেযগারী, দীনী বুঝ ও অনুভূতি সকল দিক দিয়েই অনেক উর্ধ্বের মানুষ ছিলেন। তাই অধম একথা নিঃসঙ্কোচে বলছি যে, হযরত রহ.-এর তা‘লীমের আলোকে যদিও এ সকল পারচা সংকলিত হয়েছে, হতে পারে সকল ক্ষেত্রে হযরত রহ. এর উদ্দেশ্য অনুধাবনে আমি সামর্থ্য হইনি। অতএব এর উত্তম ও সঠিক বিষয়গুলো হযরতের দিকেই সম্পৃক্ত হবে। আর আল্লাহ না করুন কোন ধরনের ত্রুটি হয়ে থাকলে সেটা আমার ভুল মনে করে আমাকে অবগত করলে ইনশা-আল্লাহ তা শুধরে নিবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

এ পুস্তকখানা প্রকাশের উদ্যোগ ঐ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে নেয়া হয়েছে যাদের হাতে আমাদের এ সকল পারচা পৌঁছার পর তারা এর দ্বারা

উপকৃত হয়েছেন এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে উপকারিতা ব্যাপক হবে বলে মনে করেছেন। প্রকাশের উদ্যোগ অনেক আগে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের জন্য আল্লাহ পাক সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। সে সময়ের অগ্র-পশ্চাত হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। যাই হোক আমার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থের প্রকাশক আমার স্নেহস্পন্দ শাগরিদ মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান (আল্লাহ পাক তাকে ও তার প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফকে আকাবিরের ফয়েয ও বরকত পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার তাওফীক দান করুন।) ইদানিং অতিব্যস্ত জীবন কাটাচ্ছে। (যদিও তার সকল ব্যস্ততা দীনী কাজের জন্যই।) কিতাবখানা প্রকাশনা ছাড়াও সংশোধন ও অঙ্গসজ্জার কাজ তার উপরই ন্যস্ত ছিলো। যার দরুন একটু বেশী সময়ই আগ্রহী পাঠকের ধৈর্য ধরতে হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

কিতাব সংকলনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার কয়েকজন শাগরিদ ও সহকর্মী আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

মানুষের কর্মে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। অনেকগুলো প্রুফ দেখা ও বার বার সংশোধন করার পরও হয়তো কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে গেছে। সুধী পাঠক সে সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দিলে আমরা পরবর্তীতে তা সংশোধন করে নিবো। ইনশা-আল্লাহ।

এ কিতাব যেন আমাদের সকলকে দীনের সঠিক মাসআলা জানা ও মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের আমল করার ব্যাপারে রাহনুমায়ী করতে পারে এ মর্মে সকলের নিকট দু‘আর আবেদন করছি।

আল্লাহপাক আমাদের এ সামান্য খেদমতটুকু কবুল করে আমাদের জন্য নাজাতের উছীলা বানান। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুফতী মনসূরুল হক

প্রধান মুফতী, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

তারিখ: ২৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ হিজরী

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: ঈমান ও আক্বীদা	১১	একবিংশ অধ্যায়: বিবাহ-শাদী	১৭৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: কুফর, শিরক ও বিদ'আত	৩৫	এক বিংশ অধ্যায়: জায়েয-নাজায়েয	১৮০
তৃতীয় অধ্যায়: মারাত্মক কিছু গুনাহ	৪১	শরী'আতের দৃষ্টিতে দাঁড়ি	১৮০
কুরআনের প্রতি জুগুম	৫১	চাখনুর নীচে কাপড়	১৮৩
চতুর্থ অধ্যায়: কুরআন শরীফ	৫১	দ্বাবিংশ অধ্যায়: শরী'আতের দৃষ্টিতে পর্দা	১৮৫
পঞ্চম অধ্যায়: নামায	৫৪	ত্রয়োবিংশ অধ্যায়: মোবাইল ও টেলিফোন	১৮৮
জামা'আতের সাথে নামায	৬৪	চতুর্বিংশ অধ্যায়: টিভি-ভি সি আর	১৯১
ষষ্ঠ অধ্যায়: মসজিদের মাসাইল	৬৯	পঞ্চবিংশ অধ্যায়: আখলাক ও আত্মতত্ত্ব	১৯৮
সপ্তম অধ্যায়: কাফন-দাফনে বর্ণনীয় কাজ	৮৭	ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়: অহংকার বর্জন ও বিনয় অর্জন	২১০
আহকামে শহীদ	৯৪	সপ্তবিংশ অধ্যায়: হুক্মানী উলামায়ে কেরাম	২১৩
অষ্টম অধ্যায়: ঈদের চাঁদ	৯৯	অষ্টবিংশ অধ্যায়: চিঠি লেখার নিয়ম	২১৭
নবম অধ্যায়: রোযা	১০২	ঊনত্রিশতম অধ্যায়: খুলাফায়ে কেরামের তালিকা	২১৮
তারাবীহ নামায	১০৭	ত্রিশতম অধ্যায়: দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২২২
দশম অধ্যায়: আন্তরাঃ তাৎপর্য	১১৫	দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব	২২৪
একাদশ অধ্যায়: শবে মি'রাজ	১১৯	একত্রিশতম অধ্যায়: হযরত থানভী ও ইলিয়াস রহ.	২২৭
দ্বাদশ অধ্যায়: শবে বারা'আত	১২৩	বত্রিশতম অধ্যায়: ওয়াজ মাহফিল তরীকা	২৩১
ত্রয়োদশ অধ্যায়: শবে কুদর	১২৭	তেত্রিশতম অধ্যায়: ছাত্র রাজনীতি	২৩৫
চতুর্দশ অধ্যায়: তোহফাতুল হুজ্জাজ	১৩২	চৌত্রিশতম অধ্যায়: অমুসলিমদের প্রতি আবেদন	২৪০
মহিলাদের হজ্জের পার্থক্য	১৩৮	পয়ত্রিশতম অধ্যায়: মুসলিম মহিলাদের জন্য বাণী	২৪২
পঞ্চদশ অধ্যায় : কুরবানী	১৩৮	ছয়ত্রিশতম অধ্যায়: মহিলাদের দায়িত্ব-কর্তব্য	২৪৭
ষোড়শ অধ্যায়: যাকাত	১৪৪	সাতত্রিশতম অধ্যায়: উলামাদের দায়িত্ব	২৫৬
সপ্তদশ অধ্যায়: কতিপয় জরুরী আমল	১৫১	আটত্রিশতম অধ্যায়: দীনের দায়ীর পরস্পর সম্পর্ক	২৫৭
অষ্টাদশ অধ্যায়: হারদই হুজুরের বাতানো আমল	১৬২	ঊনচল্লিশতম অধ্যায়: মুহিউ'স্সাহর রহ. জীবনী	২৬৩
ঊনবিংশ অধ্যায়: শরী'আতের দৃষ্টিতে বেচা-কেনা	১৬৬	চল্লিশতম অধ্যায়: বিবিধ দীনী বিষয়	২৭০
বিংশ অধ্যায়: মাতা-পিতার হক	১৬৬	পাঠদানের কতিপয় উসূল	২৭৩
পিতা মাতার দায়িত্বে সন্তানের হক	১৭২	শিক্ষকের দায়িত্ব	২৭৭
স্বামী-স্ত্রীর হক	১৭২	বাচ্চাদের শাসন করার শর'ই পদ্ধতি	২৭৯
	১৭৩	ঈদের মাসআলা-মাসাইল	২৮৬

## প্রথম অধ্যায়

### ঈমান ও আক্বীদাহ

**ভূমিকা:** ঈমান অতি মূল্যবান একটি জিনিস। ঈমানকে পাকা-পোক্তা করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই জরুরী। কারণ ঈমান ঠিক না করে সারা জীবন নেক আমল করলেও আখিরাতে কোন লাভ হবে না। সহীহ ঈমানের সাথে আমল দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়দা পৌছায়। আর আমল ব্যতীত শুধু ঈমানও ফায়দা দেয়। কারণ, এমন ঈমানদার, যার কোন নেক আমল নেই, সেও কোন এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল দুনিয়াতে কিছু ফায়দা পৌছালেও (যেমন: তার সুনাম হয় বা ব্যবসা বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে ইত্যাদি, কিন্তু) আখিরাতে ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল কোনই কাজে আসবে না।

ঈমান-আক্বীদার বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে জানা থাকা জরুরী। যাতে ফিতনা ফাসাদের যুগে ঈমান রক্ষা করা সহজ হয়। হাদীস শরীফে আছে, ফিতনার যামানায় অনেক মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফির হয়ে যাবে। (তিরমিযী শরীফ হা: নং ২২২, মুসলিম শরীফ হা: নং ১১৮)

অর্থাৎ, লোকের ইলমে দীন শিখবে না, হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখবে না, অপরদিকে বদদীনীর সয়লাব ব্যাপক হয়ে যাবে। এমনকি দীনের নামে কুফর ও শিরকের প্রচার করা হবে, তখন মানুষ না বুঝে কুফরকে দীন মনে করে গ্রহণ করে কাফের হয়ে যাবে।

এজন্য নিম্নে ঈমান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো, যাতে আমরা সে অনুযায়ী ঈমানকে দৃঢ়-মজবুত করতঃ ফিতনা-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

(তরজমা) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান আনয়ন করেছেন ঐ সকল বস্তু সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর নবীগণের প্রতি। তাঁরা বলেন, আমরা তাঁর নবীগণের মাঝে কোন পার্থক্য করি না এবং তাঁরা আরো বলেন, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই, ওহে আমাদের পালনকর্তা। আমরা সকলেই আপনার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা বাকার, আয়াত:২৮৫)

“যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপরে এবং তাঁর রসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে”। (সূরা নিসা, আয়াত:১৩৬)

হাদীসে জিবরাঈলে উল্লেখ আছে, হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ছদ্মবেশে এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঈমান কাকে বলে? জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ঈমানের হাকীকত হলো, তুমি মনে-প্রাণে বদ্ধমূলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ তা‘লার উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, আসমানী কিতাবসমূহের উপর, আল্লাহ তা‘লার নবী-রসূলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হওয়ার উপর। (বুখারী হাদীস নং-৫০ ও মুসলিম শরিফ, হাদীস নং-১)

উল্লেখিত আয়াত ও অতি প্রসিদ্ধ হাদীসটি ‘ইমানে মুফাসসাল’-এর ভিত্তি। ঈমানে মুফাসসালের মাধ্যমে এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি জানানো হয় এবং মনে প্রাণে বদ্ধমূল বিশ্বাসের ঘোষণা করা হয় যে, আমি ঈমান আনলাম বা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করলাম- ১. আল্লাহ তা‘আলাকে, ২. তাঁর ফেরেশতাগণকে, ৩. তাঁর প্রেরিত সকল আসমানী কিতাবসমূহকে, ৪. তাঁর প্রেরিত সকল নবী-রসূলকে, ৫. কিয়ামত দিবসকে অর্থাৎ, সমস্ত বিশ্বজগত একদিন শেষ হবে, তাও বিশ্বাস করি, ৬. তাকদীরকে বিশ্বাস করি অর্থাৎ, জগতে ভাল-মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা‘আর সৃষ্টি, তারই পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং ৭. মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন পুনর্বীর জীবিত হতে হবে, তাও অটলভাবে বিশ্বাস করি।”

উল্লেখিত ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৭নং বিষয় ৫নং বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রশাখা। তবে তার বিশেষ গুরুত্বের কারণে তাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো ঈমানের আরকান বা মূলভিত্তি। ঈমানের এ বিষয়গুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা জরুরী। ঈমানের এ বুনিয়াদী বিষয়গুলো সামনে ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা হচ্ছে-

**ঈমানের সংজ্ঞা:** আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলিল দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে তার কোন একটি বাদ না দিয়ে সবগুলোকে মনে-প্রাণে বদ্ধমূলভাবে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা‘আলার আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে এবং পূর্ণভাবে আমল করার মাধ্যমে ঈমান কামেল বা শক্তিশালী হয়।

আর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন ক্রটি করলে ঈমানের নূর নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে এবং তাওবা না করলে (আল্লাহ না করুন) ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এখান থেকে ঈমানে মুফাসসালে বর্ণিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

## ১. আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান

আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোন প্রকার অংশ বা অংশীদার বা শরীক নেই, তাঁর কোন কিছুর অভাব নেই। তিনিই সকলের সব অভাব পূরণকারী। তিনি কারো পিতা নন, পুত্রও নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। কোন জ্ঞান বা চক্ষু আল্লাহ তা‘আলাকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কোন মা’বুদ নাই। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।

সারকথা, আল্লাহ তা‘আলার বিষয়ে তিনটি কথা অবশ্যই মানতে হবে।

ক. তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। সৃষ্টিজীবের সাথে তাঁর কোন তুলনা হয় না।

খ. তাঁর অনেকগুলো অনাদি-অনন্ত সিফাত বা গুণ আছে, সেগুলো একমাত্র তারই জন্যই নির্ধারিত। সেসব গুণের মধ্যে অন্য কেউ শরীক নেই। যেমন, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, হায়াত-মওতদাতা, বিধানদাতা, গায়েব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। অন্য সব কিছুই ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল, কিন্তু তাঁর ক্ষয়ও নেই, ধ্বংসও নেই। সবকিছুর উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সবকিছুর উপরই তাঁর ক্ষমতা চলে। আল্লাহ তা‘আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, সব-ই তার মুখাপেক্ষী।

তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি আগুনকে পানি এবং পানিকে আগুন করতে পারেন। এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান, তিনি হুকুম করলে মুহূর্তের মধ্যে এসব নিস্তানাবুদ হয়ে যাবে।

তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি জানেন না-এমন কিছুই নেই। মনের মধ্যে যে ভাবনা বা কল্পনা উদয় হয়, তাও জানেন। তিনি সবকিছুই দেখছেন। সবকিছুই শুনছেন। মূদু আওয়াজ এমনকি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ আওয়াজও তিনি শুনেন। গায়েবের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেন না। এমনকি নবী-রসূল এবং অলীও গায়েব জানেন না। আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র হাযির-নাযির। তিনি ছাড়া আর কেউ হাযির-নাযির নন। এমনকি নবী-রসূল এবং অলীও। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। কোন পীর, ওলী, পয়গম্বর বা ফেরেশতা তাঁর ইচ্ছাকে রদ ও প্রতিহত করতে পারে না। তিনি আদেশ ও নিষেধ জারি করেন।

তিনিই একমাত্র বন্দেগীর উপযুক্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না। অন্য কারো ইবাদত বন্দেগী করা যায় না। তাঁর কোন অংশীদার কিংবা সহকর্মী বা উযীর-নাযীর নেই। তিনি একক কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনিই



সর্বোপরি বাদশাহ, রাজাধিরাজ সবই তাঁর বান্দা ও গোলাম। তিনি বান্দাদের উপর বড়ই মেহেরবান।

তিনি সব দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। তাঁর মাঝে আদৌ কোন রকমের দোষ-ত্রুটি নেই। তাঁর ক্রিয়া-কর্ম, আদেশ-নিষেধ সবই ভাল ও মঙ্গলময়, কোন একটিতেও বিন্দুমাত্র অন্যায় বা দোষ নেই। তিনিই বিপদ-আপদ দেন এবং বিপদ-আপদ হতে উদ্ধার করেন, অন্য কেউ কোন প্রকার বিপদ-আপদ হতে মুক্তি দিতে পারে না। প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা তাঁরই। তিনিই সকল সম্মান ও মর্যাদার অধিপতি। তিনিই প্রকৃত মহান। একমাত্র তিনিই নিজেকে নিজে বড় বলতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কারো এ রকম বলার ক্ষমতা ও অধিকার নেই। তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং করবেন। তিনি এমন দয়ালু যে, দয়া করে অনেকের গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তাঁর প্রভাব ও প্রভুত্ব সকলের ওপর, কিন্তু তাঁর ওপর কারো প্রভাব বা প্রভুত্ব চলে না।

তিনি বড়ই দাতা। সমস্ত জিনিসের ও যাবতীয় চেতন-অচেতন পদার্থের আহার তিনি দান করেন। তিনিই রুঘির মালিক। রুঘী কমানো-বাড়ানো তাঁরই হাতে। তিনি যার রুঘী কমাতে ইচ্ছা করেন, তার রুঘী কমিয়ে দেন। যার রুঘী বাড়াতে ইচ্ছা করেন, তার বাড়িয়ে দেন।

যে কাউকে উচ্চপদস্থ বা অপদস্থ করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা অপমান করেন। এসব তাঁরই ক্ষমতায়, তাঁরই ইখতিয়ারে। অন্য কারো এতে কোন রকম ক্ষমতা বা অধিকার নেই। তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে যার জন্য যা ভালো মনে করেন, তার জন্য তাই ব্যবস্থা করেন। তাতে কারো কোন প্রকার প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। তিনি ন্যায় পরায়ণ, তাঁর কোন কাজেই অন্যায় বা অত্যাচারের লেশমাত্র নেই।

তিনি বড়ই সহিষ্ণু, অনেক কিছু সহ্য করেন। কত পাপিষ্ঠ তাঁর নাফরমানী করছে, তাঁর উপর কত রকম দোষারোপ এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত করছে, তারপরও তিনি তাদের রিযিক জারি রেখেছেন।

তিনি এমনই কদরশিনাস-গুণগ্রাহী এবং উদার যে, তার আদৌ কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার ইবাদত-বন্দেগী করলে এবং তাঁর আদেশ পালন করলে, তিনি তাঁর বড়ই কদর করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে আশাতীতরূপে ফল দান করেন।

তিনি এমনই মেহেরবান ও দয়ালু যে, তার নিকট দরখাস্ত করলে (অর্থাৎ, দু'আ করলে) তিনি তা মঞ্জুর করেন। তাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত, তাঁর ভাণ্ডারে কোন কিছুই অভাব নেই। তিনি অনাদি-অনন্তকালব্যাপী সকল জীব-জন্তু ও প্রাণী জগতের আহার দিয়ে আসছেন।

তিনি জীবন দান করছেন, ধন-রত্ন দান করছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি দান করছেন। অধিকন্তু আখেরাতেও অগণিত সাওয়াব ও নেয়ামত দান করবেন। কিন্তু তাঁর ভাণ্ডার তবুও বিন্দুমাত্র কমেনি বা কমবে না।

তার কোন কাজই হিকমত ও মঙ্গল ছাড়া নয়। কিন্তু সব বিষয় সকলের বুঝে আসে না। তাই নির্বুদ্ধিতাবশত, কখনো না বুঝে দিলে বা মুখে প্রতিবাদ করে ঈমান নষ্ট করা উচিত নয়। তিনিই সব কর্ম সমাধানকারী। বান্দা চেষ্টা করবে, কিন্তু সে কর্ম সমাধানের ভার তাঁরই কুদরতী হাতে ন্যস্ত।

তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কিয়ামতের দিন পুনর্বীর সকলকে জীবিত করবেন। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তাঁর হাকীকত বা স্বরূপ এবং তিনি যে কি রকম অসীম, তা কারো বোঝার ক্ষমতা নেই। কেবলমাত্র তাঁর সিফাত অর্থাৎ, গুণাবলী ও তাঁর কার্যাবলীর দ্বারাই তাঁকে আমরা চিনতে পারি।

মানুষ পাপ করে খাঁটিভাবে তাওবা করে, তবে তিনি তা কবুল করেন। যে শাস্তির উপযুক্ত, তাকে তিনি শাস্তি দেন। তিনি হিদায়াত দেন। তাঁর নিদ্রা নেই। সমস্ত বিশ্বজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে তিনি বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত হন না। তিনিই সমস্ত বিশ্বের রক্ষক।

এ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলাকে চিনবার জন্যে তাঁর কতগুলো সিফাতে কামালিয়া অর্থাৎ, মহৎ গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হলো। এতদ্ব্যতীত যত মহত গুণ আছে, আল্লাহ তা‘আলাকে তৎসমুদয় দ্বারা বিভূষিত।

ফলকথা এই যে, সৎ ও মহৎ যত গুণ আছে, অনাদিকাল যাবৎ সে সব আল্লাহ তা‘আলার মধ্যে আছে এবং চিরকাল থাকবে। কিন্তু কোন দোষ-ত্রুটির লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে নেই।

আল্লাহ তা‘আলার গুণ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফের কোন কোন জায়গায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি আশ্চর্যান্বিত হন, হাসেন, কথা বলেন, দেখেন, শুনে, সিংহাসনাসীন হন, নিম্ন আসমানে অবতরণ করেন। তাঁর হাত, পা, মুখ ইত্যাদি আছে। এসব ব্যাপারে কখনো বিভ্রান্তিতে পড়তে বা তর্ক-বিতর্ক করতে নেই। সহজ-সরলভাবে আমাদের আক্বীদা ও একীন এই রাখা উচিত যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্টি জীবের তাঁর উঠা-বসা বা হাত-পা তো নিশ্চয়ই নয়, তবে কেমন? তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! শয়তান যেন ধোঁকা দিয়ে গোলকধাঁধায় না ফেলতে পারে। একীনী আক্বীদা ও অটল বিশ্বাস রাখবেন যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্টিজীবের সাদৃশ্য হতে আল্লাহ তা‘আলা সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান।

এ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে কেউ আল্লাহ তা‘আলাকে দেখতে পারেনি। কখনো পারবেও না। তবে জান্নাতে গিয়ে জান্নাতীরা আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে। জান্নাতে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হবে।

গ. একমাত্র তিনিই মাখলুকের ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত। আর কেউ ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান আনার অর্থ শুধু আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা নয় বরং অস্তিত্ব স্বীকার করার সাথে সাথে তাঁর উপরোক্ত গুণবাচক কথাগুলো স্বীকার করাও জরুরী। নতুবা আল্লাহপাকের উপর সম্পূর্ণরূপে ঈমান আনা হবে না এবং সে ঈমান গ্রহণযোগ্যও হবে না।

### আল্লাহর সিফাতী বা গুণবাচক ৯৯টি নাম

১. الرحمن	অত্যন্ত দয়াবান।	২২. الخافض	পতনকারী, অবনমনকারী।
২. الرحيم	পরম দয়ালু।	২৩. الرفع	উন্নয়নকারী।
৩. الملك	অধিপতি।	২৪. المعز	সন্মানদাতা।
৪. القدوس	পবিত্র।	২৫. المذل	অপমানকারী।
৫. السلام	শান্তিময়।	২৬. السميع	সর্বশ্রোতা।
৬. المؤمن	নিরাপত্তা বিধায়ক।	২৭. البصير	সম্যক দ্রষ্টা।
৭. المهيمن	রক্ষক।	২৮. الحكم	মীমাংসাকারী।
৮. العزيز	পরাক্রমশালী।	২৯. العدل	ন্যায়নিষ্ঠ।
৯. الجبار	শক্তি প্রয়োগে সংশোধনকারী, প্রবল।	৩০. اللطيف	সুস্বপ্নদর্শী।
১০. المتكبر	মহিমান্বিত।	৩১. الخبير	সর্বজ্ঞ।
১১. الخالق	স্রষ্টা।	৩২. الحليم	দৈর্ঘ্যশীল।
১২. الباري	উদ্ভাবনকর্তা, ত্রুটিহীন স্রষ্টা।	৩৩. العظيم	মহিমাময়।
১৩. المصور	আকৃতিদাতা।	৩৪. الغفور	পরম ক্ষমাকারী।
১৪. الغفار	পরম ক্ষমাশীল।	৩৫. الشكور	গুণগ্রাহী।
১৫. القهار	মহা পরাক্রান্ত।	৩৬. العلي	সর্বোচ্চ সমাসীন, অতি উচ্চ।
১৬. الوهاب	মহা দাতা।	৩৭. الكبير	সুমহান।
১৭. الرزاق	রিষিকদাতা।	৩৮. الحفيظ	মহারক্ষক।
১৮. الفتاح	মহা বিজয়ী।	৩৯. المقيت	আহার্যদাতা।
১৯. العليم	মহাজ্ঞানী।	৪০. الحسيب	হিসাব গ্রহণকারী।
২০. القابض	সংকোচনকারী।	৪১. الجليل	মহিমান্বিত।
২১. الباسط	সম্প্রসারণকারী।	৪২. الكريم	অনুগ্রহকারী।
৪৩. الرقيب	পর্যবেক্ষণকারী।	৭২. لمؤخرا	পশ্চাদবর্তীকারী।
৪৪. المجيب	কবুলকারী।	৭৩. الأول	সর্বপ্রথম অর্থাৎ অনাদি।
৪৫. الواسع	সর্বব্যাপী।	৭৪. لآخر	শেষ অর্থাৎ অনন্ত।
৪৬. الحكيم	প্রজ্ঞাময়।	৭৫. لظاهر	প্রকাশ্য।
৪৭. الودود	প্রেমময়।	৭৬. لباطنا	গুপ্তসত্তা।
৪৮. المجيد	গৌরবময়।	৭৭. الوالي	অধিপতি।

৪৯. الباعث	পুনরুত্থানকারী।	৭৮. المتعال	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।
৫০. الشهيد	প্রত্যক্ষকারী।	৭৯. البر	কৃপাময়।
৫১. الحق	সত্যপ্রকাশক, হক।	৮০. الثواب	তওবা কবুলকারী।
৫২. الوكيل	কর্ম বিধায়ক।	৮১. المنتقم	শাস্তিদাতা।
৫৩. القوى	শক্তিশালী।	৮২. العفو	ক্ষমাকারী।
৫৪. المتين	দৃঢ়তাসম্পন্ন।	৮৩. الرؤوف	দয়াদ্র।
৫৫. الولي	অভিভাবক।	৮৪. مالك الملك	সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
৫৬. الحميد	প্রশংসিত।	৮৫. ذو الجلال والإكرام	মহিমাময় মহানুভব।
৫৭. المحصى	হিসাব গ্রহণকারী।	৮৬. المقسط	ন্যায়পরায়ণ।
৫৮. المبدئ	আদি স্রষ্টা।	৮৭. الجامع	একত্রকরণকারী।
৫৯. المعيد	পুনঃসৃষ্টিকারী।	৮৮. الغني	অভাবমুক্ত।
৬০. المحيي	জীবনদাতা।	৮৯. المغني	অভাব মোচনকারী।
৬১. المميت	মৃত্যুদাতা।	৯০. المانع	প্রতিরোধকারী।
৬২. الحي	চিরজীব।	৯১. لضرارا	ক্ষতির ক্ষমতাকারী।
৬৩. القيوم	স্বপ্রতিষ্ঠ সংরক্ষণকারী।	৯২. النافع	কল্যাণকারী।
৬৪. الواجد	প্রাপক, তিনি যা চান তাই পান।	৯৩. النور	জ্যোতির্ময়।
৬৫. الماجد	মহান।	৯৪. الهادي	পথ প্রদর্শক।
৬৬. الواحد	একক।	৯৫. البديع	নমুনাবিহীন সৃষ্টিকারী।
৬৭	এক অদ্বিতীয়।	৯৬. الباقي	চিরস্থায়ী।
৬৮. الصمد	অনপেক্ষ।	৯৭. الوارث	স্বত্বাধিকারী।
৬৯. القادر	শক্তিশালী।	৯৮. الرشيد	সত্যদর্শী।
৭০. مقتدر	ক্ষমতাসালী।	৯৯. الصبور	ধৈর্যশীল।
৭১. المقدم	অগ্রবর্তীকারী।		

পবিত্র কুরআনুল কারীমে এবং হাদীস গ্রন্থসমূহে এসবের বাইরেও আরো কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন:

১. الرَّبُّ	প্রতিপালক।	৪. الصَّادِقُ	সত্যবাদী।
২. الْمُتَعَمِّدُ	নিয়ামতদানকারী।	৫. اسْتَارُ	গোপনকারী।
৩. الْمُعْطِي	দাতা।		

আল আসমাউল হুসনার যথাযথ বাংলা অনুবাদ কিছুতেই হয় না। এখানে যে বাংলা অর্থ দেওয়া হয়েছে, তা কেবলমাত্র ইঙ্গিত মাত্র। আল আসমাউল হুসনার মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক গুণাবলী আল্লাহর জন্য সত্তাগত, অনাদি, অনন্ত, ব্যাপক ও অসীম। আর মানুষের জন্য এ সকল গুণ কেবল আল্লাহর দেয়া অস্থায়ী এবং সীমিত।

### الاسماء الحسنی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ."

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত “হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা’আলার ৯৯টি নাম আছে, যে ব্যক্তি উক্ত নামগুলো মুখস্ত রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” [সুনানুত্ তিরমিজী হাদীস নং- ৩৫০৭]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ  
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ  
الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ  
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمَذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  
الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  
الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  
الْحَفِيزُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ  
الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ  
الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعْثُ الشَّهِيدُ  
الْحَقُّ الْوَكَيلُ الْقَوِيُّ الْمُتَيْنُ  
الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  
الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ  
الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ  
الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوفُ  
مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  
الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ  
"النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ"

## ২. ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ এক ধরনের মাখলুককে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করে তাদেরকে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন। তাদেরকে ফেরেশতা বলে। তাঁরা পুরুষ বা মহিলা কোনটিই নন। বরং তাঁরা ভিন্ন ধরনের মাখলুক। অনেক ধরনের কাজ আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর সোপর্দ করে রেখেছেন। যেমন: নবীগণের আ. নিকট অহী আনয়ন করা, মেঘ পরিচালনা করা, রুহ কবয করা, নেকী-বদী লিখে রাখা ইত্যাদি। তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তাঁরা বিন্দুমাত্র আল্লাহর নাফরমানী করেন না। তাঁরা আল্লাহর প্রিয় ও ফরমাবরদার বান্দা। তাঁদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা যথা: হযরত জিবরাঈল আ. হযরত মীকাঈল আ., হযরত ইসরাফীল আ. ও হযরত আযরাঈল আ. অতিপ্রসিদ্ধ।

## জিন সম্বন্ধে আকীদা

আরেক প্রকার জীবকে আল্লাহ তা‘আলা আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করে আমাদের চক্ষুর অগোচর করে রেখেছেন। তাদেরকে জিন বলে। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সবরকম হয়। তারা নারী-পুরুষও বটে এবং তাদের সন্তানাদিও হয়। তাদের খানা-পিনার প্রয়োজনও হয়। জিন মানুষের ওপর আছর করতে পারে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও বড় দুই হচ্ছে ‘ইবলিশ শয়তান’। হাশরের ময়দানে জিনদেরও হিসাব-নিকাশ হবে। এ কথা কুরআনে কারীমে উল্লেখ আছে। সুতরাং তা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

## ৩. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান:

আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো, এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতি ও জিন জাতির হিদায়াতের জন্যে ছোট-বড় বহু কিতাব হযরত জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে পয়গাম্বরগণের আ. ওপর নাযিল করেছেন, তারা সে সব কিতাবের দ্বারা নিজ নিজ উম্মতকে দ্বীনের কথা শিখিয়েছেন। উক্ত কিতাবসমূহের মধ্যে চারখানা কিতাব বেশি প্রসিদ্ধ, যা প্রসিদ্ধ চারজন রাসূলের আ. ওপর নাযিল করা হয়েছে। তার মধ্যে কুরআন শরীফ সর্বশেষ কিতাব। এরপরে আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের হুকুমই চলতে থাকবে। পবিত্র কুরআনের কোন সূরা আয়াত এমনকি কোন শব্দ হরকত, নুকতার মধ্যে এমনিভাবে অর্থের মাঝেও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিলুপ্তি আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসাও সম্ভব নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের হিফাযতের ওয়াদা করেছেন

এবং তা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। অন্যান্য কিতাবগুলোকে বেদীন লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করে ফেলেছে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে সেগুলোর হিফযতের ওয়াদা করেন নি। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরা, প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি হরফ এমনকি প্রতিটি নুকতাহ ও হরকতের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। কোন একটি অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। কাফের হয়ে যাবে।

কুরআন শরীফ ও তার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে তিনি দ্বীন সম্বন্ধীয় সব কথা বর্ণনা করে দিয়েছেন। কোন অংশ গোপন রাখেন নি। সুতরাং, এখন নতুন কোন কথা বা প্রথা চালু করা দুরন্ত নয়। দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ নতুন কথাকে ইলহাদ বা বিদ‘আত বলে। যা অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহ ও পথভ্রষ্টতা।

কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া কুফরী কাজ। কোন ফরযকে অস্বীকার করা কুফরী কাজ। তেমনিভাবে কোন হালালকে হারাম মনে করা বা কোন অকাট্য হারাম বা গুনাহকে হালাল হিসাবে বিশ্বাস করা কুফরী। এর দ্বারা ঈমান চলে যায়।

## ৪. নবী-রাসূল আ. এর ওপর ঈমান:

নবী-রাসূল আ.- এর ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা‘আলা মানুষের হিদায়াতের জন্যে এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্যে স্বীয় বান্দাদের মধ্যে হতে বাছাই করে বহুসংখ্যক পয়গাম্বর অর্থাৎ নবী-রাসূল আ. মনোনীত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যাতে করে মানুষ আল্লাহর সমুষ্টি হাসিল করে দুনিয়াতে কামিয়াব হতে পারে এবং পরকালে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে বেহেশত হাসিল করতে পারে।

পয়গাম্বরগণ সকলেই মাসুম বা নিষ্পাপ। তাঁরা কোন প্রকার পাপ করেন না। নবীগণ মানুষ। তাঁরা খোদা নন। খোদার পুত্র নন। খোদার রূপান্তর (অবতার) নন। বরং তাঁরা হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি। নবীগণ আল্লাহর বাণী ছবছ পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের সঠিক সংখ্যা কুরআন শরীফ বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে বর্ণনা করেন নি। কাজেই নিশ্চিতভাবে তাঁদের সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারে না। এ কথা যদি ও প্রসিদ্ধ যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন কিন্তু কোন সহীহ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত নয়। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বহুসংখ্যক পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে তাঁদের দ্বারা অনেক অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঐ সব ঘটনাকে মু‘জিয়া বলে। নবীগণের মু‘জিয়াসমূহ বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গ।

পয়গাম্বরগণের আ. মধ্যে সর্বপ্রথম দুনিয়াতে আগমন করেছেন হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ অথচ সর্বপ্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে অন্য কেউ দুনিয়াতে নবী বা রাসূল হিসেবে আগমন করেননি এবং করবেনও না। হযরত ঈসা আ. কিয়ামতের পূর্বে যদিও আগমন করবেন, কিন্তু তিনি তো পূর্বেই নবী ছিলেন। নতুন নবী হিসেবে তিনি আগমন করবেন না। আমাদের নবী খাতামুন নাবিয়ীন বা শেষনবী। তাঁর পরে নতুনভাবে আর কোন নবী আসবেন না; তারপর আসল বা ছায়া কোনরূপ নবীই নাই। বরং তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের নবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যত জিন বা ইনসান ছিল, আছে বা সৃষ্টি হবে, সকলের জন্যেই তিনি নবী। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই হুকুম এবং তরীকা সকলের মুক্তি ও নাজাতের জন্যে অদ্বিতীয় পথ হিসেবে বহাল থাকবে। অন্য কোন ধর্ম, তরীকা বা ইজম এর অনুসরণ কাউকে আল্লাহর দরবারে কামিয়াব করতে পারবে না। আমাদের নবীর পরে অন্য কেউ নবী হয়েছেন বা নবী হবেন বলে বিশ্বাস করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কেউ নতুন নবী হওয়ার দাবি করলে বা তার অনুসরণ করলে, সেও কাফির বলে গণ্য হবে।

হযরত ঈসা আ. এখনও আসমানে জীবিত আছেন। তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন, ইহা সত্য। কুরআন হাদীসে প্রমাণিত। তাই ইহা বিশ্বাস করতে হবে, অন্যথায় ঈমান থাকবে না, তিনি কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে জমিনে অবতরণ করবেন। আমাদের নবীর অনুসারী হয়ে। হযরত ঈসা আ.- এর ব্যাপারে পুত্রবাদ ও কর্তৃত্বদের বিশ্বাস কুফরী।

দুনিয়াতে যত পয়গাম্বর এসেছেন, সকলেই আমাদের মাননীয় ও ভক্তির পাত্র। তাঁরা সকলেই আল্লাহর হুকুম প্রচার করেছেন। তাঁদের মধ্যে পরস্পরে কোন বিরোধ ছিল না। সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ছিলেন। হ্যাঁ, আল্লাহ তা‘আলা অবশ্য হিকমতের কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হুকুম জারি করেছেন। আর এই সামান্য বিভিন্নতাও গুণ্ডা আমলের ব্যাপারে, ঈমান আকীদার ব্যাপারে নয়। আকীদাসমূহ আদি হতে অন্ত পর্যন্ত চিরকাল এক। আকীদার মধ্যে কোন প্রকার রদদবদল বা পরিবর্তন হয়নি, আর হবেও না কখনো। পয়গাম্বরগণ সকলেই কামিল ছিলেন। কেও নাকিস বা অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কারো মর্যাদা ছিল বেশি, কারো মর্যাদা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সকল নবী নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। এজন্য নবীগণকে ‘হায়াতুননবী’ বলা হয়।



উল্লেখ্য যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্তবা সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই বলে নবীগণের মধ্যে তুলনা করে একজনকে বড় এবং একজনকে ছোট করে দেখানো বা বর্ণনা করা নিষেধ।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি সাল্লাম-এর সমস্ত কথা মেনে নেয়া জরুরী। তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করলে বা সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে কিংবা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে বা দোষ বের করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

ঈমানের জন্যে আমাদের নবীর সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মি‘রাজ ভ্রমণের কথা বিশ্বাস করাও জরুরী। যে মি‘রাজ বিশ্বাস করে না, সে বেদ্বীন। তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে।

### সাহাবীর পরিচিতি

যেসব মুসলমান আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বচক্ষে দেখেছেন, এবং ঈমানের হালতে ইনতিকাল করেছেন, তাঁদেরকে ‘সাহাবী’ বলা হয়।

সাহাবীগণের অনেক ফযীলতের কথা কুরআন ও হাদীসে এসেছে। সমস্ত সাহাবী রা. গণের সাথে মুহাব্বত রাখা ও তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

তাঁদের কাউকে মন্দ বলা আমাদের জন্যে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। সাহাবীগণ যদিও মাসুম বা নিষ্পাপ নন, কিন্তু তাঁরা মাগফূর বা ক্ষমাপ্রাপ্ত। সুতরাং, পরবর্তী লোকদের জন্যে তাঁদের সমালোচনা করার কোন অধিকার নেই। তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে।

তাঁরা সকলেই আদিল অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী এবং সত্যের মাপকাঠি। তাঁদের দোষ চর্চা করা হারাম এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজ। ‘আকীদাতুত তাহাবী’ কিতাবে উল্লেখ আছে, ‘সাহাবীগণের প্রতি মুহাব্বত-ভক্তি রাখা দ্বীনদারী ও ঈমানদারী এবং দ্বীনের ও ঈমানের পূর্ণতা। আর তাঁদের প্রতি বিদেষ পোষণ করা বা তাদের বিরূপ সমালোচনা করা কুফরী, মুনাফেকী এবং শরী‘আতের সীমার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সমস্ত সাহাবীগণের মাঝে চারজন সর্বপ্রধান। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা., তিনিই প্রথম খলীফা বরহক এবং তিনি সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রা., তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী রা. এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রা.। সকল সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার চির সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন। বিশেষ

করে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। এই দশজনকে আশারায় মুবাশশারা (সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। তাঁরা হলেন- ১. হযরত আবু বকর রা., ২. হযরত ওমর ফারুক রা., ৩। হযরত উসমান রা. ৪. হযরত আলী রা., ৫. হযরত তালহা রা., ৬. হযরত যুবায়ের রা. ৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা., ৮. হযরত সা‘দ ইবনে আবী ওয়াককাস রা., ৯. হযরত সাঈদ ইবনে য়ায়েদ রা., ১০. হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.।

### নবী আ. এর বিবি ও আওলাদ সম্বন্ধে আকীদা

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবি ও আহল-আওলাদগণের রা. বিশেষভাবে তায়ীম করা উম্মতের ওপর ওয়াজিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আওলাদগণের মধ্যে হযরত ফাতিমা রা. এবং বিবিগণের মধ্যে হযরত খাদীজা ও আয়িশা রা. এর মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।

### ওলী-বুয়ুর্গদের সম্বন্ধে আকীদা

ওলী-বুয়ুর্গদের কারামত সত্য। কিন্তু ওলী-বুয়ুর্গগণ যত বড়ই হোন না কেন, তাঁরা নবী রাসূল আ. তো দূরের কথা, একজন সাধারণ সাহাবীর সমতুল্যও হতে পারেন না। অবশ্য হক্কানী পীর-মাশায়খ ও উলামায়ে কিরাম যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়ারিশ এবং দ্বীনের ধারক বাহক সুতরাং, তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা, তাঁদের সঙ্গ লাভ করা এবং তাদের প্রতি বিদ্রোহ না রাখা সকল মুসলমানের জন্য জরুরী। দ্বীনের খাদিম হিসেবে তাঁদেরকে হেয় করা, কিংবা গালি দেয়া কুফরী কাজ। মানুষ যতই খোদার পেয়ারা হোক, হুঁশ-জ্ঞান থাকতে শরী‘আতের হুকুম-আহকামের পাবন্দী অবশ্যই তাকে করতে হবে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত কখনো মাফ হবে না। তেমনিভাবে মদ খাওয়া, গান-বাদ্য করা, পরস্ত্রী দর্শন বা স্পর্শ করা কখনো তার জন্যে জাযিয় হবে না। হারাম বস্তুসমূহ হারামই থাকবে এবং হারাম কাজ করে বা ফরয বন্দেরগী ছেড়ে দিয়ে কেউ কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারে না।

### ৫. কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান

কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান আনার অর্থ-কুরআন ও হাদীসে কিয়ামতের যতগুলো নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই ঘটবে-দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করা। যেমন- বিশ্বাস করা যে, ইমাম মাহদী রহ. আবির্ভূত হবেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায্যপরায়ণতার সাথে বাদশাহী করবেন। ‘কানা দাজ্জাল’ অনেক অনেক ফিতনা-ফাসাদ করবে, তাকে খতম করার জন্য হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং তাকে বধ করবেন। ‘ইয়াজুজ মা’জুজ’ অতিশক্তিশালী

পথভ্রষ্ট শ্রেণীর মানুষ। তারা দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে দেবে। অতঃপর আল্লাহর গযবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। ‘দাব্বাতুল আরদ’ নামে এক আশ্চর্য জানোয়ার পৃথিবীতে জাহির হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে।

কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে, তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কুরআন শরীফ উঠে যাবে। এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা ঘটবে। তারপরে কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত মু‘মিনগণ মারা যাবেন এবং সমস্ত দুনিয়া কাফিরদের দ্বারা ভরে যাবে। আর তাদের উপর কিয়ামত কায়িম হবে।

সারকথা, কিয়ামতের সকল নিদর্শন যখন পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফীল আ. শিঙ্গায় ফুক দিবেন। তাতে কতিপয় জিনিস ব্যতীত সব ধ্বংস হয়ে যাবে, আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সমস্ত জীবজন্তু মরে যাবে, যারা পূর্বে মারা গেছে, তাদের রুহ বেঁহুশ হয়ে যাবে। অনেক দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে। আল্লাহর নির্দেশে তারপর আবার-শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। তাতে সমস্ত আলম আবার জীবিত হয়ে উঠবে এবং কেয়ামতের ময়দানে সকলে একত্রিত হবে।

কিয়ামতের দিন সূর্য অতি নিকটে চলে আসবে। ফলে মানুষের খুব কষ্ট হবে। কষ্ট দূর করার জন্য লোকেরা হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে বড় বড় নবীগণের আ. নিকট সুপারিশের জন্য যাবে। কিন্তু কেউ সুপারিশ করার সাহস পাবে না। অবশেষে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফাআতে হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।

মীযানের মাধ্যমে নেকী-বদীর হিসাব হবে। অনেকে বিনা হিসেবেই বেহেশতে চলে যাবে, আবার অনেককে বিনা হিসেবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হিসাবের পর নেককারদের ডান হাতে এবং বদকারদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

সেদিন জাহান্নামের উপরে অবস্থিত পুলসিরাতের উপর দিয়ে সকলকে পার হতে হবে। নেককার লোকেরা তা দ্রুত পার হয়ে যাবেন, কিন্তু বদকার লোকেরা পার হওয়ার সময় পুলসিরাতের নিচে অবস্থিত দোযখের মধ্যে পড়ে যাবে।

সেই কঠিন দিনে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতদেরকে হাউজে কাউসারের শরবত পান করাবেন। তা এমন তৃপ্তিকর হবে, যা পান করার পর পিপাসার নামমাত্র থাকবে না। জাহান্নামের মাঝে ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডসহ বিভিন্ন রকম শাস্তির উপকরণ মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, সে যত বড় পাপী হোক না কেন, স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করবে, অতঃপর নবীগণের আ. কিংবা অন্যদের সুপারিশে দোযখ

হতে মুক্তি লাভ করে কোন এক সময় বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যারা কুফরী করেছে, বা শিরকী করেছে, তারা যদি দুনিয়াতে অনেক ভাল কাজও করে থাকে, তথাপি তারা কখনো কিছুতেই দোযখ হতে মুক্তি পাবে না। দোযখীদের কখনো মৃত্যুও আসবে না। তারা চিরকাল শাস্তিই ভোগ করতে থাকবে এবং তাদের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না।

দোযখের ন্যায় বেহেশতকেও আল্লাহ তা‘আলা পূর্ব হতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। সেখানে নেক লোকদের জন্যে অগণিত ও অকল্পনীয় শান্তির সামগ্রী ও নেয়ামত মওজুদ আছে। যে একবার বেহেশতে যাবে, তার আর কোন ভয় বা ভাবনা থাকবে না। এবং কোনদিন তাকে বেহেশত থেকে বের হতে হবে না। বরং চিরকাল সেখানে জীবিত অবস্থায় থেকে সুখ-শান্তি ভোগ করতে থাকবে।

বেহেশতের সকল নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার দীদার বা দর্শন লাভ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নেয়ামত। যদিও দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে কেউ আল্লাহ তা‘আলাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু মু‘মিনগণ বেহেশতের মধ্যে আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হবেন। বেহেশতের মধ্যে বাগ-বাগিচা, বালাখানা, হুর-গিলমান, বিভিন্ন রকম নহর ও নানারকম অকল্পনীয় সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী সর্বদা মওজুদ থাকবে। জান্নাতীদের দিলের কোন নেয়ামত ভোগ করার ইচ্ছা হওয়ার সাথে সাথে তা পূর্ণ হবে।

দুনিয়াতে কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যায় না। অবশ্য কুরআন-হাদীসে যাদের নাম নিয়ে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে বলা যাবে। তবে কারোর ভাল আমল বা ভাল আখলাক দেখে তাকে ভাল মনে করা উচিত।

## ৬. তাকদীরের ওপর ঈমান

তাকদীরের ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, মনে-প্রাণে অটল বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সমগ্র বিশ্বজগতে ভালো বা মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা‘আলা পূর্ব হতেই জানেন, লাউহে মাহফুযে তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি যেমন জানেন তেমনই হয়, তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা। তার ক্ষমতা সর্বব্যাপী। তার ক্ষমতা ছিন্ন করে বের হতে পারে, এমন কেউ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, আদি-অন্ত সবকিছুই তিনি সঠিকভাবে জানেন।

মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা ভাল-মন্দ বুঝবার এবং কাজ করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং ইচ্ছাশক্তিও দান করেছেন। তার দ্বারা নিজ ক্ষমতায়, নিজ ইচ্ছায় সে পাপ ও পুণ্যের কাজ করে। পাপ কাজ করলে আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হন এবং পুণ্যের কাজ করলে সন্তুষ্ট হন। কাজ করা ভিন্ন কথা, আর সৃষ্টি করা ভিন্ন

কথা। সৃষ্টি তো সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলা করেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে দান করেছেন।

মানুষ জীবনভর যতই ভাল বা মন্দ থাকুক না কেন, যে অবস্থায় তার ইনতিকাল হবে, সে হিসেবে শান্তি বা শাস্তি পাবে। যেমন, এক ব্যক্তি সারাজীবন মু‘মিন ছিল, কিন্তু মউতের পূর্বে ইচ্ছা পূর্বক কুফরী বা শিরকী কথা বললো বা ঈমান বিরোধী কাজ করলো, তাহলে সে কাফির সাব্যস্ত হবে। সুতরাং, দিলের মধ্যে আল্লাহর রহমতের আশা ও গযবের ভয় রাখা জরুরী। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের অসাধ্য কোন হুকুম করেননি। যা কিছু আদেশ করেছেন বা নিষেধ করেছেন, সবই বান্দার আয়ত্তে ও ইখতিয়ারে।

আল্লাহ তা‘আলার ওপর কোন কিছু করা ওয়াজিব নয়। তিনি যা কিছু দান করেন, সবই তাঁর রহমত এবং মেহেরবানী মাত্র। তাঁর ওপর কারো কোনরূপ দাবি বা হুকুম কিংবা কর্তৃত্ব চলে না। ছোট হতে ছোট গুনাহের কারণে তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং বড় থেকে বড় পাপও তিনি মার্জনা করতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি কাউকে দোষখে দিলে, সেটাই ইনসাফ এবং কাউকে জাম্মাতে প্রবেশ করালে, সেটা তার রহমত। আপত্তি করার অধিকার কারো নেই।

#### ৭। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, আমাদের বর্তমান জীবন পরীক্ষার নিমিত্ত। মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে এ জীবনের সকল বিষয়ের হিসাব নিবেন। মৃত্যুর পর একটি রয়েছে কবরে সাময়িক ফলভোগের বরযখী যিন্দেগী, আর পরবর্তীতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর আসবে পরকালীন আসল যিন্দেগী। পূর্ণাঙ্গ হিসাব-কিতাবের পর বান্দার জন্যে নির্ণীত হবে বেহেশত বা দোযখের সেই অনন্ত যিন্দেগী।

কিয়ামতের পূর্বেই মুনকার-নাকীরের প্রশ্নোত্তরের পর কবরের ভিতরে নেককারদের জন্যে শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করা হয় এবং বদকারদের জন্যে আযাব শুরু হয়ে যায়।

কবর দ্বারা উদ্দেশ্য, আলমে বরযখ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের যিন্দেগীর মধ্যবর্তী যিন্দেগী। সকল মানুষ ইনতিকালের পর সেখানেই পৌঁছে যায়, তাই তাকে কবর দেয়া হোক বা না-ই হোক। যেমন-অনেককে বাঘ বা কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলে, কতককে আগুনে জ্বালানো হয়, তারাও সেখানে উপস্থিত হয়। কবর বলে মূলত এ জগতকেই বোঝানো হয়। নেক লোকদের জন্যে কবর

জান্নাত বা বেহেশতের একটা অংশ হয়ে যায়। তারা সেখানে আরামের সাথে অবস্থান করতে থাকে। মৃত ব্যক্তির জন্যে দু‘আ করলে বা কিছু সদকা করলে, সে তা পেয়ে খুশি হয় এবং তাতে তার বড়ই উপকার হয়।

উল্লেখ্য, ঈমানে মুফাসসালের এ অংশটি ভিন্ন কোন বিষয় নয়, বরং ৫নং বিষয় অর্থাৎ কিয়ামতের ওপর ঈমান আনারই একটি স্তর; কিন্তু বিষয়টি জটিল ও সূক্ষ্ম হওয়ায় ভালভাবে বোঝানোর লক্ষ্যে আলাদা ধারার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হলো সহীহ ঈমানের সাতটি আরকান এবং তার কিছুটা ব্যাখ্যা ও তাফসীর। যে কোন ব্যক্তি এসব কথার সবগুলোকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে এবং এগুলোর দাবী অনুযায়ী আমলে সালিহা করবে, কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাকে বলা হবে পরিপূর্ণ মু‘মিন ও মুসলিম। আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদা যে, তাকে দুনিয়াতে, বরযখে ও আখিরাতে ইজ্জত ও শান্তির সাথে রাখবেন এবং তাকে সকল প্রকার আযাব-গযব ও কষ্ট-পেরেশানি থেকে হিফায়ত করবেন। কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে হিফায়ত করে তাকে আল্লাহর পূর্ণ সম্ভষ্টির সংবাদসহ মহাসুখের আবাস ও আনন্দের জান্নাত দান করবেন।

আর যে ব্যক্তি উল্লেখিত কথাগুলোর সবগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস তো করে, কিন্তু অলসতা বা গাফলতির কারণে কথাগুলোর দাবির ওপর আমল করে না বা আংশিকভাবে আমল করে, তাকে শরী‘আতের দৃষ্টিতে ফাসিক বা গুনাহগার মু‘মিন বলা হয়। তার গুনাহসমূহকে আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তাকে আযাব ও দিতে পারেন। তবে সে ব্যক্তি তার ঈমানের বদৌলতে অবশ্যই জান্নাতে যাবে; সরাসরিও যেতে পারে, অথবা তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাতে যেতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়সমূহকে অবিশ্বাস করবে, অথবা এগুলো থেকে মাত্র কোন একটি বিষয়কে অবিশ্বাস করবে কিংবা তাতে সন্দেহ পোষণ করবে, অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, কিংবা এগুলোর মধ্যে কোন দোষ বের করবে, তার ঈমান থাকবে না। বরং সে কাফের বলে গণ্য হবে। আর যদি পূর্ব থেকে মুসলমান থেকে থাকে, তারপরে তার থেকে এ ধরনের অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) বলা হবে, যদিও সে মুসলমান হওয়ার দাবি করে এবং যদিও সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা‘আতের সাথে পড়ে, মাথায় টুপি ও মুখে দাঁড়ি রাখে রাখে বা হজ্জ-উমরা পালন করে। এসব আমল পরকালে তার কোন কাজে আসবে না। কারণ এ কাজগুলো নেক আমল। আর কেউ নেক আমল করলেই সে মু‘মিন গণ্য হয় না। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যামানায় অনেক মুনাফিক অর্থাৎ নিকৃষ্ট

কাফির ছিল, তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে সকল নেক কাজে অংশ গ্রহণ করতো। এমনকি জিহাদেও শরীক হতো। তারপরও তারা মু‘মিন বলে গণ্য হয়নি।

বস্তুত ঈমান ভিন্ন জিনিস এবং আমল ভিন্ন জিনিস। সহীহ ঈমানের সাথে আমল দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা পৌঁছায়। আর আমল ব্যতীত শুধু ঈমানও ফায়দা দেয় না। কারণ, এমন ঈমানদার, যার নিকট নেক আমল নেই, সেও কোন এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল দুনিয়াতে কিছু ফায়দা পৌঁছালেও যেমন, তার সুনাম হয় বা ব্যবসা বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে ইত্যাদি, কিন্তু আখিরাতে ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল কোনই কাজে আসবে না।

এ সকল বিষয় স্পষ্টভাবে জানা থাকা জরুরী। যাতে ফিতনা-ফাসাদের যুগে ঈমান রক্ষা করা সহজ হয়। হাদীস-শরীফে আছে, ফিতনার যামানায় অনেক মানুষ সকালে মু‘মিন থাকবে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। [সূত্র : তিরমিযী শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৩, মুসলিম শরীফ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৫]

অর্থাৎ লোকেরা ইলমে দ্বীন শিখবে না, হক্কানী উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পর্ক রাখবে না; অপরদিকে বদদ্বীনীর সয়লাব ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হবে। এমনকি দ্বীনের নামে কুফর ও শিরকের প্রচার করা হবে; তখন মানুষ না বুঝে কুফরকে দ্বীন মনে করে গ্রহণ করে কাফির হয়ে যাবে। [আল্লাহ তা‘আলা সকলকে হিফাযত করুন।]

এখন দেখতে হবে, এসব সহীহ আক্বীদা ও বিশ্বাস মুসলমানগণ কতটুকু ধরে রেখেছে এবং কতটুকুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে সহীহ আক্বীদাকে বিগড়ে ফেলেছে। এ পর্যায়ে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ বর্ণনার আশা রাখি। তবে তার পূর্বে ঈমানের বিবরণ আরো সবিস্তারে উপলব্ধির জন্যে ঈমানের ৭৭ শাখার বর্ণনা করা হচ্ছে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### কুফর, শিরক ও বিদ‘আত

#### কুফর এর সংজ্ঞা

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত বিধি-বিধান হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলীল দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে তার কোন বিষয় সম্বন্ধে অন্তরে সন্দেহ পোষণ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফরী কাজ। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৪, পৃষ্ঠা-২২৩)



উল্লেখিত কাজের দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে তার পিছনের জীবনের সকল ইবাদাত বন্দেগী ও আমল নষ্ট হয়ে যায়। এবং বিবাহিত হলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ না করুন এ অবস্থা কারো হলে তার জন্য জরুরী হল, নতুনভাবে কালেমা তাওবা ইস্তেগফার করে পুনরায় ঈমান আনয়ন করে নেয়া এবং বিবাহিত হলে বিবাহও দুহরায়ে নেয়া।

### কুফরের প্রকারভেদ

(১) **কুফরে ইনকার:** অন্তর এবং যবান উভয়ের মাধ্যমে কোন দীনী বিষয়কে অস্বীকার করা। যেমন- মক্কার কাফের সম্প্রদায়।

(২) **কুফরে জুহুদ:** অন্তরে দীনকে বিশ্বাস রাখা কিন্তু মুখে অস্বীকার করা। যেমন- মদীনার ইয়াহুদ সম্প্রদায়।

(৩) **কুফরে ইনাদ:** অন্তরে দীনকে বিশ্বাস করে এবং মুখেও স্বীকার করে, কিন্তু ইসলামের হুকুম আহকামকে মান্য করে না, অন্যান্য দীন বাতিল হয়ে গিয়েছে তা বিশ্বাস করে না। যেমন- আদমশুমারীর অনেক নামধারী মুসলমান যারা কখনো সহীহ দীনী পরিবেশে আসে না।

(৪) **কুফরে যানদাকাহ:** বাহ্যিকভাবে দীনের সবকিছু স্বীকার করে, কোন বিষয় অস্বীকার করে না কিন্তু দীনের কোন বিষয়ে এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যা উম্মতের ইজমা পরিপন্থী। যেমন- কাদিয়ানীগণ খতমে নবুওয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের ভণ্ড নবীকে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালায়।

এমনভাবে কাফেরদেরও বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।

### কাফেরদের প্রকারভেদ:

(১) মুনাফেক: যবানে ইসলাম কিন্তু দিলে কুফর।

(২) মুরতাদ: ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করা।

(৩) মুশরিক: একাধিক উপাস্যে বিশ্বাসী।

(৪) কিতাবী: অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিশ্বাসী ও অনুসারী।

(৫) দাহরিয়া: (বস্তুবাদী) যমানা ও প্রকৃতিকে জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিশ্বাসী এবং পৃথিবীকে অক্ষয় ও চিরস্থায়ী বিশ্বাস করে।

(৬) মুআত্তেল: (নাস্তিক) সৃষ্টিকর্তা বলতেই অস্বীকার করে।

(৭) যিনদীক: মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এমন আক্বীদা পোষণকারী যা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর। (ফাতাওয়ায়ে শামী-২২৬ খণ্ড-৪)

### কিছু কুফরী আক্বীদা ও কাজ



যার কোনটা দ্বারা কাফের হয়ে যায় আর কোনটা দ্বারা কাফের হয় না কিন্তু মারাত্মক গোনাহগার হয়।

- (১) কোন মুসলমানকে কাফের বলে বিশ্বাস করা। (ফাতাওয়ায়ে শামী-খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-৬৯)
- (২) আল্লাহর শানে এমন আক্বীদা পোষণ করা যা মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, সন্তানাদি হওয়া ইত্যাদি। (সূরা ইখলাস)
- (৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে শেষনবী বিশ্বাস না করা বা এর অপব্যাখ্যা করা। (শরহুল আকায়িদ-১২৯-১৩০)
- (৪) দীনের কোন বিষয়কে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করা, ঠাট্টা করা ইত্যাদি। (ফাতাওয়ায়ে শামী-খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা-৪৭৪)
- (৫) আহলে ইলম তথা উলামায়ে কেরামকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করা।
- (৬) দীনের অকাট্য ও সর্বসম্মত বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা করা। (ইকফারুল মুলহিদ্দীন পৃষ্ঠা-৭৩)
- (৭) উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা। (শামী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২৩)
- (৮) আশ্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে কাউকে গালী দেওয়া বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। (শামী খণ্ড-২৩১)
- (৯) সাহাবায়ে কেরামকে গালী দেওয়া বিশেষ করে শাইখাইন তথা হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. কে গালী দেওয়া। (শামী-৪খণ্ড-২৩৬, ২৩৭)
- (১০) আয়েশা রাযি. এর প্রতি অপবাদ দেওয়া। (শামী ৪ খণ্ড-১৩৭)
- (১১) কোন অকাট্য হারামকে হালাল বলা।
- (১২) কাফেরদের শিআরকে (নিদর্শনকে) সম্মান করা। (আদদুররুল মুখতার খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৫৪)
- (১৩) হাসি, মজাক বা ঠাট্টা করে হলেও কালেমায়ে কুফর মুখে উচ্চারণ করা। (ইকফারুল মুলহিদ্দীন-২২৫)
- (১৪) গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি তত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়া।

এ জাতীয় আরো অনেক এমন কথা বা কাজ রয়েছে যার কোনটা দ্বারা মানুষ কাফের হয়ে যায়। আবার কোনটা দ্বারা কাফের তো হয় না কিন্তু মারাত্মক গোনাহগার হয়। সুতরাং এগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

### নিম্ন লিখিত কাজগুলো শিরক, এসব হতে দূরে থাকা কর্তব্য

- (১) কোন পীর বুয়ুর্গ এমনকি কোন নবী সম্বন্ধে এ রকম আক্বীদা রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের সব অবস্থা জানেন।
- (২) জ্যোতিষী, গণকঠাকুরদের নিকট অদৃষ্টের কথা জিজ্ঞাস করা।
- (৩) কোন পীর বুয়ুর্গের কবরের নিকট আওলাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করা।
- (৪) পীর বা কবরকে সিজদা করা।
- (৫) কোন পীর বুয়ুর্গের নামে শিরনী সদকা বা মাল্লত মানা।

- (৬) কোন পীর-বুয়ুর্গের দরগাহ বা কবরের চতুর্দিক দিয়ে তওয়াফ করা।
- (৭) কোন পীর বুয়ুর্গ বা অন্য কারো নামে জানোয়ার যবেহ করা বা কারো দোহাই দেয়া।
- (৮) কোন পীর বুয়ুর্গ বা অন্য কারো নামে ছেলের নাক, কান ছিদ্র করা, আংটি পরানো, চুল রাখা, টিকা রাখা।
- (৯) কোন জিনিসের বা ব্যারাম-পীড়ার (রোগের) ছুত লাগে বলে বিশ্বাস করা।
- (১০) ভালো মন্দ বার বা তারিখ জিজ্ঞাসা করা। যেমন, অনেকে জিজ্ঞাসা করে এই বারে বিবাহ শুভ কিনা? কোন্ দিনে নতুন ঘরে যেতে হয়? রোববারে বাঁশ কাটা যায় কিনা? ইত্যাদি।
- (১১) পীরের বাড়ি বা কোন বুয়ুর্গের দরগাহ বা তীর্থকে কাবা শরীফের মত আদব বা তায়িম করা।
- (১২) কোন জিনিস হতে কুলক্ষণ ধরা বা কুযাত্রা মনে করা। যেমন- যাত্রামুখে কেউ হাঁচি দিলে অনেকে সেটাকে কুযাত্রা মনে করে থাকে।
- (১৩) কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা।
- (১৪) কোন বুয়ুর্গের নাম অযিফার মত জপ করা।
- (১৫) কারো নামের কসম খাওয়া বা যিকির করা। কাউকে পরম পূজনীয় সম্বোধন করে লেখা। কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না বলা। জয়কালী নেগাহবান, ইত্যাদি বলা।
- (১৬) ছবি, ফটো বা মূর্তি রাখা বিশেষ করে কোন বুয়ুর্গের ফটো তায়ীমের জন্য রাখা।

### কিছু বিদ'আতের আলোচনা

- (১) কোন বুয়ুর্গের মাযারে ধুমধামের সাথে 'উরস' করা, মেলা বসানো বাতি জ্বালানো।
- (২) মেয়ে লোকের বিভিন্ন দরগায় যাওয়া।
- (৩) কবরের উপর চাদর, আগরবাতি, মোমবাতি ও ফল দেওয়া।
- (৪) কোন বুয়ুর্গকে সম্ভুষ্ট করার জন্যে শরী'আতের সীমারেখার বেশি তায়ীম করা।
- (৬) কবরে চুমো খাওয়া।
- (৭) কোন কোন অজ্ঞ লেখক আজমীর শরীফ, বাজেবোস্তান, পীরানে কার্লিয়ার ইত্যাদিকে মুসলমানদের তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করেছে, তা দেখে তীর্থ গমনের ন্যায় সেসব স্থানে যাওয়া।
- (৮) কবরে গম্বুজ বানানো।

### জাহিলিয়াতের কিছু প্রথার বর্ণনা

- (১) ছেলে-মেয়েদেরকে কুরআন ইলমে দীন শিক্ষা না দিয়ে মূর্থ বানিয়ে রাখা বা কু-শিক্ষায়, অসৎ সঙ্গে লিপ্ত হতে সহায়তা করা।
- (২) বিধবা বিবাহকে দূষণীয় মনে করা।
- (৩) বিবাহের সময় সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সমস্ত দেশাচার-রসম পালন করা।
- (৪) বিবাহে নাচ-গান করানো।
- (৫) হিন্দুদের উৎসবে যোগদান করা।
- (৬) মেয়েলোকদের দেবর, ভাসুর, মামাত, ফুফাত, খালাত, চাচাত ভাইদের বা ভগ্নীপতি, বেয়াই, নন্দাই ইত্যাদির সঙ্গে হাসি মশকরা করা বা তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করা কিংবা পথে ঘাটে বেড়ানো।
- (৭) গান-বাদ্য শুন্য।
- (৮) জারি, যাত্রা, কীর্তন, গাজীর গীত, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, ষাঁড় লড়াই, মোরগ লড়াই ইত্যাদিতে যোগদান করা।
- (৯) সারঙ্গ, বেহালা, হারমোনিয়াম, গ্রামোফোন ইত্যাদি বাজানো বা শুন্য।
- (১০) গান-গীত গাওয়া, বিশেষত খাজাবাবার উরসের নামে গান করা বা শোনাকে সাওয়াবের কাজ মনে করা।
- (১১) কোন হালাল পেশাকে অপমানের বিষয় মনে করা। যেমন: দণ্ডুরির কাজ করা, মাঝিগিরি, দর্জিগিরি করা বা মাছ বিক্রি করা ইত্যাদি।
- (১২) গীত গেয়ে স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হয়ে বরকনেকে গোসল দেয়া।
- (১৩) পুরুষদের জন্য সোনার আংটি, চেইন ইত্যাদি পরা বা পরানো।
- (১৪) পুরুষদের জন্য হাতে পায়ে বা নখে মেহেন্দী লাগানো। কিন্তু মেয়েলোকের জন্য মেহেন্দী লাগানো মুস্তাহাব।
- (১৫) আতশবাজী করা।
- (১৬) বিবাহে কাগজ কেটে বা কলাগাছ গেড়ে গেট সাজানো।
- (১৭) কেউ মরে গেলে চিৎকার করে, মুখ বুক পিটিয়ে বা মৃত ব্যক্তির গুণাবলী বর্ণনা করে ক্রন্দন করা।
- (১৮) ধুতি, হাফপ্যান্ট বা পায়ের গোড়ালী ঢাকা কিংবা টাইট ফিটিং প্যান্ট পরা, বা হ্যাট, টাই পরা।

## তৃতীয় অধ্যায়

### **কবীরা গুনাহসহ মারাত্মক কিছু গুনাহ**

গুনাহে কবীরা তাওবা ছাড়া মাফ হয় না এবং একটি গুনাহই জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট, নিম্নে কিছু কবীরা গুনাহের তালিকা দেওয়া হল। যথা-

(১) শিরক করা। (২) মা-বাপকে কষ্ট দেওয়া। (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। (৪) যিনা ব্যভিচার করা। (৫) চুরি করা। (৬) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। (৭) মিথ্যা অপবাদ লাগানো। (৮) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (৯) না হক যাচু করা। (১০) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (১১) আমানতের খেয়ানত করা। (১২) গীবত করা। (১৩) বিদ্রোহী বানানো অর্থাৎ, অধীনস্থদেরকে মালিকের বিরুদ্ধে উস্কানী দেয়া। (১৪) নেশায়ুক্ত জিনিষ পান করা। (১৫) অবৈধ যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা। (১৬) জুয়া খেলা ও লটারী ধরা। (১৭) সূদ খাওয়া। (১৮) ঘুষ খাওয়া। (১৯) জোর-জুলুম করে অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়া। (২০) অনাথ এতিম, বিধবার মাল খাওয়া। (২১) আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা। (২২) মিথ্যা কসম খাওয়া। (২৩) কোন মুসলমানকে গালি দেয়া। (২৪) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। (২৫) ধোঁকা দেয়া। (২৬) অহংকার করা। (২৭) বাদ্য বাজনা সহ নাচ-গান করা। (২৮) ডাকাতি করা, লুণ্ঠন করা। (২৯) স্বামীর নাফরমানী করা। (৩০) জায়গা-জমির সীমানা নষ্ট করা। (৩১) শ্রমিকের মজুরী কম দেয়া। (৩২) মাপে কম দেয়া। (৩৩) দ্রব্য-সামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রিত করা। (৩৪) খরিদারকে ধোঁকা দেয়া। (৩৫) স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে শর্তের সাথে হীলা করা। (৩৬) নিজের অধীনস্থ মহিলাদিগকে পরপুরুষের সাথে অবোধ মেলা-মেশার সুযোগ দেয়া। (৩৭) ঘোড় দৌড় বা রেস খেলা। (৩৮) সিনেমা-টিভি ইত্যাদি দেখা। (৩৯) পেশাব করে পানি না নেয়া বা পবিত্রতা অর্জন না করা। (৪০) চোগলখুরী ও কটুনামী করা। (৪১) গণকের কাছে যাওয়া। (৪২) মানুষ বা জীবের ফটো তোলা, ঘরে রাখা বা টাঙ্গানো। উল্লেখ যে আজকাল অনেকে মনে করে যে, ক্যামেরা দ্বারা তোলা ছবি নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি অতি মারাত্মক ভুল, কেননা হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে কাপড়ে অংকিত ছবির কিয়ামত দিবসে কঠিন শাস্তির ব্যাপারেও ধমকি এসেছে। দেখুন: বুখারী শরীফ হা: নং ৫৯৬১। আর জানা কথা যে কাপড়ে অংকিত ছবি ও ক্যামেরার দ্বারা তোলা ছবির মধ্যে পার্থক্য করার কোন কারণ নেই। অনুরূপভাবে ভিডিওতে রেকর্ড করা ছবিও যেহেতু ছবির সকল উদ্দেশ্য খুব ভালভাবে পূরা করে কাজেই ভিডিওর ছবিও নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত। (৪৩) পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি বা যে কোন ধরনের অলংকার পরা। (৪৪) পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরা। (৪৫) মেয়ে লোকের জন্য শরীরের রূপ ও গঠন প্রকাশ পায় এমন পোশাক পরিধান করা। (৪৬) ঝগড়া-বিবাদে মিথ্যা মোকাদ্দমা দায়ের করা। (৪৭) মৃত ব্যক্তির জায়গা ও সীয়াত পালন না করা। (৪৮) কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়া। (৪৯) গুপ্তচরবৃত্তি করা অর্থাৎ, মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্রের গোপন কথা অন্য সমাজ বা রাষ্ট্রের নিকট প্রকাশ করা। (৫০) নর হয়ে নারীর এবং নারী হয়ে নরের বেশ-ভূষা অবলম্বন করা। (৫১) টাকা বা নোট জাল করা। (৫২) অন্তর এত শক্ত করা যে, গরীব দুঃখীর সীমাহীন কষ্ট দেখেও দরদ না লাগা। (৫৩) ইসলামী রাষ্ট্রের

সীমান্ত পাহারায় ত্রুটি করা এবং দেশের জরুরী খাদ্য বা হাতিয়ার পাচার করা। (৫৪) রাস্তা-ঘাটে বা ছায়াদার ফলদার বৃক্ষের নীচে পায়খানা করা। (৫৫) ঘরবাড়ী, আঙ্গিনা, আসবাবপত্র, থালা-বাসন, কাপড়-চোপের নোংরা রাখা এবং ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণায় মন-মস্তিষ্ক গাফা করে রাখা। (৫৬) হাযিয় বা নিফাস অবস্থায় স্ত্রী সন্তোগ করা। (৫৭) যাকাত না দেয়া। (৫৮) ইচ্ছা করে কোন নামায কাযা করা। (৫৯) রমযানের কোন রোযা ইচ্ছা করে ভেঙ্গে ফেলা বা না রাখা। (৬০) জনগণের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও জীবিকা নির্বাহোপযোগী খাদ্য-দ্রব্য গুদামজাত করা। (৬১) যাঁড় দ্বারা গাভীর এবং পাঠার দ্বারা ছাগীর পাল দিতে না দেওয়া। (৬২) পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া। (৬৩) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাবৃত্তি করা। (৬৪) পেশাদার ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া। (৬৫) জনগণ যাকে চায়না সে ব্যক্তির বাদশাহী বা নেতৃত্ব করা। (৬৬) নিজের দোষ না দেখে পরের দোষ দেখা। (৬৭) বদগুমানী বা কারো প্রতি খারাপ ধারণা রাখা। (৬৮) ইলমে দীনকে তুচ্ছ মনে করে অর্জন না করা। (৬৯) বিনা জরুরিতে জনসম্মুখে সতর খোলা। (৭০) মেহমানের খাতিরে আদর যত্ন ও অভ্যর্থনা না করা। (৭১) ছেলেদের সঙ্গে কুকর্ম বা সমকাম করা। (৭২) আমানতের যোগ্য সৎকর্মীকে নিযুক্ত বা নির্বাচন না করে স্বজন প্রীতি করা। (৭৩) নিজে ইচ্ছা করে বা দাবী করে জোরপূর্বক কোন পদ গ্রহণ করা। (৭৪) ইসলামী রাষ্ট্রের বিদ্রোহী হওয়া। (৭৫) নিজের পরিবার-পরিজনের খবর না নিয়ে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কষ্টে ফেলা। (৭৬) খতনা না করা। (৭৭) অসৎ কাজ দেখে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয়া। (৭৮) অন্যায়ের সমর্থন করা। (৭৯) আত্মহত্যা করা। (৮০) ফরয গোসলে অনর্থক দেরী করা। (৮১) পেশাব-পায়খানা করে টিলা-কুলুখ বা পানি ব্যবহার না করা। (৮২) নাভীর নীচের পশম, বগলের পশম, নখ বর্ধিত করে রাখা। (৮৩) উস্তাদ ও পীরের সঙ্গে বেয়াদবী করা, এবং আলেম ও হাফেজদের অমর্যাদা করা। (৮৪) শুকরের গোশত খাওয়া। (৮৫) হস্ত মৈথুন করা। (৮৬) তামাশা দেখার জন্য যাঁড়, কবুতর বা মোরগ ইত্যাদি লড়াইয়ের আয়োজন করা। (৮৭) কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া। (৮৮) কোন জীবন্ত ও জানদার জীবকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা। (৮৯) আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া। (৯০) আল্লাহর আযাব হতে নির্ভীক হওয়া। (৯১) হালাল জানোয়ারকে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা বা ভিন্ন উপায়ে মেরে খাওয়া। (৯২) অপচয় বা অপব্যয় করা। (৯৩) বখিলী কানজুসী করা। (৯৪) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন প্রবর্তন না করা। (৯৫) ইসলামের নিয়মানুসারে আইন-কানুন জারী হওয়া সত্ত্বেও কোন আইন অমান্য করা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা। (৯৬) ডাকাতি, লুটতরাজ, পকেটমারী করা। (৯৭) তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কাউকে ডাকা, যেমন- হে জোলা, বান্দীর বাচ্চা ইত্যাদি। (৯৮) বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীতে বা ঘরে বা খাস কামরায়

প্রবেশ করা। (৯৯) মানুষের কষ্ট হয় এমন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেখে খুশী হওয়া। (১০০) সুরত-শেকেলের কারণে বা গরীব হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে টিটকারী করা। (১০১) বিদআত কাজ করা বা জারি করা। (১০২) দুনিয়া হাসিলের জন্য ইলমে দীন শিক্ষা দেয়া। (১০৩) ইলম গোপন করা। (১০৪) জাল হাদীস বর্ণনা করা। (১০৫) গুনাহের কাজে মগ্নত করা। (১০৬) প্রজাদের অধিকার খর্ব করা, জনগণের হক আদায় না করা। (১০৭) অবৈধ ট্যাক্স উসূল করা। (১০৮) বিনা ঠেকায় ঋণ করে ঋণী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। (১০৯) দুমুখো স্বভাব ইখতিয়ার করা। (১১০) মহিলাদের খুশবু লাগিয়ে বাহিরে বের হওয়া। (১১১) বিজাতিদের অনুকরণ করা। (১১২) গোঁফ বড় করে রাখা। (১১৩) অন্যের চুল ব্যবহার করা। (১১৪) যথার্থ কারণ ছাড়া কাউকে অভিশাপ দেয়া। (১১৫) অহেতুক কুকুর প্রতিপালন করা। (১১৬) মাতম ও শোক প্রকাশ করা। (১১৭) একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা। (১১৮) সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা। (১১৯) হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষভাব পোষণ করা। (১২০) বিনা দাওয়াতে মেহমান হয়ে আহার করা।

### কুরআন-হাদীসে যে সকল গুনাহের উপর লা'নত করা হয়েছে

১. যে স্ত্রী বা পুরুষ সূঁচের দ্বারা নিজ হাতে নিজের শরীর খোদায় বা অন্যের দ্বারা তা অঙ্কিত করায় তার প্রতি আল্লাহর লা'নত। (বুখারী: হাদীস নং ৫৯৩৭, মুসলিম: হাদীস নং ২১২৪)

২. যে স্ত্রীলোক নিজ হাতে বা অন্য কারো দ্বারা অন্যের চুল নিজের চুলের সঙ্গে মিশিয়ে নিজের চুলের পরিমাণ বাড়ায় তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। (বুখারী: হাদীস নং ৫৯৩৭, মুসলিম: হাদীস নং ২১২৪)

৩. যে ব্যক্তি নিজে সূদ খায় বা (বিনা অপরাগতায়) অন্যকে সূদ খাওয়ায়, যে সূদের দলীলে বা কারবারে স্বাক্ষর হয়, যে সূদের দলীল লেখে তাদের সকলের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। (মুসলিম: হাদীস নং ১৫৯৮)

৪. যে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে হীলা-বাহানা করে হারামকে হালাল করার জন্য সে স্ত্রীকে অন্য কারো নিকট এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, বিবাহের পর সহবাস করে তালাক দিতে হবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এরূপ শর্ত স্বীকার করে বিবাহ করে উভয় ব্যক্তির উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। (তিরমিযী শরীফ: হাদীস নং ১১২১)

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি ডিম বা রশি ইত্যাদি ক্ষুদ্র জিনিষও চুরি করে আল্লাহ তা'আলা তার হাত কাটার হুকুম

দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা‘আলা তার উপর লা‘নত করেছেন। (বুখারী: হাদীস নং ৬৭৯৯, মুসলিম: হাদীস নং ১৬৮৭)

৬. যে মদ তৈরী করে, যার জন্য তৈরী করে, যে মদ পান করে, যে মদ পান করায়, যে মদ বিক্রি করে, যে মদ বিক্রি করে পয়সা খায়, যে মদ বহন করে আনে, যার জন্য বহন করে আনা হয়, যে মদ দান করে, তাদের সকলের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা‘নত করেছেন। (তিরমিযী: হাদীস নং ১২৯৮)

৭. যে পিতা-মাতাকে লা‘নত করে আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর লা‘নত করেন। (মুসলিম: হা: নং ১৯৭৮)

৮. যে পিতা-মাতাকে গালি দেয় বা সমালোচনা করে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর লা‘নত করেন। (মুসনাদে আহমদ: হা: নং ২৮২০)

৯. যে ব্যক্তি তীর বা ধনুকের লক্ষ্য ঠিক করার জন্য কোন প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে তাকে নিশানা বানায় তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা‘নত করেছেন।

১০. যে পুরুষ স্ত্রীলোকের সুরত ও বেশ-ভূষা বা যে স্ত্রীলোক পুরুষের সুরত বেশ-ভূষা ধারণ করে তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা‘নত করেছেন।

১১. যে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে প্রাণী যবাহ করে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর লা‘নত করেছেন। (মুসলিম: হা: নং ১৭৮৯)

১২. যে ইসলাম ধর্মের বাহিরের কোন কথা ইসলাম ধর্মের ভিতরে দাখিল করে এবং যে এমন ব্যক্তির সহায়তা করে আল্লাহ তা‘আলা, ফেরেশতা এবং মানব সকলেই তার উপর অভিসম্পাত করে। (আবু দাউদ: হা: নং ৪৫১৯)

১৩. যে ব্যক্তি কোন জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কিত করে তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা‘নত করেছেন। (বুখারী: হা: নং ২০৮৬)

১৪. যে লুত আলাইহিস সালামের কণ্ঠের পাপকার্যে অর্থাৎ সমকামিতায় লিপ্ত হয় সে অভিশপ্ত। (মুসনাদে আহমাদ: হা: নং ১৮৮০)

১৫. যে কোন জীবের সাথে কু-কর্ম করে সে অভিশপ্ত। (প্রাগুক্ত)

১৬. যে ব্যক্তি কোন জীবের মুখের উপর লোহা গরম করে দাগ দিবে অথবা তার মুখের উপর আঘাত করবে সে অভিশপ্ত। (আবু দাউদ: হা: নং ২৫৬৪)



১৭. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সহিত খোঁকাবাজী করে বা জ্ঞাতসারে কোন মুসলমানের ক্ষতি করে সে অভিশপ্ত। (তিরমিযী: হা: নং ১৯৪৬)

১৮. যে সব স্ত্রীলোক মাযারে যাবে এবং যারা মাযারে গিয়ে সিজদা করবে বা তথায় বাতি জ্বালাবে তাদের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা‘নত করেছেন। (তিরমিযী: হা: নং ৩২০)

১৯. যে লোক কারো স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে খাড়া कराবে (বা চাকর-গোলামকে তার মুনবের বিরুদ্ধে বা শাগরেদকে উস্তাদের বিরুদ্ধে) কুমন্ত্রণা দিয়ে উত্তেজিত করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সে আমার দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ: হা: নং ২১৭৫)

২০. যে পুরুষ তার স্ত্রীর পশ্চাতদ্বারে সহবাস করবে সে অভিশপ্ত। (আবু দাউদ: হা: নং ২১৬২)

২১. যে স্ত্রী তার স্বামীর উপর রাগ করে স্বামী থেকে পৃথক রাত্রিযাপন করে তার উপর ফেরেশতাগণ ভোর পর্যন্ত লা‘নত করতে থাকেন। (মুসলিম হা: নং ১৪৩৬)

২২. যে ব্যক্তি পূর্ব পুরুষের বংশ ছেড়ে অন্য বংশের পরিচয় দিবে (যেমন সায্যিদ বংশ নয় অথচ সায্যিদ বলে পরিচয় দিবে) তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা‘নত করেছেন। (তিরমিযী: হা: নং ২১৬৭)

২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দিকে (হাসি, বিদ্রূপ বা ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে) অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ফেরেশতাগণ তার উপর লা‘নত করেন। (তিরমিযী: হা: নং ২১৬২)

২৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যদি তোমরা কাউকে আমার সাহাবীদেরকে গালি দিতে বা সমালোচনা করতে দেখ তখন বলবে তোমাদের কু-কাজের জন্য তোমাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার লা‘নত হোক। (তিরমিযী: হা: নং ৩৮৭৫)

২৫. আল্লাহপাক বলেন: যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে অভিসম্পাত করেন। (সূরায় আহযাব: ৫৭)

২৬. যে লোক ইনসাফের রাজত্বের মধ্যে জুলুম ও অত্যাচার করে এবং শান্তির দেশের মধ্যে অশান্তি আনয়ন করে বা আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদেরকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তা‘আলা তার উপর লা‘নত করেন। (সূরায় মুহাম্মদ: ২২-২৩)



২৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর হুকুম ও আইন জানা সত্ত্বেও তা গোপন করে রাখে আল্লাহ এবং অভিসম্পাতকারীগণ তার উপর অভিসম্পাত করে। (সূরায় বাকার: ১৫৯)

২৮. যে ব্যক্তি ঈমানদার সতী মহিলার উপর মিথ্যা অপবাদ লাগাবে অথচ সে এ বিষয়ে অবগতও নয়, সে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত হবে। (সূরায় নূর: ২৩)

২৯. যে ব্যক্তি মুসলমান অপেক্ষা কাফেরদেরকে বেশী ভালবাসবে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করবে তার উপর লা'নত। (তিরমিযী শরীফ: হা: নং)

৩০. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ঘুষ খাবে, যে বিনা অপারগতায় ঘুষ দিবে, যে ঘুষের ব্যবস্থা করবে সকলের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত। (মুসনাদে আহমাদ হা: নং ৬৫৪০)

৩১. হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ছয় প্রকার লোককে আমি লা'নত করেছি এবং সকল নবীগণ আ. লা'নত করেছেন। অথচ সকল নবীদের দু'আ ও বদ দু'আ কবুল হয়ে থাকে। যথা: ১. যারা বিকৃত করে কুরআনের অর্থ করবে। ২. যারা আল্লাহর সৃষ্টি তাকদীরকে অবিশ্বাস করবে। ৩. যারা আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালাল করবে। ৪. যারা জোর জবরদস্তী করে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের শক্তি অর্জন করত: দুষ্ট পাপী লোকদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করে নেতৃত্বের আসনে বসাবে। ৫. যার আমার (রুহানী ও জিসমানী) বংশধরদের অবমাননা করবে। ৬. যারা আমার উম্মত হয়ে আমার সুন্নাত (আমার প্রবর্তিত নীতি, আমার প্রদর্শিত পথ এবং আমার প্রকৃত আদর্শ) পরিত্যাগ করে ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন পথ ও ভিন্ন নীতি অনুসরণ করবে। (তিরমিযী: হা: নং ২১৫৪)

৩২. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপরও লা'নত করেছেন (অর্থাৎ, আল্লাহ যাতে তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি না করেন এ জন্য বদ দু'আ ও অভিশাপ দিয়েছেন) ও যে আল্লাহর ডাক (হাইয়া 'আলাস সলাহ, হাইয়া 'আলাল ফালাহ) (আসো তোমরা জীবনের স্বার্থকতার দিকে, নামাযের জামা'আতের দিকে) শ্রবণ সত্ত্বেও আদেশ পালন করেনি। অর্থাৎ শরীয়ত সম্মত উজর না থাকার সত্ত্বেও জামা'আতে উপস্থিত হয়নি।

৩৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর লা'নত তাদের উপর যারা জমিনের সীমানা বা সীমানার খুঁটি পরিবর্তন করে। (মুসলিম: হা: নং ১৯৭৮)

[হযরত খানভী রহ.-এর-জায়াউল আ'মাল নামক কিতাব থেকে সংগৃহীত]

## এটা কি কুরআন শরীফের প্রতি জুলুম নয়?

মহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব হারদুই রহ. বলেন,

১. নিজের ঘর বাড়ি, দোকান-পাট, খাওয়া-দাওয়া উত্তম থেকে অতি উত্তম ও দামী হওয়ার ফিকির করা হয়। অথচ কুরআন শরীফ তাজবীদের সাথে উত্তমরূপে তিলাওয়াতের ফিকির করা হয় না।

২. নিজের স্ত্রী কিংবা বন্ধুজনের চিঠি আসলে সে চিঠি পড়ানোর জন্য অস্থির হয়ে পড়তে জানা লোক তালাশ করা হয়। অথচ আল্লাহর কালাম কুরআন শরীফ জানবার জন্য অভিজ্ঞ আলেমের নিকট তাফসীর শোনার ফিকির করা হয় না।

৩. দারুল হাদীস তথা হাদীসের পাঠকক্ষকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় অথচ দারুল কুরআন তথা কুরআন শরীফ শিখার জন্য স্বতন্ত্র জায়গার ব্যবস্থা করা হয় না। স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকলেও তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না এবং উন্নত করা হয় না।

৪. ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তাদেরকে চেয়ারে বসানো হয়। অথচ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকারীকে চেয়ারে বসানো হয় না।

৫. বিভিন্ন সভা সমিতির শুরুতে লোক জমা করার জন্য কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করানো হয়। অথচ মূল বক্তব্য ও আলোচনা লোকজন এসে বসার পর করা হয়। তখন আর তিলাওয়াত করা হয় না।

৬. দারুল হাদীসে দামী ম্যাট-কার্পেট বিছানো হয়। অথচ দারুল কুরআন তথা হিফজ, নাজেরা, তাজবীদ ও কিরাআত বিভাগের কামরায় ছেঁড়া চট ও চাটাই বিছানো হয়।

৭. নিজের শরীর কেটে গেলে কিংবা ক্ষত হলে ততক্ষণাৎ মলম, পট্টি, ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করা হয়। অথচ কুরআন শরীফ ছিঁড়ে ও বাধাই বিহীন অবস্থায় অনাদরে ও অবহেলায় ফেলে রাখা হয়।

৮. নিজের আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হলে কাফন পরিয়ে তৎক্ষণাত দাফনের ব্যবস্থা করা হয়, অথচ আল্লাহর কালাম তথা কুরআন শরীফের পাতা ছিঁড়ে গেলে এবং পড়ার কাজে না আসলে তা অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়া হয়, কিংবা মসজিদে রেখে আসা হয়, অথবা পানির স্রোতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। স্মরণ রাখা উচিত কুরআন শরীফ পড়ার অনুযোগী হয়ে গেলে তা নতুন কাপড়ের মোড়কে সুগন্ধি মাখিয়ে যেখানে সাধারণ মানুষের চলাচলের সম্ভাবনা নেই এমন স্থানে দাফন করা উচিত।

৯. টেবিল, দরজা-জানালা আলমারীর উপর পর্দা লাগানো হয়, অথচ কুরআন শরীফকে কাপড় বিহীন খালি রাখা হয়।

১০. নিজের কাপড়-চোপড় রাখার জন্য শেঙ্ক, আলমারি এবং ওয়ারড্রুব ইত্যাদি বানানো হয়। অথচ কুরআন শরীফ গিলাফ বিহীন অবস্থায় অযত্নে অনাদরে রাখা হয়।

১১. নিজে তো পোশাক পরিধান করে অথচ কুরআন শরীফ বস্ত্রহীন-গিলাফ বিহীন রাখা হয়।

১২. নিজের এবং ছেলে-মেয়ের পোশাক ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় বাজারে ব্যয় করা হয়, অথচ কুরআন শরীফের গিলাফ সেলওয়ার-কামিজের উদ্বৃত্ত কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়।

১৩. নিজের কাপড়-চোপড় সপ্তাহে দুই-তিনবার ধৌত করা হয়, অথচ কুরআন শরীফের গিলাফ যিন্দেগীভর ধৌত করা হয় না।

১৪. নিজের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় ধোয়া পানির ন্যায় কুরআন শরীফের গিলাফ ধোয়ার পানি বাথরুমের ড্রেনে ফেলে দেয়া হয়। স্মরণ রাখা উচিত কুরআন শরীফের গিলাফ ধোয়া পানি বরকতের উদ্দেশ্যে ঘরের দেয়ালে ছিটিয়ে দিবে, কিংবা ফুলের টবে সম্মানের সাথে ঢেলে দিবে।

১৫. নিজের চেয়ার, খাট-পালঙ্কের পায়া ভেঙ্গে গেলে তা উল্টিয়ে ব্যবহার করা হয় না, অথচ কুরআন শরীফের চেয়ার-রিহাল ভেঙ্গে গেলে উল্টিয়ে ব্যবহার করা হয়।

১৬. প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী প্রমুখের জন্য স্বতন্ত্র চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়, অথচ কুরআন শরীফ এবং হাদীসের চেয়ার ভিন্ন ভিন্ন হয় না বরং যে রিহাল বা তে-পায়ার উপর আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তার উপরেই হাদীসের কিতাবে রেখে পাঠ করা হয়।

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. বলেন, কুরআন শরীফকে সম্মান কর, কুরআন শরীফ সহী-শুদ্ধ করে পড়, কুরআন শরীফের বাহককে সম্মান কর, তোমাদের অভাব থাকবে না।

## চতুর্থ অধ্যায়

### ইবাদাত

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের প্রচলিত ভুলসমূহ

১. হরফের মধ্যে- (ক) “য” এর মত নরম হবে, “ঝ” এর মত শক্ত নয় ।  
(খ) অনেকটা “জ” এর মত হবে, “দ” এর মত নয় । (গ) ও এর শুরু ও শেষে ঠোঁট গোল হবে এবং মাদ্দ করে পড়তে হবে।

২. সিফাতের মধ্যে- (ক) استطلا-এর প্রতি খেয়াল করা হয় না । (খ) حروف مستعليه এর মধ্যে ز এর সিফাত আদায় হয় না । (গ) إستعلاء কম হওয়া জরুরী ।

৩. হরকতের মধ্যে- (ক) َ যবর -এ আকার (ো) উচ্চারণ হবে । যফলা (যা)-এর মত, টেড়া উচ্চারণ ভুল । (খ) ِ যেরকে দাবিয়ে উচ্চারণ করতে হয়, “ে” -এর উচ্চারণ ভুল (গ) ُ পেশ উভয় ঠোঁট মিলার কাছাকাছি হবে, “ো” উচ্চারণ ভুল ।

৪. হরফে লীন- (ক) মারুফ পড়তে হয় كَيْف (কাইফা) কে কায়ফা, لَوْ (লাউ) কে লাও পড়া ভুল । (খ) নরম করে পড়তে হয়, ঝটকা দেয়া ভুল । (গ) তাড়াতাড়ি পড়তে হয়, মাদ্দ করা ভুল ।

(৫) মদদের ব্যাপারে- (ক) এক আলিফ এক দুই হরকত পরিমাণ টান হবে, বেশী টানা ভুল । (খ) তিন, চার বা পাঁচ আলিফ মদদের আওয়াজে তরঙ্গ সৃষ্টি করবে না । আওয়াজ নাকে নিবে না । মাদ্দে মুত্তাসিল ও মুনফাসিলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

৬. গুল্লাহ ও ইখফা- উভয়টার পরিমাণ এক আলিফ । ইখফা অনেকটা বাংলা অনুস্বর (ং) -এর মত এবং গুল্লাহ “ল্লা” এর মত । অনেকে ব্যতিক্রম করে থাকে, যা ভুল ।

৭. কুলকলাহ- সামান্য ধাক্কা দিয়ে পড়তে হয়, বেশী ধাক্কা দেওয়া ভুল । অবশ্য এসব অক্ষরে তাশদীদ থাকলে ওয়াকফকালে অক্ষরটি দুবার উচ্চারিত হয়। সাধারণ কুলকলার ন্যায় একবার উচ্চারণ করা ভুল। যেমন- ابي لهب و وثب

৮. ওয়াকফ এর অবস্থায়- (ক) ِ পরিকার শুনা যাবে, অধিকাংশেরই ِ শুনা যায় না । (খ) তেমনিভাবে অনেকেরই ে সাফ হয় না বরং নরম হামযার মত হয় । আবার কেউ কেউ শক্ত করে উচ্চারণ করে তাও ভুল । (গ) ُ এর উপর ওয়াকফ করার সময় অনেকে ে এর মত আওয়াজ বের করে, যা ভুল । (ঘ) ُ দাবিয়ে উচ্চারণ করতে হয় কিন্তু বেশী দাবানো ভুল । (ঙ) তাশদীদ যুক্ত ِ কে ওয়াক্ফের সময় অনেকে একটি ِ উচ্চারণ করে, যা ভুল, বরং ِ কে মাখরাজের মধ্যে সামান্য দেয়ী করে উচ্চারণ করবে, যাতে উভয় ِ উচ্চারিত

হতে পারে। উল্লেখ্য ۾ পুর ও বারিকের মধ্যে জরুরী অনেক কায়দা আছে। (হারদুয়ীর কায়দা দ্রষ্টব্য) (চ) ۽ মুশাদ্দাদ উচ্চারণে অনেকে “জ” এর মত আওয়াজ করে যা ভুল। বরং নরম করে, দু হরফ পরিমাণ উচ্চারণ করে আদায় করবে।

৯. লাহনে জলী- অনেকে ۽ (হামযাহ) কে ۽ (ইয়া) এবং ۽ (ইয়া) কে ۽ (হামযাহ) উচ্চারণ করে যা লাহনে জলী, যেমন- هُوَ الْاَيُّزُ-

এর মধ্যে কে ۽ এবং الَّيْلِ مِنْ تُلَّى এর মধ্যে ۽ কে উচ্চারণ করা ভুল।

১০. হরুফে মুকত্বাত- এর মধ্যে অনেকে তাজবীদের ইখফা, গুল্লাহ, ক্বলকলাহ, ইত্যাদি কায়দা জারী করে না, যেমন- كهيصص۔ উল্লেখ্য অনেকে নীরবে কিরা‘আত পড়ার সময় তাজবীদের কায়দা জারী করে না। এ কারণে যুহরের নামায কিরা‘আত লম্বা হওয়া সত্ত্বেও ৪/৫ মিনিটে শেষ হয়ে যায়, যা মারাত্মক ভুল। কারণ তাজবীদ তিলাওয়াতের হক। চাই তিলাওয়াত নীরবে হোক বা আওয়াজ করে করা হোক।

১১. ইমামের জন্য যুহর, আসর এবং দিনের বেলায় সুন্নাত ও নফল নামাযে কিরা‘আত আস্তে পড়া এবং ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু‘আ, দুই ঈদ, তারাবীহ ও রমযান মাসের বিতর নামাযে কিরা‘আত শব্দ করে পড়া। (মারাসীলে আবু দাউদ, হাঃ নং ৪১/ মুসল্লাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাঃ ৫৭০০/ মুসল্লাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাঃ নং ৫৪৫২)

বি.দ্র. আস্তে পড়ার অর্থ মনে মনে নয়, কারণ তাতে নামায শুদ্ধ হয় না। বরং আওয়াজ না করে মুখে পড়া জরুরী।

১২. সালাম-এর মাধ্যমে নামায শেষ করা। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৯৯৬)

বি.দ্র.- উল্লেখিত ওয়াজিব সমূহের মধ্য হতে কোন একটি ওয়াজিব ভুলে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। সিজদায়ে সাহু না করলে বা ইচ্ছাকৃত কোন ওয়াজিব তরক করলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে। (প্রমাণ : শামী, ১ : ৪৫৬/ আলমগীরী, ১ : ৭১/ আল বাহরুর রায়িক, ১ : ৫১০)

## পঞ্চম অধ্যায়

### নামাযের ফরয ওয়াজিব ও সুন্নাত

#### নামাযের ফরয ১৩টি

## নামাযের বাইরে ৭ ফরয

১. শরীর পাক হওয়া। (সূরায়ে মায়িদা:৬)
২. কাপড় পাক হওয়া। (সূরায়ে মুদ্দাসসির:৪)
৩. নামাযের জায়গা পাক হওয়া। (বাকারা: ১২৫)
৪. ছতর ঢাকা (অর্থাৎ, পুরুষগণের নাভি হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত এবং মহিলাদের চেহারা, কজি পর্যন্ত এবং পায়ের পাতা ব্যতিরেকে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা।) (বাকারা-৩১)
৫. কিবলামুখী হওয়া। (বাকারা-১৪৪)
৬. ওয়াক্তমত নামায পড়া। (নিসা-১০৩)
৭. অন্তরে নির্দিষ্ট নামাযের নিয়ত করা। (বুখারী হা: নং ১)

## নামাযের ভেতরে ৬ ফরয

১. তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ, শুরুতে আল্লাহ আকবার বলা। (মুদ্দাসসির: ৩)
২. ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া। (বাকারা-২৩৮)
৩. কিরাত পড়া। (মুযযামিল:২০)
৪. রুকু করা। (হজ্জ-৭৭)
৫. দুই সিজদা করা। (প্রাণ্ডক্ত)
৬. শেষ বৈঠক করা। (আবু দাউদ হা: নং ৯৭০)

## নামাযের ওয়াজিব ১৪টি

১. সূরায়ে ফাতিহা পূর্ণ পড়া। (বুখারী হা: নং ৭৫৬)
২. সূরাহ ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা কিংবা ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত মিলানো। (বুখারী হা: নং ৭৭৬, মুসলিম হা: নং ৪৫১)
৩. ফরযের প্রথম দুই রাকাআতকে কিরাতের জন্য নির্ধারিত করা। (বুখারী হা: নং ৭৭৬, মুসলিম হা: নং ৪৫১)
৪. সূরায়ে ফাতিহাকে অন্য সূরার আগে পড়া। (তিরমিযী হা: নং ২৪৬, তহাবী হা: নং ১১৭২)
৫. নামাযের সকল রোকন ধীর স্থিরভাবে আদায় করা। (আবু দাউদ হা: নং ৮৫৬-৮৫৮)
৬. প্রথম বৈঠক করা। (বুখারী হা: নং ৮২৮)
৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যা তু পড়া। (বুখারী হা: নং ৮৩০, ৮৩১, মুসলিম হা: নং ৪০২, ৪০৩)
৮. প্রত্যেক রাকাআতের ফরয এবং ওয়াজিবগুলোর তারতীব বা সিরিয়াল ঠিক রাখা।
৯. ফরয ও ওয়াজিবগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে আদায় করা। (বাদায়িউস সানায়ে: ১/৬৮৯)

১০. বিতরের নামাযে তৃতীয় রাকাআতের ক্বিরাতে পর কোন দুআ পড়া। অবশ্য দুআয়ে কুনূত পড়লে ওয়াজিবের সাথে সাথে সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে।

১১. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা। (আবু দাউদ হা: নং ১১৫৩)

১২. দুই ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকাআতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার পর রুকুর জন্য ভিন্নভাবে তাকবীর বলা। (ইবনে আকি শাইবা হা: নং ৫৭০৪)

১৩. ইমামের জন্য যুহর আসর এবং দিনের বেলায় সুন্নাত ও নফল নামাযে কিরা‘আত আস্তে পড়া, এবং ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু‘আ, দুই ঈদ, তারাবীহ ও রমাযান মাসের বিতর নামাযে কিরা‘আত শব্দ করে পড়া। (মারাসীলে আবী দাউদ হা: নং ৪১, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক হা: নং ৫৭০০ মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা: নং ৫৪৫২)

১৪. সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা। (আবু দাউদ হা: নং ৯৯৬)

### নামাযের ৫১ সুন্নাত

#### ক. দাঁড়ানো অবস্থায় সুন্নাত ১১টি

১. উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখা এবং উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল, ঊর্ধ্বে এক বিঘত পরিমাণ ফাঁক রাখা। (সুনানে নাসায়ী হা: নং ৮৯২/ ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী, ১:৭৩)

২. তাকবীরে তাহরীমার সময় চেহারা কিবলার দিকে রেখে নজর সিজদার জায়গায় রাখা এবং হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো। (তিরমিযী, হা: নং ৩০৪/ মুত্তাদরাকে হাকেম, ১১৭৬১)

৩. উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। অর্থাৎ, উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা কানের লতী পর্যন্ত উঠানো। (মুসলিম হা: নং ৩৯১)

৪. হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলসমূহ সহ উভয় হাতের তালু কিবলামুখী রাখা। (তাবারানী আউসাত, হা: নং ৭৮০১)

৫. আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাখা অর্থাৎ, একেবারে মিলিয়েও না রাখা, আবার বেশী ফাঁক ফাঁক করেও না রাখা। (মুত্তাদরাক, হা: নং ৮৫৬)

৬. ইমামের তাকবীরে বলার পর সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা বলা। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা যেন ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে শেষ না হয়। এক্রপ হলে মুক্তাদীর নামায হবে না। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৩৪, মুসলিম, হা: নং ৪১৪, ৪১৫)

৭. হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের (পাতার) উপর রাখা। (আবু দাউদ, হা: নং ৭২৬/ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হা: নং ৩৯৪২)

৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়া বাম হাতের কজি ধরা। (তিরমিযী, হা: নং ২৫২/ ইবনে মাজাহ, হা: নং ৮১১)

৯. অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর স্বাভাবিকভাবে বিছিয়ে রাখা। (ফাতহুল কাদীর, ১:২৫০)

১০. নাভীর নীচে হাত বাঁধা। (আবু দাউদ, হা: নং ৭৫৬/ আলমগিরী ১:৭৩)

১১. ছানা পড়া। (আবু দাউদ, হা: নং ৭৭৫, ৭৭৬)

### খ. কিরাআতের সুন্নাত ৭টি

১. প্রথম রাকাআতে ছানা পড়ার পর পূর্ণ আ'উযুবিলাহ পড়া। (আবু দাউদ, হা: নং ৭৬৪/ ইবনে মাজাহ, হা: নং ৮০৭)

২. প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলানোর পূর্বে পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া। (নাসায়ী শরীফ, হা: নং ৯০৫)

৩. সূরাহ ফাতিহার পর সকলের জন্য (নীরবে) 'আমীন' বলা। (সুনানে দারাকুতনী, হা: নং ১২৫৬/ বুখারী শরীফ হা: নং ৭৮০)

৪. ফজর এবং যোহরের নামাযে তিওয়ালা মুফাসসাল (লম্বা কিরা'আত) অর্থাৎ, সূরা 'হুজুরাত' থেকে সূরা 'বুরূজ' পর্যন্ত, আসর এবং ইশার নামাযে আউসাতে মুফাসসাল (মধ্যম কিরা'আত) অর্থাৎ, সূরা 'তুরিক' থেকে সূরাহ 'লাম-ইয়াকুন' পর্যন্ত এবং মাগরিবে ক্বিসারে মুফাসসাল (ছোট কিরা'আত অর্থাৎ, সূরা 'ইযা-যুলযিলাত' থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত) থেকে প্রতি রাকাআতে যে কোন একটি সূরা বা কোন কোন সময় বড় সূরা থেকে এ পরিমাণ কিরা'আত পড়া। (নাসায়ী শরীফ, হা: নং ৯৮৩/ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ২৬৭২)

৫. ফজরের প্রথম রাকাআত দ্বিতীয় রাকাআত অপেক্ষা লম্বা করা। অন্যান্য ওয়াক্তে উভয় রাকাআতে কিরা'আতের পরিমাণ সমান রাখা উচিত। (মুসলিম শরীফ, হা: নং ৪৫১, ৪৫২)

৬. কিরা'আত অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বা একেবারে ধীর গতিতে না পড়া, বরং মধ্যম গতিতে পড়া। (মুসলিম শরীফ, হা: নং ৭৩৩)

৭. ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৬৬)

### গ. রুকুর সুন্নাত ৮টি

১. তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৮৯)

২. উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৯০)

৩. হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে ছড়িয়ে রাখা। (আবু দাউদ, হা: নং ৭৩১)

৪. উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা। (আবু দাউদ, হা: নং ৭৩৪)

৫. পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা। হাঁটু সামনের দিকে বাঁকা না করা। (আবু দাউদ, হা: নং ৮৬৩)

৬. মাথা, পিঠ ও কোমর সমান রাখা, উঁচু-নীচু না করা এবং পায়ের দিকে নজর রাখা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৪৯৮)

৭. রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম) পড়া। (আবু দাউদ, হা: নং ৮৮৬)



৮. রুকু হতে উঠার সময় ইমামে ‘সামি’আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ্ এবং মুক্তাদীর ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ এবং একাকী নামায আদায়কারীর উভয়টি বলা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৮৯, ৭৩৩/আলমগীরী, ১:১২)

বি:দ্র: রুকু থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থিরভাবে দাঁড়ানো জরুরী। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০০, ৮০১, ৮০২)

## ঘ. সিজদার সুন্নাত ১২টি

১. তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০৩)

বি: দ্র:- সিজদায় যাওয়া ও সিজদা হতে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর এক আলিফ থেকে অধিক টানা উচিত নয়। অবশ্য হদর এবং তারতীলের পার্থক্য থাকবে। (শামী, ১:৪৮০)

২. প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা। (নাসায়ী, হা: নং ১০৮৯/আবু দাউদ, হা: নং ৮৩৮)

৩. তারপর হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত দূরে উভয় হাত রাখা এবং হাতের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে রাখা। (মুসনাদে আহমাদ, হা: নং ১৮৮৮২/ সহীহ ইবনে খুযাইমাহ হা: নং ৬৪৩)

৪. তারপর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা বরাবর নাক রাখা। (মুসনাদে আহমাদ, হা: নং ১৮৮৮০)

৫. তারপর কপাল রাখা। (মুসনাদে আহমাদ, হা: নং ১৮৮৮০)

৬. অতঃপর দুই হাতের মাঝে সিজদা করা এবং দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে রাখা। (মুসলিম, হা: নং ৪০১/ মুত্তাদিরাকে হাকেম, হা: নং ১৭৬১)

৭. সিজদায় পেট উরু থেকে পৃথক রাখা। (মুসনাদে আহমাদ, হা: নং ২৩৬৬২/ আবু দাউদ, হা: নং ৭৩৫)

৮. পাজিরদ্বয় থেকে উভয় বাহু পৃথক রাখা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০৭)

৯. কনুই মাটি ও হাঁটু থেকে পৃথক রাখা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০৮)

১০. সিজদায় কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা) পড়া। (ইবনে মাজাহ, হা: নং ৮৮৮)

১১. তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদা হতে উঠা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮২৫)

১২. প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত বুক সম্পূর্ণ সোজা রাখা জরুরী। বিনা ওজরে বুক ঝুঁকিয়ে সিজদায় গেলে একাধিক রুকুর সাদৃশ্য হয়ে সুন্নাতের খেলাফ হবে। দু’সিজদার মাঝে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির হয়ে বসা জরুরী। (আবু দাউদ, হা: নং ৮৩৮/ শামী, ১:৪৬৪)

## ঙ. নামাযে বসার সুন্নাত ১৩টি

১. বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। ডান পা সোজা ভাবে খাড়া রাখা। উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ সাধ্যমত কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। (নাসায়ী, হা: নং ১১৫৮)

২. উভয় হাত রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং দৃষ্টি দুই হাঁটুর মাঝে বরাবর রাখা। (মুসনাদে আহমাদ হা: নং ১৬১০৬)
৩. ‘আশহাদু’ বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা এক সাথে মিলিয়ে গোলাকরা বৃত্ত বানানো এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় মুড়িয়ে রাখা এবং ‘লা-ইলাহা’ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর ইল্লাল্লাহু বলার সময় আঙ্গুলের মাথা ঝুঁকানো হাঁটুর সাথে না লাগানো। (আবু দাউদ, হা: নং ৭২৬ নাসাঈ, হা: নং ১২৭৪)
৪. আখেরী বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতে পড়ার পর দরুদ শরীফ পড়া। (তিরমিযী, হা: নং ৩৪৭৭)
৫. দরুদ শরীফের পর দু’আয়ে মাছুরা পড়া। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮৩৪/তিরমিযী, হা: নং ৫৯৩)
৬. উভয় দিকে সালাম ফিরানো। (তিরমিযী, হা: নং ২৯৫)
৭. ডান দিকে আগে সালাম ফিরানো। উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে আরম্ভ করা এবং সালামের সময় দৃষ্টি কাঁধের দিকে রাখা। (মুসলিম হা: নং ৫৮২)
৮. ইমামের উভয় সালামে মুক্তাদী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসলিম, হা: নং ৪৩১)
৯. মুক্তাদীগণের উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ৩১৪৯, ৩১৫২)
১০. একাকী নামাযী ব্যক্তি শুধু ফেরেশতাগণের প্রতি সালাম করার নিয়ত করা। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ৩১৪০)
১১. মুক্তাদীগণের ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই সালাম ফিরানো। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮৩৮)
১২. দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম অপেক্ষা আস্তে বলা। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হা: নং ৩১৫৬)
১৩. ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শেষ হলে মাসবুকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ানো। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ৩১৫৬)

### নামাযের প্রচলিত ভুলসমূহ

১. দাগের উপর বা দাগে আঙ্গুল রেখে দাগের পিছনে দাঁড়ানো। এতে কাতার কখনো সোজা হয় না। নিয়ম হল দাগে গোড়ালী রেখে দাঁড়ানো।
২. কাতার ইমামের ডানে বাড়িয়ে ফেলা। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী: ১/৮৭)
৩. সামনের কাতারে খালী জায়গা রেখে পিছনের কাতারে বসে থাকা বা দাঁড়ানো। (রদ্দুর মুহতার: ১/৮৭)

৪. জামা‘আত শুরু হওয়ার পর কাতারে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়া। (মাসায়িলে নামায: ৮৭)

৫. ইকামাত চলাকালীন সময়ে দুহাত বেঁধে রাখা, ইকামাতের জওয়াব না দেয়া। (ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া:৩/১৪)

৬. তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা ঝুঁকানো। (তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং ৩০৪, মুস্তাদরাক, হা: নং ১৭৬১)

৭. শীতের সময় হাত চাদরের ভেতর রেখেই তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানো। (রদ্দুল মুহতার:১/৪৭৮)

৮. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি পর্যন্ত না উঠানো এবং হাতের তালু কিবলামুখী করে না রাখা। (মুসলিম শরীফ, হা: নং ৩৯১)

৯. আরবী নিয়্যাতকে বা নিয়্যাত মুখে বলাকে জরুরী মনে করা। (ফাতহুল বারী: ১/১৬)

১০. ইমামের তাকবীরে তাহরীমা শেষ হওয়ার আগেই মুক্তাদীর তাকবীর শেষ করে দেয়া এতে ইকতিদা সহীহ হয় না। (মুসলিম শরীফ, হা: নং ৪১৪,৪১৫, বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৩৪)

১১. দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী না করে ডানে বামে করে রাখা। (নাসায়ী শরীফ, হা: নং-৮৯২)

১২. দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা ঝুঁকিয়ে রাখা। (তিরমিযী শরীফ হা: নং৩০৪)

১৩. পুরুষের বুকের উপর বা নাভি পেঁচিয়ে হাত বাঁধা। (আবু দাউদ, হা: নং ৭৫৬, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী:১/৭৩)

১৪. আস্তে কিরা‘আত পড়ার সময় মদ, গুল্লাহ, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করা।

১৫. মাসনুন কিরা‘আতের প্রতি লক্ষ্য না রাখা। যেমন ফজর ও যুহরে লম্বা কিরা‘আত পড়া সুন্নাত যা সাধারণতঃ পড়াই হয় না। মাগরিবে সংক্ষিপ্ত কিরা‘আত পড়া সুন্নাত সেখানে অনেকে লম্বা কিরা‘আত পড়ে থাকে এবং ইশাতে মধ্যম কিরা‘আত পড়া সুন্নাত সেখানে মাগরিবের ন্যায় ছোট সূরা পড়া এ সবই সুন্নাতের খেলাফ। (মুসলিম শরীফ, হা: নং ৭৩৩)

১৬. রুকু অবস্থায় মাথা পিঠ এবং কোমর বরাবর করে না রাখা বরং হাঁটু বাঁকা করে রাখা। (মুসলিম শরীফ, হা: নং-৪৯৮, বুখারী শরীফ, হা: নং-৮৬৩)

১৭. রুকু অবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা। কনুই বাঁকা করে রাখা এবং তাড়াহুড়া করা। (আবু দাউদ হা: নং-৭৩১,৭৩৪)

১৮. রুকু থেকে উঠার পর সোজা স্থির হয়ে না দাঁড়িয়েই তাড়া ছড়া করে সিজদায় চলে যাওয়া। (বুখারী শরীফ হা: নং-৮০০,৮০১,৮০২)

১৯. সিজদায় যাওয়ার সময় বিনা উযরে বুক বা মাথা ঝুঁকিয়ে সিজদায় যাওয়া। (আবু দাউদ হা: নং-৮৩৮, রদুল:১/৪৬৪)

২০. সিজদায় দু'হাতের আঙ্গুলসমূহ ছড়িয়ে রাখা এবং কান বরাবর না রাখা। (মুসনাদে আহমাদ, হা: নং-১৮৮৮২, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং-৬৪৩)

২১. সিজদার সময় উভয় পায়ের মাঝে দাঁড়ানোর ন্যায় চার আঙ্গুল ফাঁক না রাখা বা গোড়ালী মিলিয়ে রাখা। পায়ের আঙ্গুলী কিবলামুখী করে না রাখা এবং পা যমীন থেকে উঁচু করে রাখা।

২২. দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে না বসা। (আবু দাউদ, হা: নং ৮৫৬,৮৫৭,৮৫৮)

২৩. সিজদা থেকে উঠার সময় বিনা উযরে যমীনে টেক লাগানো। সিনা ও মাথা ঝুঁকিয়ে রাখা।

২৪. উভয় সালাম ফিরানোর সময় কারো নিয়্যাত না করা। (মুসলিম শরিফ, হা: নং-৪৩১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং-৩১৪০,৩১৪৯,৩১৫২)

২৫. মুনাজাতের সময় হাতের তালু আসমানের দিকে না রাখা। (তাবারানী কাবীর, হাদীস নং ৩১৪২)

২৬. মুনাজাতের সময় হাত একেবারে মিলিয়ে রাখা অথবা অনেক ফাঁক করে রাখা কিংবা হাত দ্বারা দড়ি পাকানোর মত করতে থাকা। বা হাত নমস্কারের মত করে রাখা। (হিসনে হাসীন, ত্বাহাবী ২০৫, সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৫৫)

২৭. আল্লাহুন্মা আমীন বলে দু'আ শুরু করা। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ৩৪৭৬)

২৮. কালিমায়ে তায়্যিবা বা বাহকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে মুনাজাত শেষ করা। (তাবারানী কাবীর, হাদীস নং ৫১২৪, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৩১১৭, আবু দাউদ হাদীস নং ৯৩৮)

বি: দ্র: নামাযের প্রচলিত ভুলসমূহ বিস্তারিত জানার জন্য নবীজীর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত নামক পুস্তিকা ৫০-৬৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

### জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব

জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার ব্যাপারে শরী'আতে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

(ক) কুরআনে কারীমে মহান রাক্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। অর্থাৎ, মসজিদে জামা‘আতের সাথে নামায আদায় কর। (সূরা বাকারা, ৪৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা, তাফসীরে মাজহারী-১/৬৩)

### জামা‘আতের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

(খ) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐ স্বত্তার কসম যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আমার মনে চায় যে লোকদেরকে প্রথমে কাষ্ঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই, অতঃপর একজনকে জামা‘আত কায়িম করার হুকুম দেই এরপর ঐ সকল পুরুষদের কাছে যাই যারা জামা‘আতে হাজির হয়নি এবং তাদের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৪৪)

(গ) হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার এমন কোন সাহায্যকারী নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে যাবে। এই বলে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ঘরে নামায পড়ার অনুমতি চাইলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু পরক্ষণই তাঁর চলে যাওয়ার মুহূর্তে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাস করলেন, তুমি কি আযান শোন? তিনি জওয়াব দিলেন হ্যাঁ। আযান শুনতে পাই। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তাহলে তুমি মসজিদে এসে জামা‘আতের সাথে নামায আদায় করবে। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং-৬৫৩)

উল্লেখ্য যে, অন্ধ ব্যক্তির জন্য জামা‘আতে উপস্থিত হওয়া জরুরী না থাকা সত্ত্বেও জামা‘আতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এবং বিশিষ্ট সাহাবী হওয়ার কারণে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জামা‘আতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

(ঘ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আমাদের যুগে আমি দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক এবং অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ জামা‘আত ত্যাগ করত না। এমনকি কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি দুই জনের কাঁধে ভর করে হাটতে পারত তবে সেও মসজিদে এসে জামা‘আতে শরীক হত। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং-৬৫৪)

### জামা‘আতে নামায পড়ার ফযীলত

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জামা‘আতের সাথে আদায়কৃত নামায একাকী নামাযের চেয়ে ২৭ গুন বেশী ফযীলতপূর্ণ। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৪৫)

(২) হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.-এর সূত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা‘আতের সাথে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা‘আতের সাথে আদায় করল, সে যেন সারারাত নামায পড়ল। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৬৫৬)

(৩) হযরত আনাস রাযি.-এর সূত্রে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য লাগাতার ৪০ দিন ক্রমাগত তাকবীরে উলার সাথে জামা‘আতে নামায আদায় করবে, তার জন্য দুটি সনদ লিখে দেয়া হবে, ১টি হল তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির। অপরটি হল মুনাফেকীর ফিরিস্তি থেকে মুক্তির। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং-২৪১)

(৪) হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত- অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে যতদূরে অবস্থান করে, সে দূর থেকে মসজিদে আসার দরুন ততবেশী সওয়াবে অধিকারী হবে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৫১, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৬৬২)

(৫) হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত- অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে উঠে করে ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদ পানে রওনা হল, সে ইহরাম বেঁধে গমনকারীর প্রাপ্ত সওয়াবের পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে। (আবু দাউদ শরীফ হাদিস নং ৫৫৮)

### **জামা‘আতের সাথে নামায আদায়ের কিছু উপকারিতা**

(১) দীনী মাসাইল ইত্যাদি সম্পর্কে অনবগত লোকেরা উলামায়ে কিরাম থেকে দীন শিক্ষা করতে পারে।

(২) মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়।

(৩) ধনী ব্যক্তির অভাবীদের অবস্থা ও প্রয়োজনাতি সম্পর্কে সহজে অবগতি লাভ করতে পারে।

(৪) মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) বিধর্মীদের উপর মুসলমানদের প্রভাব সৃষ্টি হয় ইত্যাদি। (আলবাহরুর রায়েক ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৬।) ফতওয়ায়ে শামী-১/৫৫১, মারাকিল ফালাহ-১৫৬)

## জামাত ত্যাগকারীদের ব্যাপারে হযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সতর্ক বাণী

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, যে ব্যক্তিকে এ কথা আনন্দ দান করে যে কাল কিয়ামতের দিন সে মুসলমান হিসেবে আল্লাহ তা‘আলার সহিত মিলিত হবে সে যেন ফরয নামায সমূহকে এমন স্থানে আদায়ের ইহতিমাম করে যেখানে আযান দেয়া হয় অর্থাৎ, মসজিদে, কেননা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নবীর জন্য এমন সুন্নাতসমূহ জারী করেছেন, যা হিদায়াতপূর্ণ। আর জামা‘আতের সাথে নামায আদায় নিশ্চিতরূপে সুনানে হুদা তথা হিদায়াতের আলোদানকারী সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা ঐ সকল লোকদের অর্থাৎ, মুনাফিকদের ন্যায় গৃহাভ্যন্তরে নামায পড়তে আরম্ভ কর তাহলে তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে ছেড়ে দিলে। আর যদি তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে ছেড়ে দাও তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং-৬৫৪)

২. হযরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে গ্রামে বা মাঠে তিনজন লোক থাকে অথচ তারা সেখানে জামা‘আতের সাথে নামায আদায় করে না, শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সুতরাং তোমরা জামা‘আতকে জরুরী মনে কর, কেননা দলত্যাগী বকরীকে বাঘে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং-৫৪৭, মুস্তাদরাকে হাকেম হাদীস নং-৯০০, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-২৭৫৮২)

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল অতঃপর কোন শরয়ী উযর না থাকা সত্ত্বেও মসজিদে আসল না, তার নামায কবূল হবে না। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন উযর কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন অসুস্থতা বা ভয়ভীতি। (আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং-৫৫১, মুস্তাদরাকে হাকেম হাদীস নং-৮৯৬, ইবনে মাজা হাদীস নং-৭৯৩)

৪. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: হয়তো লোকেরা জামা‘আত তরক করা থেকে বিরত হোক, না হয় তাদের ঘর-বাড়ীগুলো জ্বালিয়ে দিব। (ইবনে মাজা হাদীস নং-৭৯৫)

### পর্যালোচনা

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের আলোতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. জামা‘আতের সাথে নামায আদায় করা ফরযে আইন বলেছেন, এবং ইমাম শাফেয়ী রহ. ফরযে কেফায়া বলেছেন। আর ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.



সক্ষম পুরুষদের জন্য জামা‘আতকে ওয়াজিব বলেছেন। হানারী মাযহাবের কোন কোন কিতাবে জামা‘আতকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বলা হলেও বিশুদ্ধ ও মজবুত মতানুযায়ী তার অর্থ হল মজবুত এবং শক্তিশালী হাদীস ও সুন্নাতের মাধ্যমে জামা‘আতে শরীক হওয়া ওয়াজিব প্রমাণিত। (আলবাহরুর রায়েক-১/৬০২, আল ফিকহুল ইসলামী-২/১১৬৭, শামী-১/৫৫২, বাদায়ে-১/১৫৫, ফাতহুল কাদীর-১/৩০০, মাহমুদিয়া-৭/১৩১, আলমগীরী-১/৫৩, রহীমিয়া-১/২১৩)

সুতরাং জামা‘আতের সাথে নামায আদায় করার ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী। বর্তমানে অধিকাংশ লোকেরা জামা‘আতের ব্যাপারে যে অলসতা করেছে এবং ঘরে বা দোকানে অফিসে একাকী নামায পড়ে নিচ্ছে তা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতা। আর নামায তরক করাতে কুফরী কাজ, যা কোন মুসলমানের জন্যই শোভা পায় না। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে নামাযী হওয়ার এবং সক্ষম পুরুষদেরকে জামা‘আতের সাথে নামায পড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

**যে সমস্ত উষরের কারণে জামা‘আত তরক করা জায়েয**

(১) প্রবল বৃষ্টি (২) অতিরিক্ত ঠাণ্ডা (৩) হিংস্র জন্তু বা ডাকাতির ভয়-ভীতি (৪) ঘুটঘুটে অন্ধকার (৫) বন্দীত্ব (৬) অন্ধত্ব (৭) পঙ্গুত্ব (৮) হাত পা না থাকা (৯) ভীষণ অসুস্থতা (১০) চলতে অক্ষম হওয়া (১১) রাস্তা কাদাযুক্ত হওয়া (১২) খোড়া হওয়া (১৩) অতিরিক্ত বার্ধক্য (১৪) ফিকহ শাস্ত্রের পাঠ্য আলোচনায় লিপ্ত থাকা (১৫) অতিরিক্ত ক্ষুধার সময় খাদ্য উপস্থিত থাকলে (১৬) সফরের ইচ্ছা করা ও তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া (১৭) রোগীর শুশ্রূষা করা (১৮) প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়া। (নূরুল ঈজাহ-৭৯, তাহতাবী-১৬২/১৬৩, তোহফায়ে আবরার-৭৭)

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### মসজিদের মাসাইল

**ভূমিকা:** আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন: আল্লাহ তা‘আলার (ঘর) মসজিদ আবাদ তারাই করবে, যারা আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কাউকেই ভয় করে না। তাদের ব্যাপারে আশা করা যায়, এরা হেদায়াত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরায়ে তাওবা আয়াত নং ১৮)

মসজিদ হল হেদায়াতের মারকায বা কেন্দ্র। কোন মসজিদ সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালিত হলে সে মহল্লায় অবশ্যই সুন্নাত ও দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন যে তোমরা



মসজিদ ও মাদরাসাকে সুন্নী বানাও তাহলে পুরা মহল্লা সুন্নী হয়ে যাবে। সুতরাং মসজিদ সুন্নী বানানোর জন্য যা করণীয় সংক্ষেপে তা নিম্নে পেশ করা হল।

১. মসজিদ গুরুর সীমানা নির্ধারণ করে দিবে, যাতে নতুন লোকেরাও সঠিক স্থান থেকে মসজিদে ঢোকার ও বের হওয়ার দু'আ পড়তে সক্ষম হয়। অনেক মসজিদে এ ব্যাপারে পেরেশানী উঠাতে হয়। বারান্দা মসজিদে শামিল কিনা বুঝা যায় না। সুতরাং কোন খাম্বা ইত্যাদিতে লিখে রাখতে হবে যে, “মসজিদ এখান থেকে শুরু।” (ইবনে মাজা হাদীস নং ৭৭৩)

২. মসজিদের গেইটে মসজিদে ঢোকার দু'আ লিখতে চাইলে পূর্ণ তিনটা বা ইস্তিগফারসহ চারটা লিখবে। অনুরূপভাবে বের হওয়ার সময়ে সবগুলো দু'আ লিখবে। বর্তমানে প্রায় মসজিদে ঢোকা ও বের হওয়ার একটা করে দু'আ লিখা হয়। এরূপ করা ঠিক নয়। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। লোকেরা মনে করে মাত্র এটুকুই মসজিদে ঢোকার ও বের হওয়ার দু'আ। (ইবনে মাজা হাদীস নং ৭৭১, তিরমিযী হাদীস নং ৩১৪)

৩. মসজিদের উযু খানা এমনভাবে নির্মাণ করবে যাতে পানি অপচয় না হয়, নতুবা এর গুনাহ প্রত্যেক মুসল্লী পৃথক ভাবে পাবে। আর মসজিদ কর্তৃপক্ষের উপর গুনাহের সমষ্টি বর্তাবে। (সূরায়ে বনী ইসরাঈল আয়াত নং ২৭)

এ উযু দ্বারা নামায জাযিয় হলেও অপচয়ের কারণে তা হারাম উযুতে পরিণত হয়। সুতরাং মসজিদের হাউজ থাকা ভাল। আর যদি টেপ সিস্টেম হয় তাহলে হয়ত তার সাথে বদনা রাখবে অথবা এমন টেপ লাগাবে যেখানে হাত সরানোর সাথে সাথে পানি বন্ধ হয়ে যায়। অথবা লিখিত ভাবে এবং মৌখিকভাবে মুসল্লীদের বার বার বুঝাতে থাকবে যাতে তারা উযু করার সময় টেপ প্রয়োজন মত বার বার খুলবে এবং বার বার বন্ধ করবে। একবার খুলে উযু সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবে না। তাহলে আশা করা যায় পানির অপচয় বন্ধ হবে। (সূরা মায়িদা: ২, তিরমিযী: হা: নং ২৬৭৫)

৪. মসজিদের মুসল্লীদের খেদমত ও আরামের জন্য প্রত্যেক মসজিদের নিজস্ব পেশাবখানা ও পায়খানা থাকা জরুরী। মসজিদ কমিটির জন্য এর ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। এবং এগুলো সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং রাখার জন্য কোন খাদেম নিয়োগ দিবে। পেশাবখানা দিয়ে উযু খানার পানি প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবে। যাতে এগুলো থেকে কোন দুর্গন্ধ না ছড়ায়। এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। (সূরায়ে তাওবা আয়াত নং ১০৮)

অনেক মসজিদে তো এগুলোর কোন ব্যবস্থাই করা হয় না যা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে, আবার অনেক এলাকায় মসজিদের

নিকটবর্তী স্থানে এগুলো তৈরী করা হয় এবং সাফাইয়ের উত্তম ব্যবস্থা করা হয় না, এমনকি যারা জরুরত পুরা করতে সেখানে যায় তারা নাপাক হয়ে ফিরে আসে এবং এগুলো থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ায়। এমনকি মসজিদ থেকেও দুর্গন্ধ অনুভব করা যায়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁচা পিয়াজ খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী হা: নং ১৮০৬)

৫. মুসল্লীদের কষ্ট হয় এমন কাজ করতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শক্তভাবে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী হা: নং ২৪৬-৪৭)

সুতরাং মসজিদে মুসল্লীদের জন্য আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবে। পূর্ণ মসজিদে সম্ভব না হলে অন্তত দুই অথবা চার কাতারে এ ব্যবস্থা করবে। তাও সম্ভব না হলে বয়স্ক মুসল্লীদের জন্য কিছু সংখ্যক মুসল্লী নির্ধারণ করে দিবে। যাতে তারা আরামের সাথে নামায আদায় করতে পারেন। জওয়ানরা বৃদ্ধদের এ সমস্যা বুঝতে সক্ষম নয়, তাই তারা গরমের মৌসুমে সকল বিছানা উঠিয়ে ফেলতে চায়। এটা ঠিক নয়।

মসজিদের জন্য দুই সেট বিছানা রাখবে যাতে করে একটা পরিষ্কার করার সময় অপরটা বিছানো যায়। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ২১২, আবু দাউদ হাদীস নং ৩৩৫, ৩৮২২)

৬. মসজিদের সামনের দেয়ালে কিছু লিখবে না বা লেখা টাঙ্গাবে না। এবং রংবেরঙের নকশা ও কারুকার্য করবে না। এতে মুসল্লীদের নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। যা নামাযের রুহ। জরুরী কোন লেখা টাঙ্গাতে হলে দুই পাশের দেয়ালে বা পিছনের দেয়ালে তার ব্যবস্থা করবে। (দূররে মুখতার: ১/৬৫৮)

৭. মেহরাবের মধ্যে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান কাতারের ঠিক মাঝখানে যেন হয় এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় পার্শ্বের মুসল্লী যাতে সমান হয়। নতুবা বিনা ঠেকায় কাতার কোন একদিকে বেশী হয়ে গেলে মাকরুহ হবে। সর্বশেষ অসম্পন্ন কাতারেও উভয় পার্শ্ব সমান মুসল্লী থাকতে চেষ্টা করবে। (আবু দাউদ হাদীস নং ৬৮১)

৮. অধিকাংশ স্থানে মসজিদের ঠিক মাঝে মেহরাব তৈরী করে তার ডান পার্শ্ব মিস্বর তৈরী করে। এতে ইমাম বাম দিকে চেপে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এটা মাকরুহ। সুতরাং মেহরাব তৈরী করার সময় এ ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবে মেহরাব যদি বড় আকারের হয় তাহলে তার ডান পার্শ্ব মিস্বর বানানো সত্ত্বেও ইমাম মাঝে দাঁড়াতে সমস্যা হয় না। কিন্তু মেহরাব যদি ছোট আকারে হয় এবং মেহরাবের ভিতরে ডান দিকে মিস্বর বানাতে চায় তাহলে মেহরাবকে মসজিদের

একদম মাঝে না বানিয়ে একটু ডান দিকে নির্মাণ করা উচিত। তাহলে ইমামের কাতারের একদম মাঝে দাঁড়াতে সমস্যা হয় না। (আবু দাউদ হাদীস নং ৬৮১)

৯. অনেকে মনে করে মিম্বর তথা খুতবার সময় ইমামের বসার ও দাঁড়ানোর স্থান কাতারের ঠিক মাঝ বরাবর হওয়া জরুরী। এটা ভুল ধারণা। এর পক্ষে কোন দলীল নেই। (রদুল মুহতার: ১/৬৪৬)

১০. মসজিদের মিম্বর তিন ধাপ বিশিষ্ট হবে এবং প্রত্যেকটি ধাপ এতটুকু উঁচু করবে যাতে খতীব সাহেব সেখানে আরামের সাথে বসতে পারেন। তিনের অধিক ধাপ বিশিষ্ট মিম্বর বানানোর কোন প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেই। হ্যাঁ তৃতীয় ধাপের উপর হেলান দেয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (ফাতহুল বারী-২/৪৯০, বাযলুল মাজহুদ-২/১৭৮, ইমদাদুল আহকাম-৩.১৯৫, মাহমুদিয়া-১০/১৯১)

১১. মসজিদের তাকের মধ্যে কুরআন শরীফ হিফাজতের কোন ব্যবস্থা করা হয় না। অথচ তা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং কমিটি বা মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব হল, সকল কুরআন মাজীদ গিলাফে রাখার ব্যবস্থা করা এবং কিছু দিন পর পর গিলাফ পাক সাফ করার ব্যবস্থা করা এবং ছিঁড়া ফাটা কুরআন শরীফের কপি যা ঠিক করে পড়ার যোগ্য করা যাবে না সেগুলি পাক কাপড়ে মুড়ে গোরস্থানের কিনারায় দাফন করে দেয়া এবং হিফাজতের জন্য ব্যবস্থা করা। (আলমগীরী-৫/৩২৩)

উল্লেখ্য: তাকের মধ্যে কুরআন মাজীদ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবে। কোন কুরআন উপুড় করে রাখবে না। দুই কুরআনের মাঝে রেহাল রাখবে না। কুরআনের উপর তাফসিরের কিতাব রাখবে না। বা খুতবা ও অন্যান্য কিতাব রাখবে না। মিম্বরের উপর রেহাল ছাড়া সরাসরি কিতাব ও কুরআন রাখবে না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় বা বন্ধ করার সময় কুরআনের উপর চশমা, কলম, চিরুনি ইত্যাদি রাখবে না। এসবই কুরআনের সাথে বে-আদবী। (সূরায়ে হজ্জ-৩২, হিন্দিয়া-৫/৩২৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/৬২২)

১২. মেহরাব বা মিম্বরে অনেকে হারিকেন রেখে থাকে বা কেরোসিন তেলের অন্য কোন বাতি রাখে। এটা উচিত নয়। কারণ কেরোসিন একটি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু। যা মসজিদে দাখিল করা ঠিক নয়। সুতরাং সেখানে মোমবাতির ব্যবস্থা রাখবে। একান্ত অপরাগতায় মসজিদের বাইরে দুপাশে হারিকেন রাখতে পারে। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং-১৮০৬, ইমদাদুল আহকাম-৩/১৮১)

১৩. মসজিদের মিনারা থাকা উপকারী জিনিষ। এর দ্বারা আযানের আওয়াজ অনেক দূরে পৌঁছানো যায়। তাছাড়া মুসাফিরদের জন্য মসজিদের সন্ধান পাওয়াও আসান হয়। তবে এর জন্য ভিন্ন ফান্ড কালেকশন করা উচিত।

মসজিদের নিজস্ব ফান্ড দিয়ে মিনারা তৈরী না করা শ্রেয়। মসজিদের মধ্যে কোন প্রকার কারুকার্যও করবে না। মসজিদের মধ্যে কারুকার্য ও জাঁকজমক করা কিয়ামতের আলামত এবং ইয়াহুদীদের সাদৃশ্যতা। (আবু দাউদ হাদীস নং ৪৪৮, ফাতহুল কদীর-১/৩৬৮, হিন্দিয়া-২/৪৬২)

১৪. আজকাল বিভিন্ন মসজিদে নামাযে মাইক ব্যবহার করা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়ে গেছে। দেখা যায়, মসজিদে মাত্র এক বা দেড় কাতার মুসল্লী, যেখানে আসানীর সাথে ইমামের আওয়াজ পৌঁছে যায় এবং মুকাব্বিরের আওয়াজে সুন্দরভাবে রুকু সেজদা করা যায়। তবুও প্রত্যেক ওয়াক্তে মাইক চালানো হচ্ছে। অথচ এর কোন প্রয়োজন নেই। অপরদিকে মাইকে নামায পড়া হলে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিকট আওয়াজ নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। এমনকি কখনো মাইকের মাধ্যমে গানের আওয়াজও নামাযে শোনা যায়। নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। যা মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকায় সাদাসিধেভাবে পড়াই উত্তম মাইকের এ ফ্যাশনের কারণে প্রায় এসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য শরী‘আতের দৃষ্টিতে এ ধরনের ছোট জামা‘আতে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, যদি অনেক বড় মসজিদ হয় বা কয়েক তলায় জামা‘আত হয় সেখানে সতর্কতার সাথে মাইক ব্যবহারের অবকাশ আছে। অনেক সময় খতীব সাহেব জুম‘আর খুতবা দিতে থাকেন, মুয়াজ্জিন বা খাদেম সাহেব খুতবা চলাকালীন মাইক ঠিক করতে থাকেন। এটা নিষেধ। (রদ্দুল মুহতার: ১/৫৮৯, ২/১৫৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/৮৪৫, রহীমিয়া-১/৯০-৯৪)

১৫. মসজিদের মাইক দ্বারা আযান-ইকামত, বয়ান, তাফসীর ইত্যাদির কাজ নিবে। মসজিদের মাইকে মৃত ব্যক্তির খবর প্রচার এবং আরো বিভিন্ন দুনিয়াবী কাজে এ‘লান করা হয়, এগুলো ঠিক নয়। সকলকে বুঝিয়ে এগুলো বন্ধ করা উচিত। অথবা মসজিদের টাকা দিয়ে মাইক খরীদ না করে ব্যাপক উদ্দেশ্যের কথা বলে ফান্ড সংগ্রহ করে তা দিয়ে মাইক খরীদ করবে। তখন দুনিয়াবী বিশেষ প্রয়োজনেও ঐ মাইক ব্যবহার করতে পারবে। (হিন্দিয়া-২/৪৫৯, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪৪৬, রহীমিয়া-৬/১০৬)

১৬. মসজিদের মাইক দ্বারা অনেক স্থানে শেষ রাতে যিকির করা হয় বা গযল পড়া হয় বা তিলাওয়াত করা হয়। এসবই নাজাযিয়। কারণে এতে লোকদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে এবং ইবাদাতকারীদের সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অনেক স্থানে ইশার পর গভীর রাত পর্যন্ত মাইকে গযল, কিরাত পড়া হয়। এটাও নিষেধ। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬০১৮, যিকর ও ফিকর-২৫, মাহমুদিয়া-১৮/১৩৩)

১৭. আজকাল মসজিদের মধ্যে আযান দেয়ার প্রথা চালু হয়ে গেছে এটা শরী‘আতে পছন্দনীয় নয়। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যে মসজিদের মধ্যে

আযান দিবে না। সুতরাং মুয়াজ্জিন সাহেবের রুমে বা মসজিদের বাইরে অন্য কোন রুমে আযানের ব্যবস্থা করবে। (হিন্দিয়া খ-১পৃ-৫৫)

১৮. বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে আযান ইকামত সুন্নাতের বরখেলাপ দেয়া হচ্ছে। সুতরাং মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেয়ার সময় কোন হক্কানী আলেম দ্বারা পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ দিবে। আর যদি পূর্বে নিয়োগ প্রাপ্ত মুয়াজ্জিন হয় তাহলে যে সব প্রতিষ্ঠানে সুন্নাত তরীকায় আযান ইকামতের মশক করানো হয় সেখানে পাঠিয়ে সুন্নাত তরীকায় আযান ইকামতের মশক করিয়ে নিবে। এটা কমিটির একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৭৭)

১৯. মসজিদের কোন মাল-সামানা বাইরের দীনী কাজেও ব্যবহার করবে না। এমনকি ঈদগাহের কাজের জন্যও মসজিদের বিছানা ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। ঈদগাহের জন্য আলাদা সামানার ব্যবস্থা করবে। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৯, রহীমিয়া-৩/১৬৩, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪০৭)

২০. মসজিদ ফান্ড থেকে রমযান মাসে হাফেয সাহেবদের তারাবীহর বিনিময় দিবে না। সূরা তারাবীহ হোক বা খতম তারাবীহ হোক। কারণ তারাবীহ বিনিময় লেন-দেন উভয়টাই নাজায়িয়। আর নাজায়িয় কাজে মসজিদ ফান্ডের টাকা খরচ করার তো প্রশ্নই আসে না। (আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৫১৪, ইমদাদুল মুফতীন-৩১৫, মাহমুদিয়া-৮/২৪৭, ১৮/১৮০)

২১. অনেক মসজিদের মুতাওয়াল্লী মসজিদের টাকা নিজের ব্যবসায় লাগিয়ে থাকে। এটা জায়িয় নেই। বরং এটা মারাত্মক খেয়ানত। এ কাজ করলে সে মুতাওয়াল্লীর যোগ্য থাকবে না। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৮০, আহকামে মাসজিদ-২৪৯)

২২. হাদীসে এসেছে মসজিদকে সুগন্ধময় ও খুশবুদার করতে হবে। বিশেষ করে জুম'আর দিন অবশ্যই আগরবাতী, লোবান ইত্যাদির মাধ্যমে মসজিদ খুশবুদার করা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে বলতে গেলে এ সুন্নাতটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এ সুন্নাতটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া জরুরী। এবং জুম'আর দিন মসজিদকে বিশেষভাবে খুশবুদার করা কর্তব্য। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ৫৯৪, মিরকাত-২/৩৯৩)

২৩. মসজিদে বিছানা বিছানো এবং বাতি দেয়া সুন্নাত। কিন্তু প্রয়োজনমারফিক বাতি লাগাবে। প্রয়োজন অতিরিক্ত বাতি লাগানো ও জ্বালানো অপচয় ও নাজায়িয়। অধুনা অনেক মসজিদে শবে বরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদিতে আলোকসজ্জা করা হয়, অর্থাৎ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বাতি লাগানো হয়। এটা অপচয় ও অগ্নিপূজকদের সাথে সাদৃশ্যতার কারণে না জায়িয়। (সূরা বনী ইসরাইল-২৬-২৭, মুসনাদে আহমাদ-৩/১৩৬)

২৪. বর্তমানে মসজিদের মধ্যে যেভাবে ইফতারের আয়োজন করা হয় তাতে (অনেক লোকের আয়োজনে হই- ছল্লা এবং মসজিদে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পড়ে থাকার দরুন) মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। এটা বর্জনীয় তবে শুধু খেজুর এবং পানি দ্বারা ইফতার করাতে অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার-২/৪৪৯, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪৫)

২৫. কোন মসজিদ জীর্ণশীর্ণ বা সংকীর্ণ হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলে নতুনভাবে তৈরী করা জাযিয়। পুরানা সামান্যত্র বিক্রি করে মসজিদের কাজে লাগিয়ে দিবে। খরিদকারী উক্ত সামান্য বৈধ ও পবিত্র স্থানে ব্যবহার করবে। মসজিদকে সুন্দর করার জন্য বা সাজানোর জন্য মজবুত মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা নাজাযিয়। আজকাল অনেকেই মসজিদ নিয়ে গর্ব ও বড়াই করার লক্ষ্যে পুরানা মসজিদকে মজবুত থাকা সত্ত্বেও শহীদ করে এ ধরনের নাজাযিয় কাজ করে থাকে। (আবু দাউদ হাদীস নং ৪৪৮-৪৪৯, মুসনাদে আহমাদ-৩/১৩৬)

২৬. মসজিদের দোকান-পাট এর পজিশন বিক্রি করা জাযিয় নেই। মসজিদ ছাড়াও পজিশন বেচা কেনা শরী‘আতে পছন্দনীয় নয়। তাছাড়া মসজিদের দোকান-পাট দীর্ঘ মেয়াদী ভাড়াও দিবে না। এতেও এক ধরনের মালিকানাভাব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। যা মসজিদের সম্পত্তিতে নিষেধ। হ্যাঁ এক বছরের জন্য ভাড়া দিবে। এবং প্রতি বছর ভাড়া চুক্তি নবায়ন করে নিবে। আর মসজিদের দোকান-পাট ভাড়া দেওয়ার সময় বিশেষ করে খেয়াল রাখবে কোন অবৈধ কাজের দোকান যেমন: টিভি, ভিডিও ইত্যাদি গান-বাজনার সামগ্রীর জন্যে যেন না হয়। কারণ এসবই নাজাযিয়। আর এ ধরনের কাজে দোকান ভাড়া দেয়া গুনাহের কাজে সহায়তারই শামিল। (সূরয়ে মায়িদা: ২, রদ্দুল মুহহার- ৪/৪০০, বুহস ফি কাযায়া ফিকহিয়া-১/১০৮)

২৭. একবার মসজিদ নির্মাণ করার পর সে স্থানে বা তার কোন অংশে দোকান-পাট, মার্কেট ও উযু খানা করা নাজাযিয়। কারণ সেটা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ থাকে। এটাকে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার বা পরিবর্তন করা নাজাযিয় ও হারাম। তাছাড়া মসজিদের কোন অংশ নিজ অবস্থায় রেখেও কখনো ভাড়ায় দেওয়া যেমন: মূল মসজিদ ভবনের দেয়ালে বা ছাদে বিলবোর্ড, টাওয়ার ইত্যাদি বসাতে দেয়া জাযিয় হবে না। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৭-৩৫৮)

বর্তমানে অনেক স্থানে দেখা যায় যে, নীচ তলায় বহু দিন যাবত নামায ও জামা‘আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোন প্রকার ঘোষণাও ছিল না যে, “এখানে অস্থায়ীভাবে নামায পড়া হচ্ছে, পরবর্তীতে দোতলা থেকে স্থায়ী মসজিদ আরম্ভ হবে।” এমতাবস্থায় উক্ত প্রথম তলা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে মার্কেট, দোকান-পাট বানানো হচ্ছে। যদিও উক্ত আয় মসজিদের জন্য

ব্যয় করা হবে, তথাপি মসজিদকে পরিবর্তন করে ফেলার দরুন এটা কবীরা গুনাহ। এটা কোন ভাবেই জায়িয় হবে না। কোন মসজিদ কর্তৃপক্ষ এরূপ করে থাকলে তারা যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায় তাহলে তাদের জন্য একটাই রাস্তা খোলা আছে, সেটা হল ঐ মার্কেট, দোকান-পাট ভেঙে মসজিদকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিবে এবং আল্লাহর দরবারে ভালভাবে তাওবা ইস্তিগফার করে নিবে। তবে যেখানে পূর্বেই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, “প্রথম তলায় অস্থায়ী ভাবে নামায ও জামা‘আত করা হবে।” সেখানে পরবর্তীতে নীচ তলায় দোকান-পাট ইত্যাদি করতে অসুবিধা নেই। তবে বৈধ মালের দোকান-পাট হতে হবে এবং মসজিদের পবিত্রতার দিকে খুব খেয়াল করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৮, আযীযুল ফাতাওয়া-২২৮)

উল্লেখ্য: মূল মসজিদের নীচে বা উপরে কখনো কোন প্রকার টয়লেট, উযুখানা বা ফ্যামিলি কোয়ার্টার তৈরী করা যাবে না। (রদ্দুল মুহতার-১/৬৫৬, ৪/৩৫৮)

২৮. মুসাফির এবং ই‘তিকাফরত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ রাতের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী সময় মসজিদে অবস্থান করতে পারবে না। এবং মসজিদের কোন সামান যেমন লাইট, ফ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না। অবশ্য ই‘তিকাফের মধ্যে নফল ই‘তিকাফও শামিল, কাজেই দীনী দাওয়াত ও তা‘লীমের জন্যে সাময়িক খাকতে হলে নফল ই‘তিকাফের নিয়তে থাকারও প্রয়োজনে মসজিদের আসবাব ব্যবহারের অবকাশ আছে। (আলমগীরী-২/৪৫৯)

২৯. বর্তমানে কোন কোন সাধারণ মসজিদে মহিলাদের নামায পড়ার যে আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছে শরী‘আতের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়। আবু হুমাইদ আস্ সা‘ইদী রাযি.-এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ একবার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জামা‘আতে নামায পড়তে আমার ভাল লাগে। একথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তা আমি জানি। তবে শুন, তোমার জন্য তোমার ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আবার বারান্দার কামরায় নামায পড়া তোমার জন্য তোমার ঘরের আঙিনায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর তোমার ঘরের আঙিনায় নামায তোমার জন্য তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। একইভাবে তোমার মহল্লার মসজিদে নামায তোমার জন্য আমার মসজিদে আমার সাথে নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন: একথা শোনার পর তিনি পরিবারের লোকদেরকে ঘরের ভিতরে নামাযের স্থান বানাতে বলেন। তার নির্দেশে অনুযায়ী তা বানানো হয়। এরপর তিনি আমৃত্যু সেখানেই নামায পড়তে থাকেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং-২২১৭)



হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু  
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর মহিলাদের মধ্যে যে ধরনের  
পরিবর্তন এসেছে সেটা যদি তিনি দেখতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদেরকে  
মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। যেভাবে নিষেধ করা হয়েছিল বনী  
ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৮৬৯)

এ ধরনের আরো বহু হাদীস যেগুলো মহিলাদের মসজিদে গমনকে নিষেধ করে  
সে সমস্ত হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের ঐক্য মতের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে  
কেরাম মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়াকে নাজাযিয সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য  
বর্তমানে যে সকল মহিলা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ছে। তারা নাজাযিয কাজ  
করছে। তাদের একাজ পরিহার করা কর্তব্য।

অবশ্য টার্মিনাল, জংশন, স্টেশন তথা ভ্রমণ পথের এ জাতীয় স্থানে মসজিদের  
পার্শ্বে মুসাফির মহিলাদের উযু ও নামাযের পর্দার ব্যবস্থা সম্বলিত জায়গা রাখা  
বাঞ্ছনীয়। যেখানে তারা ইস্তিঞ্জা উযু সেরে একাকী নামায পড়ে নিতে পারে।

বি: দ্র: এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইংলাউস সুনান-৪/২৬০ ইবনে খুযাইমা হা:  
নং ১৬৮৩, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৯৭, তাবারানী কাবীর, ২৫/১৪৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ:  
২/১১৮

৩০. মসজিদে জুতা নেয়ার মাসআলা হল: মসজিদের গেটে জুতার ধুলা-বালি  
ঝেড়ে কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলবে। তারপর কাতারে দুই পায়ে  
মাঝে রেখে দিবে। এটাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (আবু দাউদ হাদীস নং ৬৫৪)

আজকাল সিজদার জায়গার সামনে জুতা রাখা হয়। সিজদায় গেলে অনেক  
ক্ষেে জুতা মাথায় লাগে। তাছাড়া জুতার বাস্ত্রে কোন ঢাকনা না থাকায় জুতা যে  
মুসল্লীদেরকে এস্টেকবাল করে। এ তরীকা পছন্দনীয় নয়। সুতরাং জুতা বাস্ত্রে  
রাখতে হলে বাস্ত্রের ঢাকনা থাকা উচিত। (আবু দাউদ হাদীস নং ৪৫৫-৪৫৬)

৩১. মসজিদে একমাত্র ইমামের স্থান নির্ধারিত। মুয়াজ্জিন বা অন্য কারো স্থান  
নির্ধারিত নয়। মুয়াজ্জিন যে কোন কাতারে দাঁড়িয়ে ইক্বামত দিতে পারে। কাজেই  
মুয়াজ্জিন বা মসজিদের অন্য কোন কর্মকর্তা বা মুসল্লীর জন্য সর্বক্ষণ জায়নামায  
বিছিয়ে মসজিদে সিট দখল করে রাখা শরী‘আত বিরোধী কাজ। সুতরাং যে  
প্রথমে আসবে সেই প্রথম কাতারে ইমামের পিছনে বসতে পারবে। এক্ষেত্রে  
আমির-ফকিরের কোন পার্থক্য নেই। তবে সম্ভব হলে ইমামের সরাসরি পিছনে  
প্রথম কাতারে আলেম-উলামাদের দাঁড়ানো উচিত বা তাঁদের জন্য সুযোগ করে  
দেয়া ভাল। যাতে ইমামের ভুল ভ্রান্তি হলে তারা কাছ থেকে সংশোধন করে  
সকলের নামাযের হেফাজত করতে পারেন কিংবা ইমামের কোন সমস্যা হয়ে  
গেলে তিনি নিজে সরে গিয়ে তাদের একজনকে নিজের স্থানে দাঁড় করিয়ে



ইমামতির কাজ দিতে পারেন। (মুসলিম হা: নং ১২২, তিরমিযী হা: ২২৮, রদুল মুহতার-১/৬৬২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১০/৫৩)

৩২. কোন জায়গায় দেখা যায় যে, বিনা উয়রে দোতলা মসজিদের প্রথম তলা বাদ রেখে দ্বিতীয় তলায় জামা‘আত করে থাকে। এটা উচিত নয়। বরং ইমাম সাহেব নীচ তলায় দাঁড়াবেন। এবং মুসল্লীগনও নীচ তলায় দাঁড়াবেন। অর্থাৎ, জামা‘আত নীচ তলায় অনুষ্ঠিত হবে। তবে নীচ তলায় যাদের জায়গা হবে না তারা দ্বিতীয় তলায় জামা‘আতে শরীক হবেন। (রহীমিয়া-৯/২১৮)

৩৩. নামাযের কাতার তিন হাত বা কমপক্ষে পৌনে তিন হাত চওড়া করবে। যাতে সুন্নাত তরীকা মুতাবেক সিজদা করা সম্ভব হয়। অনেক মসজিদে দুই বা আড়াই হাত চওড়া কাতার করা হয় যার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে সিজদা করা সম্ভব হয় না। মাথা সামনের মুসল্লীর পায়ে আটকে যায়। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৪৯৬, আবু দাউদ হাদীস নং ৮৯৮)

৩৪. কাতারের দাগের উপর পায়ের গোড়ালী রেখে কাতার সোজা করবে। এটাই সহীহ তরীকা। অনেক স্থানে দাগে আঙ্গুল রেখে কাতার সোজা করা হয়, এতে কাতার কখনও সোজা হয় না। বরং যার পা লম্বা সে পিছনে থাকে আর যার পা খাটো সে সামনে চলে যায়। (আবু দাউদ হাদীস নং ৬৬৭, রদুল মুহতার: ১/৫৬৭)

৩৫. কাতার মাঝখানে থেকে শুরু হয়ে সমানভাবে ডানে বাঁয়ে বাড়াতে থাকবে। এটাই নিয়ম। অনেকে বাতাসের লোভে এ নিয়ম ভঙ্গ করে সামনের কাতার খালী থাকা সত্ত্বেও পিছনে পাখার নীচে দাঁড়ায়। কাতার হিসেবে তার কোথায় দাঁড়ানো উচিত তার কোন পরওয়া করে না। এটা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। কোন কোন মাযহাবে এ সমস্ত ভুলের কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। আবার কোনো কোন লোক এমনও দেখা যায় যে, মসজিদে অনেক আগে এসে সামনে খালী পাওয়া সত্ত্বেও পিছনে বসে থাকে। তাদের এ কাজের হিকমত বোধগম্য নয়। আবার কেউ সবার শেষে এসে সামনে খালী না থাকা সত্ত্বেও মানুষেরে কাঁধ টপকিয়ে সামনে যায়। তারপর জায়গা না পেয়ে দুজনের ঘাড়ে সাওয়ার হয়। এটা খুবই গর্হিত কাজ। হাদীসে এসেছে যে এরূপ করল সে যেন জাহান্নামে যাওয়ার জন্য একটি পুল তৈরী করল। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং ৪৩০, আবু দাউদ হাদীস নং ৬৭১, তিরমিযী হাদীস নং ৫১২)

৩৬. হাদীস না জানার কারণে অনেকে জুম‘আর খুতবার পূর্বের বয়ানকে বিদ‘আত বলে থাকেন। তাদের এই মাসআলা ঠিক নয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরে ফারুক রাযি. এর জামানায় তার খুতবার পূর্বে হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামের রাযি. উপস্থিতিতে হযরত তামীমে দারী রাযি. বয়ান রাখতেন। কখনো

অন্য সাহাবীও বয়ান করতেন। কেউ এতে আপত্তি করেননি। (মুসতাদরাকে হাকেম: হাদীস নং ৩৬৭)

সুতরাং এটা বিদ'আত বা নাজায়িয হতে পারে না। তবে এ বয়ানটি মসজিদের মিস্বরে না হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে করবে। যাতে জুম'আর খুতবা দুইটির স্থলে তিনটির মত না দেখায়। সুতরাং এই বিষয়টির প্রতিও সকলের খেয়াল করা দরকার। কোথাও বিদ'আতের ভয়ে বয়ানই করে না। আবার কোথাও মিস্বরে বসে এই বয়ান করা হয়। উভয়টি ভুল তরীকা। (মু: ইবনে আবী শাইবা, হা: নং ৫৪৩৩, মু: হাকেম-৩৬৭)

৩৭. জুম'আর প্রথম আযানের সাথে সাথে মসজিদে রওয়ানা হওয়া বা রওয়ানার প্রস্তুতি নেয়া জরুরী। প্রথম আযানের পর বেচা-কেনা ও দুনিয়াবী অন্যান্য কাজ এমনকি ঘরে বসে নফল নামায বা কুরআন তিলাওয়াত সবই নিষেধ হয়ে যায়। (সূরায়ে জুম'আ-৯)

সুতরাং জুম'আর প্রথম আযান অনেক আগে দিবে না। যাতে লোকদেরকে গুনাহগার বানানো না হয়। কারণ এত আগে তারা মসজিদে হাজির হয় না। এজন্য সুন্দর নিয়ম হল, সোয়া বারটা বা সাড়ে বারটায় খতীব সাহেব বাংলা বয়ান শুরু করে দিবেন। আধ ঘণ্টা বা পৌনে এক ঘণ্টা বয়ানের পর জুম'আর প্রথম আযান হবে। তারপর সকলে সুন্নাহ পড়ে নিবে এবং দান বাস্তব চালাতে হলে চালাবে। তারপর খুতবার আযান হবে এবং খুতবা শুরু হয়ে যাবে। (প্রাঞ্জল)

৩৮. আমাদের দেশে অনেক মসজিদে খুতবা চলাকালীন দান বাস্তব চালানো হয়। এটা মারাত্মক ভুল। এতে গুনাহ তো হয়ই, উপরন্তু জুম'আর ফযীলতও বাতিল হয়ে যায়। (সূরায়ে আ'রাফ-২০৪, মুসলিম শরীফ হা: নং ৮৫১)

কাজেই কাবলাল জুম'আ সুন্নাহের পরে বা ফরয নামাযের সালামের পরে মসজিদের জন্য কালেকশন করবে। এর উত্তম তরীকা হল প্রত্যেক কাতারে একজন রুমাল নিয়ে চলতে থাকবে। সকলে রুমালের মধ্যে হাত ঢুকাবে। চাই এই মুহূর্তে দান করুক বা না করুক। এতে কারো প্রতি বদগুমানী হবে না এবং আন্তে আন্তে সকলের মধ্যে দানের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

৩৯. বিনা অপরাগতায় মসজিদে জানাযা নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমী ও নাজায়িয। যদিও লাশ মসজিদের বাইরে রাখা হয়। এর দ্বারা জানাযা নামাযের যে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াবের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাও বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং যে সব এলাকায় কোন মাঠ বা খালী স্থান আছে সেখানে অবশ্যই মাঠে জানাযা পড়বে। অলসতা করে মসজিদের মধ্যে জানাযা পড়বে না। হ্যাঁ! যেখানে এ ধরনের মাঠ নেই বা প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে সে ক্ষেত্রে ঠেকাবশত:

মসজিদের মধ্যে জানাযা পড়ার অবকাশ আছে। (আবু দাউদ হা: নং ৩১৯১, রদুল মুহতার-২/২২৪)

উল্লেখ্য, মসজিদের মাঠে জানাযা পড়ার ক্ষেত্রে সুন্নাত নামায থাকলে তা পড়ে তারপর জানাযার জন্য বের হওয়া উত্তম। কারণ লোকদের অন্তরে সুন্নাতের গুরুত্ব কমে গেছে। তাই কোন বাহানায় বের হয়ে গেলে আর সুন্নাত পড়া হয় না। (আবু দাউদ হাদীস নং ৩১৮৯, ফাতহুল বারী-২/৯০)

৪০. বর্তমানে মসজিদের মধ্যে ঈদের নামায পড়ার একটা কুপ্রথা চালু হয়ে গেছে। এটা বন্ধ করা উচিত। কারণ ঈদের নামায মাঠে ময়দানে ও ঈদগাহে পড়া নবীজীর সুন্নাত। মসজিদে পড়া সুন্নাত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবল বৃষ্টির উয়রে জীবনে একবার মাত্র মসজিদে ঈদের নামায পড়িয়ে ছিলেন। এছাড়া সব সময় তিনি ঈদের নামায ময়দানে পড়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আশেকদের জন্য এসব সুন্নাতের প্রতি দৃষ্টি দেয়া খুবই প্রয়োজন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৯৫৬, আবু দাউদ হাদীস নং ১১৬০)

৪১. ইমাম সাহেবের দায়িত্ব শুধু নামায পড়ানো নয়। বরং তিনি পুরো মহল্লার দায়িত্বশীল। কাজেই সকল বেনামাযীকে নামাযী এবং বেজামা‘আতীদেরকে জামা‘আতের পাবন্দ বানানোর জন্য তিনি পরিকল্পনা মাফিক মেহনত চালিয়ে যাবেন। কমিটির সদস্যগণ তাঁকে সম্মানজনক বেতন দিবেন। যাতে ইমাম-মুয়াজ্জিনের টিউশনি করতে না হয়। তারা মানুষের ঘরে গিয়ে একটা বাচ্চাকে কেন পড়াবেন। তারা তো মহল্লার সকল বয়সের লোকদের দীনের জরুরী বিষয় শিক্ষা দান করবেন। ইমাম বুখারী রহ. জন্মভূমি বুখারা থেকে বহিষ্কার হওয়াকে বরণ করে নিয়েছিলেন কিন্তু আমীরের বাড়ীতে গিয়ে টিউশনি করতে রাজী হননি। (সিয়ার: ১০/৩১৭)

ইমাম সাহেব মসজিদের মধ্যে প্রতিদিন রুটিন মাফিক অন্তত তিন প্রকার তা‘লীম দিবেন।

ক. ঈমান ও আকীদার তা‘লীম এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের তা‘লীম। এ বিষয়টি শরী‘আতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর চেয়ে জরুরী কোন বিষয় শরী‘আতে নেই। (বুখারী হা: নং ৯, মুসলিম হা: নং ১, আবু দাউদ হা: নং ৪৬৯৫)

খ. কুরআনে কারীম ও দু‘আ-কালাম, আভাহিয়াতু, দরুদ শরীফ ইত্যাদি সহীহ করার তা‘লীম। এটা নূরানী পদ্ধতি অনুযায়ী চক-স্নেটের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে শিখানো সম্ভব। (দারা কুতনী হা: নং ৪৫, দারেমী হা: নং ২২১)

গ. দীনের জরুরী মাসাইল এবং উযু, নামায, আযান, ইকামতের বাস্তব প্রশিক্ষণ যা একান্ত জরুরী। কারণ প্রশিক্ষণ ব্যতীত শুধু বয়ান শুনার দ্বারা নামায সহীহ করা সম্ভব নয়। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬৭৭, নাসায়ী হা: নং ২২৭৭, আবু দাউদ হা: নং ৫৩০)

এছাড়াও সপ্তাহে এক দিন আধা ঘণ্টার জন্য মুসল্লীদেরকে ধারাবাহিকভাবে কুরআনের তাফসীর করে শুনাবেন। জুম‘আর বয়ানটি পরিকল্পিত ভাবে করবেন। যাতে সকল মুসল্লীর মধ্যে ফরযে আইন পরিমাণ ইলম এসে যায়। যথা: ঈমান-আক্বীদা ঠিক করা, ইবাদাত বন্দেগী সুন্নাত ও মাসআলা অনুযায়ী করা, রিযিক হালাল রাখা, বান্দার হক আদায় করা, এবং আত্মশুদ্ধি করা। “ইসলামী যিন্দেগী” অথবা “আহকামে যিন্দেগী” কিতাব থেকে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দেখে নিবেন। এবং মুসল্লীদের সামনে অল্প অল্প করে পেশ করবেন। তাছাড়া ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে নিজের মহল্লায় এবং পার্শ্ববর্তী মহল্লায় গাশতের নেযাম চালু করবেন এবং মহল্লার দুঃস্থ মানবতার খেদমতের জন্য ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এই হল ইমাম সাহেবদের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এসব দায়িত্ব পালন করলে মসজিদগুলো হেদায়েতের মারকাযে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ। (সূরায়ে আলে ইমরান-১৬৪, আবু দাউদ- হাদীস নং ৩৬৪১)

৪২. বর্তমানে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু পরিচালনা করা হচ্ছে। অথচ কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে গণতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। যার কিছু লেখকের “কিতাবুল ঈমান” এর ৫ম অধ্যায় থেকে জানা যাবে।

পরিচালনার এ পদ্ধতি সর্ব নিকুষ্ট পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মানুষের মাথা গণনা করা হয়। কিন্তু মগজ মাপা হয় না। এ পদ্ধতিতে একজন বিচারপতির রায়ের যে মূল্য একজন বেকুফের রায়ের একই মূল্য। এ পদ্ধতিতে কখনো কোন জিনিষ ভালভাবে চলতে পারে না। এজন্য মসজিদ পরিচালনার ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

মহল্লার মধ্যে যারা মুরব্বী শ্রেণীর, পাক্কা নামাযী, পরহেযগার ও জ্ঞানী লোক থাকবেন ইমাম সাহেবসহ তাদেরকে মজলিসে শুরা ঘোষণা করবেন। অতঃপর তাদের পরামর্শ ও মনোনয়নে মাঝ বয়সী পরহেযগার নামাযী ও জ্ঞানী লোকদেরকে কমিটির সদস্য বা মুতাওয়াল্লীর সাহায্যকারী বানানো হবে। এরা মূলতঃ মসজিদের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাবেন আর মজলিসে শুরা শুধু তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করতে থাকবেন। কমিটির কোন ভুল ভ্রান্তি হলে তারা শুধরিয়ে দিবেন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি হলে তারা মীমাংসা করে দিবেন। এবং তাদেরকে সুপরামর্শ দিতে থাকবেন। কোন সদস্য মসজিদের জন্য সময় না দিলে বা কাজে অনীহা প্রকাশ করলে তাকে সংশোধন

করবেন। যদি সে অপারগতা পেশ করে তাহলে তার স্থলে নতুন সদস্য মনোনীত করবেন।

সারকথা ইসলামে জ্ঞানীদের মনোনয়ন ও পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। জনসাধারণের নির্বাচনকে সমর্থন করে না। বা তাদের ভোটভোটির সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে না। (সূরায়ে নিসাঃ ৫৯, আন'আম-১১৬, বিদায়া নিহায়া-৭/১৪০)

৪৩. বিনিময় নিয়ে মসজিদের মধ্যে বাচ্চাদের বা অন্যদের তা'লীম দেয়া মাকরুহ ও নাজায়িয। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা হচ্ছে। এজন্য ইমাম-মুয়াজ্জিন বা খাদিমগণ মসজিদের তা'লীম আল্লাহর ওয়াস্তে দিবে। অপরদিকে মসজিদ কমিটি তাদের জন্য সম্মানজনক বেতনের ব্যবস্থা করবে। যাতে তারা এ নাজায়িয বেতনের মুখাপেক্ষী না থাকেন। এতে আলেমদের মর্যাদাহানি হয়। এ থেকে পরহেয করা কর্তব্য। (মুসলিম শরীফ-হাদীস নং ২৮৫, দূরের মুখতার ও রদুল মুহতার-৫/৩৬৪, হিন্দিয়া-৫/৩২১)

৪৪. মসজিদের ভিতরে বা মসজিদের উপরের তলায় আবাসিক মাদরাসা কায়েম করা জায়িয নেই। এতে মসজিদের সম্মান ও ইহতেরাম রক্ষা পায় না। বর্তমানে কিছু কিছু স্থানে দেখা যাচ্ছে যে, মসজিদ কমিটি দীনের খেদমত মনে করে মসজিদের মধ্যে এ ধরনের মাদরাসা কায়েম করেছেন। যা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষেধ। হ্যাঁ! অনাবাসিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মসজিদের যে কোন তলায় দীনের তা'লীম তারবিয়ত জায়িয আছে। তবে যিনি পড়াবেন তিনি বিনা বেতনে পড়াবেন এবং এ তা'লীমের দ্বারা মুসল্লীদের ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে কোন অসুবিধা না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরী। (রদুল মুহতার-১/৬৬০-৬৬৩, হিন্দিয়া-৫/৩২১)

### মসজিদের আরো কতিপয় আদব

পূর্বের আলোচনায় মসজিদের অনেকগুলো আদব বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো ছাড়া ফকীহ আবুল লাইসরহ. 'তাহ্বীল গাফেলীন' নামক কিতাবে মসজিদের আরো কতিপয় আদব উল্লেখ করেছেন, যথাঃ

১. মসজিদে অবস্থানরত লোকজন যদি নামায, যিকির কিংবা তিলাওয়াতে মশগুল না থাকে তাহলে মসজিদে প্রবেশের সময় তাদেরকে সালাম করা। আর যদি তারা নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকে তখন উচ্চ স্বরে সালাম করা নিষেধ। আর এতে মুসল্লিদের ইবাদতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সুতরাং অনেকে মসজিদে প্রবেশ করে সশব্দে মুসল্লিদের যে সালাম করে তা ভুল।

২. মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকাত তাহিয়াতুল মাসজিদ এর নামায পড়া ভাল। ভুলে বসে পড়লেও এ নামায পড়া যায়। এটা যুহর, আসর এবং ইশার

ওয়াক্কে। প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও পড়া কর্তব্য। অনেকে দিনে এক ওয়াক্কেও এ নামায পড়ে না। এটা ঠিক নয়।

৩. কোন ধরনের বেচা-কেনা করা। যদিও তা ফোনের মাধ্যমে হোক না কেন। সারকথা, দুনিয়াবী কথা বলার জন্য মসজিদে বসা ও প্রবেশ করা জাযিয় নেই। তেমনি ভাবে নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে দুনিয়াবী লম্বা কথা বলাও না জাযিয়। তবে ঠেকাবশত ২/১টি কথা বলার অবকাশ আছে।

৪. মসজিদে কোন হারানো জিনিষের ঘোষণা দেয়া জাযিয় নেই। এতে মুসল্লীদের ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটে। তবে মসজিদের গেইটে এ ধরনের এ'লান করতে পারে।

৫. নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নাজাযিয়। এটা মারাত্মক গুনাহ। একান্ত যেতে হলে কোন কিছুর দ্বারা সুতরা স্থাপন করে তারপর যাবে। অবশ্য যে ব্যক্তি মুসল্লী বরাবর সামনে বসে আছে সে যে কোন এক পাশ দিয়ে চলে যেতে পারে।

৬. মসজিদে থুথু বা কফ না ফেলা বা মসজিদের সীমানায় উযু না করা এবং আঙ্গুল না ফুটানো।

৭. মসজিদকে নাপাক বস্তু, অবুঝ শিশু, পাগল প্রবেশ করতে না দেয়া এবং কাউকে শারীরিক শাস্তি প্রদান করা থেকে পবিত্র রাখা। (হিন্দিয়া-৫/৩২১)

তবে বুঝমান তথা ৭ বছর বা ততোধিক বয়সের ছেলেদেরকে মসজিদে এনে নিজের পাশে রেখে নামায পড়ানো প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব। যাতে তারা নামায ও জামা'আত সম্পর্কে অভ্যস্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সাথে তাদেরকে বড়দের কাতারে দাঁড় করানোই শ্রেয় এবং এতে কোন অসুবিধা নেই। তা না করে এ ধরনের বাচ্চাদেরকে পিছনে ঠেলে দিলে এক দিকে যেমন অভিভাবকদের পেরেশানী হতে পারে। অপরদিকে কয়েকজন বাচ্চা মিলে নামাযের পরিবর্তে হট্টোগোলে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। (আহসানুল ফাতাওয়া-৩/২৮)

উল্লেখ্যঃ বক্ষ্যমাণ পরচায় যে সব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল, সে সব বিষয়ের অনেকগুলোই মাদরাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। এ জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সে সব বিষয়ের দিকে বিশেষ খেয়াল করা কর্তব্য।

বিঃদ্রঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মুফতি শফী রহ.-এর লিখিত “আদাবুল মাসাজিদ” নামক কিতাব দেখা যেতে পারে।

**সপ্তম অধ্যায়**

[www.darsemansoor.com](http://www.darsemansoor.com)

## কাফন-দাফনে বর্জনীয় কাজ

### **মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় বর্জনীয় কাজ**

১. রুগীর চিকিৎসার ব্যাপারে হালাল-হারামের খেয়াল করা হয় না। অনেক সময় হারাম জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। হিন্দুদের থেকে ঝাড়-ফুক, তাবীজ নেওয়া হয়। অথচ তারা কুফরী কালাম দিয়ে এগুলো করে থাকে, যা গ্রহণ করা নাজাযিয় ও হারাম। (আবু দাউদ: হাঃ নং ৩৮৭০, ৩৮৭৪, আহকামে মাইয়েত: ২২৩)

২. রুগীর উযু, নামায, সতর ইত্যাদির ব্যাপারে খেয়াল করা হয় না। অথচ এ অবস্থায়ও তার উপর এগুলো জরুরী। তাই মৃত্যুরুগীর নিকট আত্মীয়দের এগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

৩. অনেকে রুগী দেখতে গিয়ে সুন্নাত মুতাবেক দু'আ তো পড়েই না। উপরন্তু রুগীর সামনে এমন কথা বলে যার দ্বারা রুগী তার হায়াত থেকে নিরাশ হয়ে যায়। এটা মারাত্মক ভুল। (মুসলিম শরীফ: হাঃ নং ৯১৯ নাসায়ী: হাঃ নং ১৮২৫, আবু দাউদ: হাঃ নং ৩১১৫)

৪. মুম্বর্ষাবস্থায় মৃত্যুরুগী এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সম্পদে কারো জন্য ওসিয়্যত করবে না। কারণ: মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এর অতিরিক্ত সম্পদ থেকে তার মালিকানা দুর্বল হয়ে যায়। (আহকামে মাইয়েত: ২২৬)

৫. কোন ওয়ারিশের জন্য সম্পদের ওসিয়্যত করবে না। কারণ ওসিয়্যতের পর অবশিষ্ট ২/৩ অংশের মধ্যে মৃত্যুরুগীর পূর্ণ মালিকানা থাকে না। তাছাড়া ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়্যত করা নাজাযিয়। (মুসনাদে আহমাদ: হাঃনং ১৭৮, ইবনে মাজাহ: ২৭১৩)

৬. মুম্বর্ষাবস্থায় সন্তানদেরকে সামনে এনে বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমনঃ টাকা কোন ব্যাংকে রেখেছে? অমুক জমির পজিশন কি? ইত্যাদি। এগুলো একেবারেই অনুচিত। কারণ এর দ্বারা মৃত্যুরোগীর অন্তর দুনিয়ামুখী হয়ে যায়। আর জীবনের শেষ মুহূর্তে তার অন্তর দুনিয়ামুখী হওয়া মারাত্মক ভুল। (আহকামে মাইয়েত: ২২৮)

৭. মুম্বর্ষাবস্থায় নিজের কোন অঙ্গ যেমন: চক্ষু, কিডনী ইত্যাদি দানের ওসিয়্যত করা যাবে না। কারণ কারো কোন অঙ্গ তার মালিকানাধীন নয়, বরং সবকিছুতেই মালিকানা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। মানুষকে সাময়িকভাবে হেফাজত করা ও দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র। (রদুল মুহতার: ২/৯৩)

৮. কালিমার তালক্বীন করার ক্ষেত্রে মৃত্যুরুগীকে কালিমা পড়তে আদেশ দেয়া হয়, যা একেবারেই অনুচিত। কারণ মুম্বর্ষরুগী মৃত্যুব্রণায় কাতর হয়ে কালিমা



পড়তে অস্বীকার করে বসতে পারে। পরিণতি এই হয় যে, একটা মুস্তাহাব আমল করাতে গিয়ে একজন ঈমানদার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এজন্য সন্তানদের দায়িত্ব হল তার পাশে বসে কালিমা পড়তে থাকা। সে একবার পড়ে নিলে দ্বিতীয়বার পড়ার জন্য আর তাকে তালক্বীন করবে না। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত কালিমার তালক্বীন করতেই থাকতে হবে এমন মনে করা ভুল। (দুররে মুখতার: ২/১৯১)

৯. অনেকে মূর্ত্তাবশত: রুগীর নিকট সূরা ইয়াসীন পড়তে দেয় না। তারা মনে করে এটা পড়লে রুগীর আর বাঁচার আশা থাকে না। এমনটি মনে করা ভুল। (আবু দাউদ: হা: নং ৩১২১, সহীহ ইবনে হিব্বান: হা: নং ২৯৯১, দুররে মুখতার: ২/১৯১)

### মৃত্যুর পর বর্জনীয় কাজ

১. কারো ইস্তেকালের পর তার লাশ মাটির উপর রাখবে না। বরং খাটিয়ার উপর রাখবে। (দুররে মুখতার: ৩/৮৪)

২. সবরের পরিপন্থী কোন আচরণ কারো থেকে প্রকাশ না পায় সে দিকে খোয়াল রাখবে। যেমন: বড় আওয়াজে ক্রন্দন করা। পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলা। মাথা-বুক চাপড়ানো, জাহিলী যুগের শব্দ মুখে উচ্চারণ করা ইত্যাদি। (রুখারী শরীফ: হা: নং ৬২৯৪, তিরমিযী হা: নং ৯৮৪)

৩. মৃতব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পূর্বে তার পাশে বসে কুরআনের তিলাওয়াত করবে না। বরং সাওয়াব রেসানীর জন্য কুরআন খানী করতে চাইলে তা অন্য স্থানে করবে। তবে তা বিনা পারিশ্রমিকে হওয়া জরুরী। (দুররে মুখতার: ৩/৮৩, ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া: ৮/১৯৭)

৪. ইস্তেকালের পরও পর্দার বিধান বহাল থাকে। তাই জীবদ্দশায় যাদের সাথে দেখা সাক্ষাত নাজায়িয ছিল তারা মৃতব্যক্তিকে দেখতে পারবে না। সুতরাং বেগানা পুরুষের লাশ বেগানা মহিলাদের জন্য দেখা যেমন নিষেধ, তেমনিভাবে বেগানা মহিলার লাশ বেগানা পুরুষের জন্য দেখাও নিষেধ। তবে স্বামী-স্ত্রী মৃত্যুর পর একে অপরের চেহারা দেখতে পারবে। তবে স্বামী স্পর্শ করতে পারবে না। (সূরায়ে নিসা: ২২, রদ্দুল মুহতার: ২/১৯৫, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২১৯, মাহমুদিয়া: ২/৩৯৮)

৫. এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে যাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাত নাজায়িয, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা এক অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। এজাতীয় হারাম কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। অনেকে মৃত ব্যক্তির ছবি উঠিয়ে তা সংরক্ষণ করে থাকে এবং পত্রিকায় দেয়, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বিধায় তা থেকে বিরত থাকবে। (আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২১৯)



৬. মৃত ব্যক্তির পশম, মোচ, নখ কর্তন করবে না। এমনিভাবে তার চুল দাঁড়ি আঁচড়ানো থেকেও বিরত থাকবে। সমাজের অনেক মূর্খ লোক মৃত ব্যক্তির নাভীর নীচের পশম কাটাকে সুন্নাত মনে করে, তাদের এধারণা ঠিক নয়। (দূররে মুখতার: ২/১৯)

৭. মৃত্যুর পরে বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের দেশে দাফনে যে দেরী করা হয় তা শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ শরী‘আতে মূর্দাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং বেশী দেরী করার কোন অবকাশ নেই। কাজেই মায়িতের ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতির জন্য দাফনে দেরী করা ঠিক নয়। বরং তারা অনুপস্থিত থাকলেও উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন তাৎক্ষণিকভাবে দাফন কার্য শেষ করে ফেলবে। পরে তারা এসে কবর যিয়ারত করবে এবং দু‘আ করবে। তারা দূরে থাকে এবং এসে মৃত মা-বাপের চেহারা দেখবে এই অজুহাতে তাদের জন্য দাফনে বিলম্ব করা যাবে না।

৮. অনেকে মায়িতের চেহারা দেখানোর জন্য অনেক সময় নষ্ট করে; অথচ এর জন্য আলাদা সময় বরাদ্দ করা ঠিক নয়। বরং স্বাভাবিক কাজ কর্মের মধ্যে এটা সেরে নেয়া কর্তব্য বা একান্ত জরুরত পড়লে কাফন পরানোর পর জানাযার পূর্বে অল্প সময়ের মধ্যে দেখিয়ে দেয়া যায়। (আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২১৯)

৯. অনেকে জানাযার জামা‘আতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য নানা অজুহাত পেশ করে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে যে, এখন সকাল আট ঘটিকায় জানাযা পড়লে জানাযায় লোক সংখ্যা বেশী হবে না। সুতরাং বাদ যুহর বা বাদ জুম‘আ জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হবে। তাদের একথাও শরীয়ত সম্মত নয়। এটা গুনাহের কাজ। গুনাহের কাজ করে বেশী লোক হাজির করার দ্বারা মায়িতের তো কোন ফায়দা হবেই না, বরং কবরে মু‘মিনের জন্য প্রস্তুত কৃত জান্নাতের বিছানা, জান্নাতের লেবাস, জান্নাতের হাওয়া থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা হয়।

১০. অনেক লোককে দেখা যায় তারা মৃত্যুর পর লাশ দেশের বাড়িতে বাপ-মায়ের সাথে দাফন করার ওসিয়ত করে যায়। অথচ এরূপ ওসিয়ত করা শরীয়ত সম্মত নয়, এবং অন্যদের জন্য সে ওসিয়ত পূর্ণ করাও ঠিক নয়। অনেকে এ ধরনের ওসিয়ত ছাড়াও নিজের আত্মীয়স্বজনদের লাশ দেশের বাড়িতে নিয়ে যায়। এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যায়, বিদেশ থেকে দেশে নিয়ে আসে। অথচ এগুলো দাফনে বিলম্ব হওয়ার কারণ হওয়ায় এসব কাজ নিষেধ। শরী‘আতের ফয়সালা হল যে ব্যক্তি যে স্থানে বা শহরে মারা গেল তাকে তৎপার্বর্তী মুসলমানদের কোন কবরস্থানে দাফন করে দিতে হবে। (দূররে মুখতার: ৬/৬৬৬ আল বাহরুল রায়েক: ২/৩৩৫, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২০৯)

১১. অনেক জানাযার ক্ষেত্রে আরেকটি বদ রসম লক্ষ্য করা যায় যে, জানাযা নামাযের পূর্বে সমবেত মুসল্লীদের জিজ্ঞাসা করা হয় “লোকটি কেমন ছিলেন?” সকলে উত্তর দেয় “ভাল ছিলেন।” হাদীসের ফযীলত জবরদস্তী সাক্ষ্য উসূল করার দ্বারা হাসিল হবে না বরং অনেকে বাধ্য হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং এমন কথা মুখে বলে যা তার অন্তর স্বীকার করে না। এরূপ করা উচিত নয়।

১২. জানাযা নামায একাধিক বার পড়া হয়। এরূপ করা শরীয়ত সম্মত নয়। বরং তা একবার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হ্যাঁ! যদি মৃত ব্যক্তির কোন ওলী জানাযায় শরীক না হয়ে থাকে এবং তার পক্ষ থেকে পূর্বে আদায়কৃত নামাযের অনুমতিও না হয়ে থাকে তাহলে সেই ওলী পূর্বের নামাযে যারা অনুপস্থিত ছিল তাদের কে নিয়ে ২য় বার জানাযা নামায পড়তে পারে। (রদ্দুল মুহতার: ২/২২২, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২১৩)

১৩. তেমনিভাবে গায়েবানা জানাযার যে প্রথা চালু রয়েছে তা জাযিয় নেই। (ফাতহুল কাদীর: ২/১৮, জাহিরুল ফাতাওয়া: ২/১৮, মাহমুদিয়া: ৭/২২৭)

১৪. আরেকটি বদ রসম হল; অনেকে জানাযার নামাযের পরে মূর্দার চেহারা দেখায়। এতে দাফন বিলম্বিত হয়, যা শরী‘আতে নিষিদ্ধ। (বুখারী শরীফ: হা: নং ২৬৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২১৯ মাহমুদিয়া: ২/৩০৮)

১৫. আরেকটি বদ রসম এই যে, মূর্দাকে কাঁধে করে কবর স্থানে নেয়ার সময় লোকেরা উচ্চ স্বরে কালিমায়ে তাইয়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে থাকে। এটা ঠিক নয়। বরং অন্তরে অন্তরে মায়িতের জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবে। (দ্রররে মুখতার: ২/২৩৩, আল বাহরুল রায়েক: ২/৩৩৬, ইমদাদুল মুফতীন: ১৬৪, আহকামে মাইয়েত: ২৪০)

১৬. অনেক স্থানে মায়িতের খাটের উপর কালিমা বা আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি আয়াত খচিত চাদর দিয়ে মায়িতকে ঢেকে দেয়া হয়। আবার অনেকে কাফনের কাপড়ে আয়াতুল কুরসী বা অন্য কোন আয়াত লিখে দেয় অনুরূপ কেউ কেউ মাইয়িতের কপালে আঙ্গুল দিয়ে কালেমা লেখে এসবই নাজায়িয়া। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ২৬৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া: ১/৩৫১, মাহমুদিয়া: ২/৪০১)

১৭. অনেকে লাশের আগে বা পাশা-পাশি চলতে থাকে, এটাও ঠিক নয়। বরং লাশ বহনকারী ব্যতীত সকলেই লাশের পিছে পিছে চলবে এবং লাশ জমিনে রাখার পূর্বে কেউ বসবে না। (আবু দাউদ: হা: নং ৩১৮০, দ্রররে মুখতার: ২/২৩৬, আল বাহরুল রায়েক: ২/৩৩৩)

১৮. জানাযা নামাযের পরপর দাফনের পূর্বে অনেক স্থানে সম্মিলিতভাবে দু‘আ ও মুনাজাত করা হয়। এটা নাজায়িয়া। শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই। কারণ

জানাযা নামাযই মায়িতের জন্য দাফন পূর্ব সম্মিলিত দু‘আ। (বুখারী শরীফ: ২/৬৫২, আল বাহরুর রায়িক; ২/৩২১, আহসানুল ফাতাওয়া: ১/৩৫২)

১৯. জানাযার ব্যাপারে আরেকটি বদ রসম হল বিনা অপরাগতায় মসজিদে জানাযা পড়া। শরী‘আতের দৃষ্টিতে বাইরে জানাযা পড়ার সুযোগ থাকাবস্থায় মসজিদে জানাযা পড়া মাকরুহে তাহরীমী। (রদ্দুল মুহতার: ২/২২৪, আল বাহরুর রায়েক: ২/৩২৭, নসবুর রায়া: ২/২৭)

২০. স্বাভাবিকভাবে জানাযা তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ওয়াক্জিয়া নামাযের সময় হয়ে গেলে যদিও জানাযার নামায ফরয নামাযের পরে সুন্নাতের আগেই পড়া উচিত। কিন্তু বর্তমান যামানায় ফরযের পর সুন্নাত পড়ে জানাযা পড়বে। কারণ মানুষের নিকট সুন্নাতের গুরুত্ব না থাকায় একবার মসজিদ থেকে জানাযার জন্য বের হলে আর সুন্নাত পড়ার খেয়াল থাকে না। (দুররে মুখতার: ২/১৬৭, ইমদাদুল মুফতীন: ৭৩৭)

### দাফন পরবর্তী বর্জনীয় কাজ

১. জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা ইহুদী, খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের সংস্কৃতি। দীনী ইলম না থাকার দরুন এসব বিদ‘আত ও বদ রসম মুসলমানরা ভাল কাজ মনে করে চালু করে দিয়েছে। এগুলো মারাত্মক গুনাহের কাজ। এ ধরনের গুনাহ থেকে অনেকের তাওবাও নসীব হয় না। সুতরাং এগুলো অবশ্যই ত্যাগ করা কর্তব্য। (বুখারী শরীফ: হা: নং ৫৮৯২, মুসলিম শরীফ: হা: নং ২৫৯)

২. সওয়াব রেসানীর জন্য অনেকে তিনদিনা, সাতদিনা, ত্রিশা, চল্লিশা বা এজাতীয় রসমী অনুষ্ঠান করে। কুলখানী করে, প্রচলিত মীলাদ পড়ে।

ধুম-ধামের সাথে ধনী লোক ও আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াত করে খাওয়ায় ইত্যাদি। এগুলো ভুল, হিন্দুয়ানী তরীকা। শরী‘আতের দৃষ্টিতে খুশীর সময় দাওয়াত খাওয়ানোর নিয়ম। আর পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু কোন খুশীর বিষয় নয়। তাই এসব দাওয়াত খাওয়ানো কুসংস্কার। (রদ্দুল মুহতার: ২/২৪০, আহকামে মায়িত: ২৪১, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ: ৫/৪৪৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া: ১/৩৯৬)

৩. সওয়াব রেসানীর আরেকটি তরীকা হচ্ছে গরীব-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানো। অনেকে মাইয়িতের ইজমালী সম্পত্তি থেকে খানা খাওয়ায়। এক্ষেত্রে ওয়ারিশ যদি বালিগ হয় এবং সকলের পরামর্শ বা সম্মতিতে খানা খাওয়ানো হয় তাহলে শরী‘আতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন একজন ওয়ারিশও যদি নাবাগে বা পাগল থাকে বা কেউ এতে অসম্মত থাকে তাহলে এরূপ করা জায়য হবে না। এবং ঐ খানা খাওয়াও নাজায়য হবে। এর দ্বারা

এতীমের মাল খাওয়ার গুনাহ হবে। যদিও ঐ নাবালিগ বা পাগল অনুমতি দেয়। কেননা শরী‘আতে তার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়। (বাইহাকী শরীফ: ৬/১০১)

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়িতের সম্পদ বন্টনে অনেক দেৱী করা হয়, এতে বিবাহিত বোনদের এবং দূরে অবস্থানকারী ভাইদের হক নষ্ট করা হয় এবং বিশেষ করে কোন সন্তান যদি নাবালেগ হয় যাকে শরী‘আতের পরিভাষায় এতীম বলে, সেই এতীমের মাল তার মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক খাওয়া হয়। এজন্যে জরুরী হল কালবিলম্ব না করে মায়িতের রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ তার ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে প্রত্যেককে তার দখল বুঝিয়ে দেয়া। এবং এতীমের অংশ তার অভিভাবককে বুঝিয়ে দেয়া।(সূরা নিসা:৬, মা‘আরিফুল কুরআন: ২/৩০৬)

৫. পয়সার বিনিময় কুরআন খতম করে সওয়াব রেসানী করা ভুল। এতে মায়িতের কোন ফায়দা হয় না এবং যে বিনিময়ের লেন-দেন করা হয় তাও নাজাযিয। সুতরাং মায়িতের আত্মীয়-স্বজন ও মহব্বতের লোকেরা নিজের স্থান থেকে মায়িতের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করে সওয়াব রেসানী করে দিবে। (রদ্দুল মুহতার: ২/২৪১, আহসানুল ফাতাওয়া: ১/২৭৫)

৬. কবর পাকা করার যে প্রথা চালু হয়েছে এটা শরী‘আতে নিষেধ। হ্যাঁ! হিফাযতের জন্য গোরস্থানের চতুঃপার্শ্বে পাকা দেয়াল তৈরী করা যায়।(তিরমিযী হা: নং ১০৫২)

## আহকামে শহীদ

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু এড়িয়ে যাওয়া কারো সাধ্যে নেই। মৃত্যুর মধ্যে সর্বোত্তম ও সম্মানজনক মৃত্যু হল শাহাদাতের মৃত্যু। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার শাহাদত কামনা করেছেন। শাহাদাত পিয়াসী নবীর উম্মত হিসেবে মুসলমান মাত্রই শাহাদাতের তামান্না করা ও এ জন্য নিম্নোক্ত দু‘আ করা উচিত।

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাহে শাহাদাত নসীব করো।

সাধারণতঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিকেই শহীদ মনে করা হয়। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত ব্যক্তি ছাড়া আরো অনেক মাইয়েতকে শহীদী মর্যাদা লাভের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি এমন সব মাইয়েতকেও শহীদ হিসেবে গণ্য করেছেন যাদের মৃত্যুকে

সাধারণত “অপমৃত্যু” মনে করা হয় (নাউযুবিল্লাহ)। অবশ্য সশস্ত্র যুদ্ধে নিহত শহীদ আর অন্যান্য শহীদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য থাকবে।

**নিম্নে উভয় প্রকার শহীদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে।**

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ও কাফন দেয়ার দিক বিবেচনায় শহীদ দুই প্রকার।

১. হাকীকী শহীদ। যিনি দুনিয়া-আখেরাত উভয় বিচারে শহীদ। তাকে গোসল করানো হয় না। কাফন দেয়া হয় না। বরং যে কাপড়ে সে শহীদ হয়েছে সে কাপড়েই জানাযা পড়ে দাফন করা হয়।

২. হুকমী শহীদ। যিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সুসংবাদ মুতাবেক আখেরাতে শহীদের মর্তবা লাভ করবেন। কিন্তু পৃথিবীতে তার উপর প্রথম প্রকার শহীদের বিধান জারী হবে না। অর্থাৎ, সাধারন মাইয়েতের মত তাঁকেও গোসল-কাফন ইত্যাদি দেয়া হবে।

নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া গেলে তাকে হাকীকী শহীদ গণ্য করা হবে।

(ক) মুসলমান হওয়া (খ) প্রাপ্ত বয়স্ক ও বোধসম্পন্ন হওয়া (গ) গোসল ফরয হয় এমন নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া (ঘ) বে-কসুর নিহত হওয়া (ঙ) মুসলমান বা যিম্মীর হাতে নিহত হলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হওয়াও শর্ত। আর যুদ্ধ কবলিত এলাকায় কাফেরের হাতে অথবা ইসলামী খিলাফতের বিদ্রোহী ডাকাতের হাতে নিহত হলে ধারালো অস্ত্রের আঘাত শর্ত নয়। (চ) এমনভাবে নিহত হওয়া যার শাস্তি স্বরূপ প্রাথমিক পর্যায়েই হত্যাকারীর উপর কিসাসের বিধান আরোপিত হয়। (ছ) আহত হওয়ার পর কোন রূপ চিকিৎসা ও জীবন ধারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়াদী যেমনঃ খানা-পিনা ঘুমানো ইত্যাদির সুযোগ না পাওয়া। হুশ অবস্থায় তার উপর এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত না হওয়া। পদদলিত হওয়ার আশংকা না থাকলে হুশ অবস্থায় লড়াইয়ের ময়দান থেকে তাঁকে উঠিয়ে না আনা।

**এখন হুকমী শহীদের তালিকা পেশ করা হচ্ছে**

(১) এমন নিহত ব্যক্তি যার মধ্যে প্রথম প্রকার শহীদের শর্তাবলীর কোন একটি পাওয়া যায়নি। (রদ্দুল মুহতার-২/২৫২)

(২) কাফের, বিদ্রোহী বা ডাকাতের উপর কৃত আক্রমণ উল্টে এসে আক্রমণকারীকেই আঘাত করেছে এবং এ আঘাতেই আক্রমণকারী নিহত হয়েছে। (বুখারী-৩/১০২৭ পৃ: হা: ৪১৯৬)

(৩) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানারক্ষী, ডিউটিকালীন যার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। (মুসলিম-৩/১৫২০ পৃ: হা: ১৯১৩)

(৪) আল্লাহর রাহে শাহাদত লাভের প্রার্থনাকারী কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু তার সে বাসনা পূর্ণ করেনি। (মুসলিম-৩/১৫১পৃ: হা: ১৯০৯)

(৫) জালিমের সঙ্গে অথবা নিজ পরিবার হেফাজতের লড়াইয়ে মৃত্যুবরণকারী। (আহমদ-১/১৯০পৃ: হা: ১৬৫৭)

(৬) নিজের জান-মাল ছাড়িয়ে আনা বা রক্ষা করার লড়াইয়ে নিহত ব্যক্তি। (আহমদ-১/১৮৭ পৃ: ১৬৩৩)

(৭) মজলুম রাজবন্দী। বন্দীদশাই যার মৃত্যুর কারণ। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৪পৃ:)

(৮) নির্যাতনের ভয়ে আত্মগোপনকারী। যার এ অবস্থায় মৃত্যু এসে গেছে।

(৯) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী। এ মর্যাদা সে ব্যক্তিও লাভ করবে যে মহামারী চালাকালীন আক্রান্ত এলাকায় সওয়াবের নিয়তে ধৈর্য্য ধরে অবস্থান করে এবং সে সময় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। (বুখারী শরীফ:১/১৬২পৃ: হা: ৬৫৩)

(১০) ডায়রিয়ায় বা পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী। (বুখারী শরীফ-১/১৬২ পৃ. হা:৬৫৩)

(১১) নিউমোনিয়ায় মৃত্যুবরণকারী। (মাজমাউয যাওয়াইদ-৫/৩৮৯পৃ. হা: ৯৫৫৪)

(১২) **ذات الجنب** অর্থাৎ, পুরিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিও শহীদ। (সুনানে ইবনে মাজাহ-৩/৩৬৬ পৃ. হা: ২৮০৩)

(১৩) মৃগী রোগে বা বাহন হতে পড়ে মৃত্যুবরণকারী। (মুসতাদরাকে হাকেম-৩/৯০৯ পৃ. হা: ২৪১৬)

(১৪) জুরে ভুগে মৃত্যুবরণকারী। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫)

(১৫) সী সিকনেস বা সমুদ্র ঢলুনিতে মাথা ঘুরে বমি করে মৃত্যুবরণকারী। (সুনানে আবু দাউদ-২/১০পৃ. হা: ২৪৯৩)

(১৬) যে ব্যক্তি রোগ শয্যায় চল্লিশবার “লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কস্ত মিনায় যালিমীন” পড়ে এবং ঐ রোগেই পরপারে পাড়ি জমায়।

(১৭) যে দম আটকে মারা গেছে।

(১৮) বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে যার দৃত্য হয়েছে। (মুসতাদরকুল হাকেম-৩/৯০৯পৃ. হা: ২৪১৬)

(১৯) হিংস্রপ্রাণী যাকে ছিড়ে ফেড়ে মেরে ফেলেছে। (মাজমাউয যাওয়াউদ-৫/৩৯০পৃ. হা: ৯৫৫৯)

(২০) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী। (বুখারী-১/১৬২পৃ. হা: ৬৫৩)

- (২১) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণকারী। (ইবনে মাজাহ-৩/৩৬৬পৃ. হা: ২৮০৩)
- (২২) বিল্ডিং ধ্বংসে বা দেয়াল চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি। (বুখারী-১/১৬২পৃ. হা: ৬৫৩)
- (২৩) গর্ভবতী মৃত স্ত্রীলোক। (ইবনে মাজাহ-৩/৩৬৬পৃ. হা: ২৮০৩)
- (২৪) সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুবরণকারী অথবা প্রসবান্তে নেফাস চলাকালীন মৃত্যুবরণকারী। (ইবনে মাজাহ-৩/৩৬৬পৃ. হা: ২৮০৩)
- (২৫) কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী। (সুনানে ইবনে মাজাহ-৩/৩৬৬পৃ. হা: ২৮০৩)
- (২৬) প্রবাসে-পরদেশে মৃত্যুবরণকারী। (ফাতহুল বারী-৬/৫৬পৃ.)
- (২৭) ইলমে দীন চর্চায় লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫)
- (২৮) সওয়াবের আশায় আযান দেয় যে মুআযযিন। (আত্‌তারগিব ওয়াত তারহিব-১/১২৯পৃ. হা: ৩৬৪)
- (২৯) যে ব্যক্তি বিবি বাচ্চার হক যথাযথ আদায় করে এবং তাদের হালাল খাওয়ায়।
- (৩০) সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী। (সুনানে তিরমিযী-১/৩৭৭পৃ. হা: ১২১২)
- (৩১) মুসলমানদের শহরে খাদ্য আমদানীকারক ব্যবসায়ী।
- (৩২) মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহারকারী। যে শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত মন্দ লোকের সঙ্গেও মন্দ আচরণ করে না।
- (৩৩) উম্মতের ফেতনা-ফাসাদের সময় ও যিনি সুম্মতের উপর অটল থাকেন। (মেশকাত-১/৫৫পৃ. হা: ১৭৬)
- (৩৪) যিনি রাত্রিবেলায় উযু করে শয়ন করেন এবং ঐ ঘুমেই তার মৃত্যু এসে যায়। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫পৃ.)
- (৩৫) জুম'আর দিনে মৃত্যুবরণকারী। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫পৃ.)
- (৩৬) দৈনিক পঁচিশবার এই দু'আ পাঠকারী।  
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (مرقاة المفاتيح ২৭০/৫)
- (৩৭) দৈনিক চাশতের নামায আদায়কারী। মাসে তিনদিন রোযা পালনকারী এবং ঘরে-সফরে সর্বদা বেতের নামায আদায়কারী। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫পৃ.)
- (৩৮) প্রতি রাতে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতকারী।
- (৩৯) দৈনিক একশত বার দুরুদ পাঠকারী। (তুবরানী ফিল আওসাতি-৫/২৫২, পৃ. ৭২৩৫)



(৪০) যে স্ত্রীলোক তার সতীনের প্রতি তার স্বামীর (অন্যায়) ভালবাসার দুঃখ সয়ে সয়ে মৃত্যুবরণ করে। (ফাতওয়া শামী-২/২৫২, আহকামে মায়েত-১০১-১১২)

## অষ্টম অধ্যায়

### ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার শর'ই নীতিমালা

শরী'আতের বিধান মতে চাঁদের উদয়স্থল মেঘলা থাকলে রমাযানের এবং অন্যান্য মাসের জন্য মাত্র ১ জন আর ঈদুল ফিতরের জন্য মাত্র ২ জন বালগ মুসলমানের স্বচক্ষে চাঁদ দেখার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর চাঁদের উদয়স্থল সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকলে সব মাসে জম্মেগাফীর তথা এমন সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখা জরুরী যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দাতা আশ্বস্ত হতে পারেন যে, এতগুলো লোক মিথ্যার উপর একমত হতে পারে না। এদের সংখ্যা নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী নির্দিষ্ট নয় এ পরিমাণ হতে হবে যে, সিদ্ধান্ত দাতা সম্পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারেন।

#### সংশয় নিরসন

ক. কেউ কেউ মনে করেন, চাঁদের ফয়সালা দিতে হলে কাজী হওয়া জরুরী। বর্তমান সরকারী হেলাল কমিটি হল কাজীর হুকুমে। কাজেই অন্য কেউ এ ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখেন না। তাদের এ দাবী ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে শর'ই ফতওয়া হল, ইসলামী হুকুমতের অবর্তমানে ঈদ জুম'আ এজাতীয় মাসায়েলের ক্ষেত্রে দেশের প্রখ্যাত ও বিশ্বস্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম উলামাদের পঞ্চায়েতই কাজীর স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত হবেন। সুতরাং তারা শর'ই নীতিমালার ভিত্তিতে রমাযান ও ঈদের ফয়সালা দিতে পারবেন, যা ঐ দেশের সকলের জন্য (যদি তাদের নিকট সে সংবাদ পৌঁছে যায়) মান্য করা জরুরী। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ড ৪৫৬পৃষ্ঠা, রুইয়াদে হেলাল পৃ. ৬০/৬১, ইসলাম আওর জাদীদ দাওর কে মাসাইল ১২৬/১২৭ পৃষ্ঠা)

খ. আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করেন যে, সরকারী চাঁদ দেখা কমিটিতেও তো আলেম আছেন। অপর দিকে বেসরকারী উলামা মাশাইখগণ তার বিপরীত সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন-এখন আমরা কোন আলেমদের সিদ্ধান্তের উপর আমল করব। এর উত্তর হলো- যারা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিবেন তাদেরটা মান্য করা জরুরী, আর যারা বলবে আমাদের নিকট কোন প্রমাণ আসেনি, বা পাইনি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য নয়। (বুখারী শরীফ ১: ৩৬০, বাবু ইয়া শাহিদা শাহিদুন, কাওয়ায়ে ফী উলুমিল হাদীস, পৃষ্ঠা ২৯০)

যেমন মক্কা বিজয়ের সময় হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফের মধ্যে নামায পড়ে ছিলেন কিনা এ বিষয়ে সাহাবাদের রাযি.



থেকে দু'ধরনের বর্ণনা আছে। পড়ার এবং না পড়ার। কিন্তু রাসুলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার পক্ষে যারা প্রমাণ দিয়েছেন সমস্ত উলামাগণ তাদের কথা গ্রহণ করেছেন। আর যারা নামায পড়েননি বলেছেন তাদের কথা কেউ গ্রহণ করেননি। বরং তাদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে তাঁরা যেহেতু ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না এবং তাঁরা নামায পড়তে দেখেননি, তাই তারা নিজের ইলম অনুযায়ী বলছেন, যা দলীল প্রমাণের বিপরীত হওয়ায় গ্রহণ যোগ্য নয়। (ফাতহুলবারী, ৫৯৭-৮ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৬০১, উমদাতুলকারী, ৩৭০ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৩৯৭)

(গ) অনেকে প্রশ্ন করেন জাম্মেগাফীর হতে হলে ৫০ জন লোক হতে হবে এবং তাদের সকলের একই এলাকা হতে হবে। এর উত্তর হলো যে নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং এক এলাকা থেকে হতে হবে এরও কোন দলীল নেই বরং জাম্মেগাফীর এর মূল কথা হল যে, বিভিন্ন এলাকা হতে এ পরিমাণ লোক বর্ণনা দিতে হবে যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে সিদ্ধান্তদাতা পুরাপুরি আশ্বস্ত হয়ে যায়। (মুফতি শফী রহ. সংকলিত রুইয়াতে হেলাল, ৬৪ পৃষ্ঠা)

মজার ব্যাপার হল, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, বর্তমান যমানায় জাম্মেগাফীর থেকে দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত দেয়া বেশী যুক্তিযুক্ত এবং এর দ্বারাও উদয়স্থল পরিষ্কার থাকার ক্ষেত্রে রোযা ও ঈদ প্রমাণিত হবে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, চাঁদ তালাশ করার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে চরম অনীহা রয়েছে। অপর দিকে কেউ চাঁদ দেখার খবর দিলে তার উপর নানা রকম হয়রানী ও অত্যাচার করা হয়। যে কারণে যারা চাঁদ দেখে তারাও বলতে সাহস করে না। এমতাবস্থায় জাম্মেগাফীর তথা অনেক লোকের দেখার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে, অনেক লোক জোগাড় করতে করতে রোযা বা ঈদ দু'তিন দিন পরে করতে হবে, যা শরী'আতে কোন অবস্থায় কাম্য নয়। (দেখুন ফাতাওয়া শামী, ২য় খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

### চাঁদ দেখা কমিটি কেমন হওয়া উচিত

(ক) বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদ দেখা কমিটিতে কিছু আলেম থাকলেও কোন বিজ্ঞ মুফতী (যিনি কোন নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া বিভাগ পরিচালনা করেন) আছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর দু'একজন যারা আছেন, তাদের কথাও অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং এ ধরনের হেলাল কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য নয়। সরকারের যদি জটিলতা এড়ানোর সদিচ্ছা থাকে তাহলে এক বা একাধিক এ ধরনের মুফতীকে চাঁদ দেখা কমিটির শুধু সদস্যই নয় বরং তাকেই আমীরে ফয়সালা নিযুক্ত করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, পৃষ্ঠা ১৪৮, খণ্ড ১৭)

(খ) শুধু ডিসিদের উপর ভিত্তি না রেখে প্রত্যেক জেলার বড় মাদরাসার দায়িত্বশীলকে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার খবর দেয়ার জন্য দায়িত্ব দিতে হবে।

(গ) চাঁদ দেখা কমিটি বর্তমানে যেভাবে চাঁদ দেখার প্রচার করেন তা শরীয়ত সম্মত হয় না এবং শরী‘আতের দৃষ্টিতে তা মান্য করাও দেশবাসীর জন্য জরুরী হয় না। সুতরাং কোন্ কোন্ এলাকা থেকে কে কে চাঁদ দেখেছেন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে রোযা বা ঈদের ফয়সালা করেছেন তা উল্লেখ করে চাঁদ দেখার ঘোষণা দিতে হবে।

(ঘ) সর্বোপরি চাঁদ দেখা না গেলে সম্ভাব্য সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত দেয়া বন্ধ করতে হবে। বলতে হবে এখনো শরীয়ত সম্মতভাবে চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া যায়নি। আপনারা অপেক্ষা করুন। কারণ সারা দেশ থেকে এত অল্প সময়ে শরীয়ত সম্মত ভাবে খবর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

(ঙ) যারা চাঁদ দেখার সংবাদ দেয় তাদের খবর গুরুত্ব সহকারে শুনতে হবে। বিবেচনা করতে হবে।

## নবম অধ্যায়

### রোযার ফযীলত ও জরুরী মাসাইল

#### ১. রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন: (তরজমা) হে মুমিন সকল! তোমাদের উপর রমায়ানের রোযা ফরয করা হলো, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। (সূরা বাকারা-১৮৩)

হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় রমায়ান শরীফের রোযা রাখে, (অন্য বর্ণনায়) ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় তারাবীহের নামায পড়ে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারী শরীফ: হা: নং ১৯০১)

#### রোযার নিয়ত

রমায়ানের রোযার জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে মনে মনে এই নিয়ত করবে যে, ‘আমি আজ রোযা রাখবো’ অথবা দিনে আনুমানিক ১১টার পূর্বে মনে মনে এইরূপ নিয়ত করবে যে, আমি আজ রোযা রাখলাম। মুখে নিয়ত করা জরুরী নয়, বরং মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার: ২/৩৭৭)

বি. দ্র. : আরবী ভালভাবে বলতে পারলে ও বুঝলে আরবীতেও নিয়ত করতে পারবে। অন্যথায় বাংলায় নিয়ত করা ভালো।

### সাহরী ও ইফতার

রোযাদারের জন্য সাহরী খাওয়া ও ইফতার করা সুন্নাত। বিশেষ কিছু না পেলে সামান্য খাদ্য বা কেবল পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

ইফতার খুরমা কিংবা খেজুর দ্বারা করা সুন্নাত। তা না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। ইফতারের কিছুক্ষণ পূর্বে এ দু'আটি বেশী বেশী পড়বে:

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي

অর্থঃ হে মহান ক্ষমা দানকারী! আমাকে ক্ষমা করুন। (শু'আবুল ঈমান: ৩/৪০৭)

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَاتِهِ

বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকতিল্লাহ। বলে ইফতার শুরু করবে এবং ইফতারের পর নিম্নের দুটি দু'আ পড়বে:

۱. اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ افْطَرْتُ

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি, এবং তোমারই দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করলাম।) (আবু দাউদ: ১/৩২২)

ۨ. ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْسَلَتِ الْعُرُوقُ وَتَبَّتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

(অর্থঃ পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীসমূহ সতেজ হয়েছে, এবং ইনশাআল্লাহ রোযার সওয়াব নিশ্চিত হয়েছে।) (আবু দাউদ: ১/৩২১)

৩. ইফতারীর দাওয়াত খেলে মেজবানের উদ্দেশ্যে এই দু'আ পড়বে:

افْطَرَعْنَدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَاكُلْ طَعَامَكُمْ الْاَبْرَارُ وَصَلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

(অর্থঃ আল্লাহ করুন যেন রোযাদারগণ তোমাদের বাড়ীতে রোযার ইফতার করে এবং নেক লোকেরা যেন তোমাদের খানা খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের উপর রহমতের দু'আ করে।) (আম্পুনানুল কুবরা, নাসাঈ ৬:৮১, ইবনুস সুন্নীঃ ৪৩৩)

### রোযার গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল

১. রমায়ানের প্রত্যেক দিনেই ঐ দিনের রোযার নিয়ত করা জরুরী। একদিনের নিয়ত পুরো মাসের রোযার জন্য যথেষ্ট নয়। (দুররে মুখতার: ২/৩৭৯)

২. যদি কেউ রোযার নিয়ত ব্যতীত এমনিতেই সারা দিন না খেয়ে থাকে, তাহলে এটা রোযা বলে ধর্তব্য হবে না। (রদ্দুল মুহতার: ২/৩৭৭)

৩. সুবহে সাদিকের পর খানা-পিনা জায়িয় নেই। আযান হোক বা না হোক। লোক মুখে যে প্রচলিত রয়েছে যে, সুবহে সাদিকের পরেও আযান পর্যন্ত খাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ ভুল। (রদ্দুল মুহতার: ২/৪১৯)

৪. রোযা অবস্থায় গোসল করলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। তবে কুলী করার সময় গড়গড়া করবে না এবং নাকে পানি দেয়ার সময় নাকের মধ্যে জোরে পানি টানবে না। (দুররে মুখতার: ২/৪১৯)

৫. রোযা অবস্থায় কাউকে রক্ত দিলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। যদি রক্তদাতার শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। (রদ্দুল মুহতার: ২/৪১৯)

৬. রমায়ান মাসের দিনে বা রাতে কেউ যদি বেহুঁশ হয়ে যায় এবং তা যদি কয়েকদিন বা অবশিষ্ট পুরো মাস পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে প্রথম যে দিন বেহুঁশ হয়েছে ঐ দিন বাদ দিয়ে বাকী দিনগুলির রোযার কাযা করতে হবে। (দুররে মুখতার: ২/৪৩২)

৭. রমায়ান মাসে কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে তার রোযা মাফ হয়ে যায়। তবে পুরো মাসের কোন অংশে সুস্থ হলে পূর্বের রোযাগুলোর কাযা করতে হবে। (আল বাহরুর রায়েক: ২/৫০৭)

৮. হস্তমৈথুন করলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং তার কাযা আদায় করা জরুরী। এটা জঘন্য পাপকার্য। হাদীসে এইরূপ ব্যক্তির উপর লানত করা হয়েছে। (দুররে মুখতার: ২/৩৯৯)

৯. যদি রোযা অবস্থায় দাঁত দিয়ে রক্ত বের হয়েছে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যায় এবং তা পরিমাণে কম হয়, তাহলে রোযা নষ্ট হবে না। আর যদি রক্ত থুথুর সমান বা থুথু থেকে বেশী হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এবং তার কাযা করতে হবে। (দুররে মুখতার: ২/৩৯৬)

১০. বাচ্চাকে দুধ পান করালে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু নামায অবস্থায় দুধ পান করালে নামায ভেঙ্গে যায়। (দুররে মুখতার: ২/৩৭১)

১১. সফরে যদি কষ্ট হয় তাহলে রোযা না রাখা জায়িয় আছে বরং না রাখা উত্তম। আর সফরে কষ্ট না হলে রোযা রাখাই হল মুস্তাহাব। তবে রোযা রেখে ভাঙ্গা ঠিক নয়। কেউ যদি ভেঙ্গে ফেলে তাহলে কাফফারা আসবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যদিও গ্রহণযোগ্য মত হল যে, এই সূরতে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪৪)

১২. কেউ রোযা রাখার পর মারাত্মক অসুস্থ হয়ে গেলে অথবা পূর্বের রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে রোযা ভাঙ্গা জায়িয় আছে। পরবর্তীতে কাযা করতে

হবে। একান্ত কায্য করার শক্তি না পেলে উক্ত রোযার ফিদিয়া দিতে হবে অর্থাৎ, প্রত্যেক রোযার বদলে একজন গরীবকে দু'বেলা খাওয়াতে হবে বা পোনে দু'সের আটা কিংবা তার মূল্য গরীবকে দিতে হবে। (দুররে মুখতার: ২/৪২২)

১৩. নাবালেগ ছেলে-সন্তানদেরকে রোযা রাখার হুকুম করতে হবে, যদি তারা এর শক্তি রাখে এবং এর দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি না হয়। আর দশ বৎসর বয়সে রোযা রাখতে শুরু না করলে প্রয়োজনে প্রহার করা যাবে।(দুররে মুখতার: ২/৪০৯)

১৪. রমায়ানের দিনের বেলায় কোন ছেলে বা মেয়ে বালেগ হলে বা কোন কাফের মুসলমান হলে কিংবা মুসাফির সফর শেষ করলে বাকী দিন খানা-পিনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

### **ঋতুবতী মহিলার হুকুম**

১. ঋতুবতী কোন মহিলার যদি দিনের বেলায় শ্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দিনের বাকী সময় খানা-পিনা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। আর কোন মহিলার রোযা অবস্থায় ঋতুশ্রাব শুরু হয়ে গেলে তার জন্য উপবাস থাকা জাযিয় নেই। বরং সে চুপে চুপে খানা-পিনা করবে এবং পরবর্তীতে রোযাগুলির কায্য করবে। (দুররে মুখতার: ২/৪০৮, ইমদাদুল আহকাম: ২/১৩৯)

২. যদি কোন মহিলা ঔষধ সেবন করে ঋতুশ্রাব বন্ধ রাখে তাহলে তাকে পুরো মাসই রোযা রাখতে হবে। তবে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত করার দরুন কাজটি ঠিক হবে না। (ফাতাওয়া রহীমিয়া: ৬/৪০৪)

### **রোযা ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ**

১. রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় কোন কিছু খাওয়া বা পান করা অথবা স্ত্রী-সহবাস করা। এতে কায্য ও কাফফারা (একাধারে দুই মাস রোযা রাখা) ওয়াজিব হয়। ২. নাকে বা কানে তৈল বা ঔষধ প্রবেশ করানো। ৩. নস্য বা হাপানী রোগীর জন্য ইনহেলার গ্রহণ করা। ৪. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভরে বমি করা। ৫. বমি আসার পর তা গিলে ফেলা। ৬. কুলী করার সময় পানি গলার ভিতরে চলে যাওয়া। ৭. দাঁতে আটকে থাকা ছোলার সমান বা তার চেয়ে বড় ধরনের খাদ্যকণা গিলে ফেলা। ৮. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পরে জাগ্রত হওয়া। ৯. ধূমপান করা। ১০. ইচ্ছাকৃতভাবে আগরবাতি কিংবা অন্য কোন সুগন্ধি দ্রব্যের ধোঁয়া গলধকরণ করা বা নাকের ভিতরে টেনে নেওয়া। ১১. রাত্র মনে করে সুবহে সাদিকের পর সাহরী খাওয়া বা পান করা। ১২. সূর্যাস্তের পূর্বে সূর্য অস্তমিত হয়েছে ভেবে ইফতার করা। এগুলোতে শুধু কায্য ওয়াজিব হয়, কাফফারা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার পর দিনের বাকী সময়

রোযাদারের ন্যায় পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার: ২/৪০২)

### রোযা মাকরুহ হওয়ার কারণসমূহ

১. মিথ্যা কথা বলা। ২. গীবত বা চোগলখোরী করা। ৩. গালাগালি বা ঝগড়া-ফাসাদ করা। ৪. সিনেমা দেখা বা অন্য কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া। ৫. সকাল বেলায় নাপাক অবস্থায় থাকা। ৬. রোযার কারণে অস্থিরতা বা কাতরতা প্রকাশ করা। ৭. কয়লা, মাজন, টুথ পাউডার, টুথপেস্ট বা গুল দিয়ে দাঁত মাজা। ৮. অনর্থক কোন জিনিস মুখের ভিতরে দিয়ে রাখা। ৯. অহেতুক কোন জিনিস চিবানো বা চেখে দেখা। ১০. কুলী করার সময় গড় গড়া করা। ১১. নাকের ভিতর পানি টেনে নেয়া। (কিন্তু উক্ত পানি গলায় পৌঁছলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।) ১২. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা। ১৩. ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করা। (দুররে মুখতার: ২/৪১৬, বাদাইউস সানায়ে: ২/৬৩৫, কিতাবুল ফিকহ: ১/৯২৩)

### যে সমস্ত কারণে রোযার ক্ষতি হয় না

১. ভুলক্রমে পানাহার করা। ২. আতর সুগন্ধি ব্যবহার করা বা ফুল ইত্যাদির ঘ্রাণ নেওয়া। ৩. নিজ মুখের থুথু ও কফ জমা না করে গিলে ফেলা। ৪. শরীর বা মাথায় তৈল ব্যবহার করা। ৫. ঠাণ্ডার জন্য গোসল করা। ৬. ঘুমে স্বপ্নদোষ হওয়া। ৭. মিসওয়াক করা। ৮. অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়া ৯. চোখে ঔষধ বা সুরমা ব্যবহার করা। ১০ যে কোন ধরনের ইনজেকশন লওয়া। (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার: ২/৩৯৪)

## তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আত

হযরত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর উস্তাদ আবু বকর ইবনে শাইবা রহ. এর কিতাব আল মুসান্নাফ পৃঃ ২/১৬৬, হাদীস নং ৭৬৯১, এছাড়া হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব বাইহাকী পৃঃ ২/৬৯৮-৬৯৯, হাদীস নং ৪৬১৫, ৪৬১৭, তাবারানী পৃঃ ১১/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩৩, “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসের রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল দ্বারা ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায প্রমাণিত।” (আন-নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ-১/৩৯০, আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ-১/৪৯৪)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযি. তার খেলাফত আমলে মসজিদে নববীর মধ্যে তারাবীহ নামাযের অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামা'আতকে একত্র করে হযরত উবাই বিন কাআব রাযি. এর ইমামতীতে ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামাযের হুকুম দিয়েছিলেন। সকল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাঁর সমর্থন করেছিলেন। তারাবীহ নামায যদি নবী আলাইহিস সালাম থেকে ২০ রাকা'আত প্রমাণিত না

হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. অবশ্যই আপত্তি তুলতেন (বাইহাকী পৃঃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬১৭, ৪৬২০, ৪৬২১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক পৃঃ ৪/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩২, বুখারী পৃঃ ১/৪৭৪, হাদীস নং ২০১০, মাজামাউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া- ২/১১২-১১৩ বাদায়েউস সানায়ে-১/৬৪৪)

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী রাযি., চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাযি. সহ সাহাবায়ে কিরামের রাযি. ঐক্যমতে, উম্মাতে মুসলিমার ১৪০০ শত বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক আমল তারাবীহ নামায বিশ রাকা‘আত চলে আসছে। যা আজ পর্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে চালু আছে (বাইহাকী কুবরা পৃঃ ২/৪৯৬, হাদীস নং ৪৬১৭, পৃঃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬২০, ৪৬২১, শরহুল মুহাজ্জাব পৃঃ ৩/৩৬৩-৩৬৪)

ইমাম আ’জম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. যারা প্রত্যেকে স্বীয় যামানায় সব চেয়ে বড় কুরআন ও হাদীস বিশারদ ও ফকীহ ছিলেন তাদের সকলের মতে তারাবীহ নামায ২০ রাকা‘আত, ৮ রাকা‘আত নয়। (আলমাবসূত পৃঃ ২/১৯৬, ই‘লাউস সুনান পৃঃ ৭/৬৯/৭১, আত্তামহীদ পৃঃ ৩/৫১৮, আলমুদাউওয়ানাতুল কুবরা পৃঃ ১/২৮৭, শরহুস সুম্মাহ পৃঃ ২/৫১১, মুগনী পৃঃ ২/৬০৪)

আট রাকা‘আত তারাবীহ নামায পড়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর ইজমা পরিপন্থী এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের বিপরীত, অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের জন্য তাকীদ করে গেছেন। (আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৭, তিরমিযী হাদীস নং ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪২-৪৩)

আট রাকা‘আত নামাযের হাদীসটি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দেসীনে কিরামের মতে একান্তভাবে তাহাজ্জুদের জন্য প্রযোজ্য। কোন অবস্থায় তা তারাবীহ নামাযের জন্য প্রযোজ্য নয়, এ জন্য তাঁরা এ হাদীসটি তাদের কিতাবে তাহাজ্জুদের অধ্যায় এনেছেন, তারাবীহ অধ্যায়ে তারাবীহ নামাযের রাকা‘আতের সংখ্যা প্রমাণের জন্য আনেননি। তাছাড়া উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসটি এমন এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর যার ধারণা ছিল নবী ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে অন্য মাসের তুলনায় তাহাজ্জুদ নামায অনেক বেশি পড়তেন, তার প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, “নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে ও রমযানের বাইরে অন্যান্য মাসে আট রাকা‘আতের বেশী তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন না।”

এখানে তিনি এমন নামাযের কথা আলোচনা করেছেন যা রমযান শরীফে এবং রমযান ছাড়া অন্য মাসেও পড়া যায়। আর তারাবীহ নামায রমযান ছাড়া অন্য মাসে পড়া যায় না। কাজেই এ হাদীস দ্বারা কস্মিনকালেও তিনি তারাবীহ নামায



৮ রাকা‘আত বুঝাননি। বরং তাহাজ্জুদের নামায ৮ রাকা‘আত বুঝিয়েছেন। যা রমাযান ও রমাযানের বাইরেও পড়া যায়।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কতক লোক যারা হাদীসের মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ তারা এ হাদীসের দ্বারা তারাবীহ নামায ৮ রাকা‘আত প্রমাণ করে, যা নিতান্তই বোকামী। (বুখারী পৃঃ হাদীস নং ১১৪৭, বুখারী হাদীস নং ২০১৩)

তারাবীহ নামায মাত্র ৮ রাকা‘আত মনে করে পড়লে তা একাধারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল খুলাফায়ে রাশেদীন এর আমল এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর ইজমা বা ঐক্যমতের পরিপন্থী হওয়ায় জঘন্য বিদ‘আত এবং মনগড়া ইবাদত হবে। যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুযায়ী গোমরাহী এবং জাহান্নামের আমল। এর থেকে বেঁচে থাকা সকল মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। (বুখারী হাদীস নং ২৬৯৭, মুসলিম হাদীস নং ১৭১৮, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৬, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৪)

তারাবীহ নামাযে বিতর সহ ৪ রাকা‘আত পর পর ৫ টি বিরতি। (বাইহাকী হাদীস নং ৪৬২১, হিদায়া পৃঃ ১/১৫০, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া পৃঃ ১/৬৫৪)

তারাবীহা অর্থ বিশ্রাম করা, তার বহুবচন তারাবীহ। শব্দটি বহু বচন হওয়াটা দলীল যে এ নামাযে দু’এর অধিক বিরতি বিশ্রাম হওয়া জরুরী। তারাবীহ ৮ রাকা‘আত হলে তা কখনো সম্ভব হবে না।

তারাবীহ সহ সকল প্রকার নামাযে তাজবীদের সাথে তিলাওয়াত করা জরুরী। তাজবীদ বিহীন অস্পষ্ট অতি দ্রুত তিলাওয়াত শরী‘আতে নিষেধ। (সূরায়ে মযযাম্বিল ৪ তাফসীরে মাজহারী পৃঃ ৯/১০, তালীফাতে রশীদিয়া পৃঃ ২৬৯)

•খতমে তারাবীহ নামাযের পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়টা নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং ৭৭৩৮, ৭৭৪২, ফাতাওয়ায়ে শামী পৃঃ ৫/৫৬, ইমদাদুল মুফতীন পৃঃ ৩১৫, আহসানুল ফতওয়া ৩/৫১২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৪/২৭৩)

**জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে সুন্নাহ তরীকায় তারাবীহ পড়ার জন্য  
হাফেয সাহেব নেয়ার শর্তাবলীঃ**

১. হাফেয সাহেব ও তারাবীহ কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার ভাবে তারাবীহ নামাযের বিনিময় লেন-দেন না করার ব্যাপারে একমত হতে হবে।



২. তারাবীহতে খতমের সময় টাকা-পয়সা বা অন্য কোন প্রকার হাদিয়া, সম্মিলিত কালেকশনের কিংবা মসজিদ ফান্ডের টাকা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই হাফেয সাহেবকে দেয়া যাবে না, আর হাফেয সাহেবও নিবেন না। কেননা এটা শরী‘আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজাযিয় ও গুনাহের কাজ।

৩. হাফেয সাহেবকে দ্রুত পড়তে বাধ্য করা যাবে না, কেননা এভাবে কুরআন তিলাওয়াতে গুনাহ হয়। হাফেয সাহেব তারাবীহতে হদর অর্থাৎ, সহীহ শুদ্ধ করে মধ্যম গতিতে পড়বেন। তারাবীহতে লুকমা দেয়া হলে হাফেয সাহেব হা গ্রহণ করবেন, লুকমা গ্রহণে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।

৪. প্রতি চার রাকা‘আতের শেষে ‘সুবহানাল্লাহিল মুলকি’ পড়া অথবা সম্মিলিত মুনাজাত করা হাদীসে প্রমাণিত নেই, এর জন্য হাফেয সাহেবকে হুকুম করা যাবে না। বরং সে সময় যে কোন দু‘আ বা যিকির করা যেতে পারে। তেমনি ভাবে “আল্লাহুম্মা ইন্ন্যাস আলুকাল জাম্মাহ” তারাবীহ নামায শেষে গুরুত্ব সহকারে পড়া হয়, অথচ এভাবে পড়াও হাদীসে প্রমাণিত নেই। সুতরাং এর জন্যও হাফেয সাহেবদেরকে হুকুম করা যাবে না।

৫. তারাবীহ নামাযের মাঝে হাফেয ইমাম বদল যে কোন চার রাকা‘আতের পরে হওয়া উত্তম। দশ রাকা‘আতের মাথায় না করা চাই।

৬. হাফেয সাহেবদের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের জামা‘আত বা কিয়ামুল লাইল এর জামা‘আত (তিন জনের বেশী মুসল্লী দ্বারা) চালু করা যাবে না। কারণ এটা না জাযিয়।

৭. হাফেয সাহেবদের মাধ্যমে প্রতিদিন স্বল্প সময়ের জন্য সুন্নাতের তা‘লীম ও নামাযের আমলী মশকুের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

৮. হাফেয সাহেবদের রমযানের খানার ইস্তেযাম করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকবে।

৯. প্রতিদিন যাতায়াত করলে তার খরচ এবং তারাবীহ খতম শেষে হাফেয সাহেব নিজ বাড়িতে পৌঁছার খরচ কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে।

১০. খতমের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় কেউ যদি নিজ উদ্যোগে হাফেয সাহেবের মুহাব্বতে ব্যক্তিগত ভাবে হাদিয়া পেশ করেন তাহলে শরি‘আতে তার অনুমতি আছে এবং এটা আলেম-উলামা ও তালেবে ইলমদের খেদমতের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রতি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমের তৃতীয় পারায় সূরা বাকারায় ২৭৩ নং আয়াতে উৎসাহিত করেছেন। তবে এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, কেউ করতে চাইলে করতে পারেন।

**তারাবীহ এর বিনিময় গ্রহণের শরয়ী বিধান**

তারাবীহ এর নামাযে ইমামতের বিনিময় আদান-প্রদান না-জায়য হওয়া নির্ভরযোগ্য সকল ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত মত। অতীতের কোন ফক্বীহ এ ব্যাপারে দ্বিমত করেননি। এতদসত্ত্বেও বর্তমানে কেউ কেউ নিজস্ব মতকে শরী‘আতের মত ও ফিকাহবিদদের মত হিসাবে প্রচার করে তারাবীহ এর উজরতকে বৈধ বলার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে সমকালীন বিশিষ্ট মুফতিয়ানে কিরামের ফাতাওয়া নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

**ফাতাওয়া বিভাগ, জামি‘আ রাহমানিয়া, ঢাকা।**

ইবাদত বন্দেগী হিসাবে আমরা যা পালন করে থাকি, সাধারণত তা তিন প্রকার (ক) মাকাসিদ তথা খালেস ও মূল ইবাদাতঃ- যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ও দু‘আ দুরুদ ইত্যাদি (খ) ওয়াসাইল তথা সহায়ক ইবাদাতঃ- যেমন ইমামত, ইকামত, দীনী শিক্ষাদান ও ওয়াজ নসীহত ইত্যাদি। (গ) রুকুইয়াত তথা বালা মুসীবত থেকে পরিত্রাণ, রোগ মুক্তি, ব্যবসায় উন্নতি এ জাতীয় দুনিয়াবি কোন উদ্দেশ্যে বৈধ দু‘আ, খতম, ঝাড় ফুক, তাবীয কবয ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার তথা মাকাসিদ জাতীয় ইবাদত করে বিনিময় নেয়া-দেয়া সম্পূর্ণ ও সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ ব্যাপারে কোন কালেও কোন মাযহাবের কোন নির্ভরযোগ্য আলেম ফক্বীহ দ্বিমত পোষণ করেননি। পক্ষান্তরে তৃতীয় প্রকার আমলের বিনিময় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হালাল। শুরু থেকে অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোন মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোন মুজতাহিদ ফক্বীহ দ্বিমত পোষণ করেননি। (রব্দুল মুহতার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫,৫৮ পৃষ্ঠা, আল মুদওয়ানা তুল কুবরা ৩য় খন্ডঃ ৪৩১ পৃষ্ঠা, ফাতওয়া রশীদিয়া-৪১৭পৃষ্ঠা।)

আর দ্বিতীয় প্রকার তথা আযান, ইমামত, কুরআন-হাদীস তথা দীনী তা‘লীম এ জাতীয় পর্যায়ে ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ ও প্রদান অন্যান্য মাযহাবে জায়য থাকলেও হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মতে নাজায়য। কিন্তু উলামায়ে মুতাআখখিরীন (পরবর্তী যুগের আলেমগণ) শরী‘আতের বিশেষ উসূল তথা মূলনীতির ভিত্তিতে বিশেষ কতক ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ ও প্রদানকে বৈধ বলেছেন। সে উসূল হলো এ শ্রেণীর যে সকল ইবাদাত ফরয ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং শি‘আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা দীনের স্থায়িত্ব তার উপর নির্ভরশীল বিধায় বিনিময়ের আদান-প্রদান বৈধ না হলে এ যুগে এসকল ইবাদত কায়েম রাখা সম্ভব হবে না, তাই দীনের স্থায়িত্বের প্রয়োজনেই তা জায়য। ফিকাহবিদগণ সে সকল ইবাদতকে চিহ্নিতও করেছেন আর তা হলোঃ ফরয ওয়াজিব নামাযের ইমামতি, আযান-ইকামত, দীনী

শিক্ষাদান ইত্যাদি। (সূত্রঃ রদ্দুল মুহতার-৬ষ্ঠ খণ্ডঃ ৬৯০, ৬৯১ পৃষ্ঠা। ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ৪৭৬ পৃষ্ঠা ইমাদদুল মুফতীন ৩১৩ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল আহকাম-৩য় খণ্ড ৫২৭ পৃষ্ঠা)

পক্ষান্তরে এ দ্বিতীয় প্রকারের যে সকল ইবাদাত ফরয ওয়াজিব নয় এবং শি‘আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়, দীনের স্থায়িত্বও তার উপর নির্ভরশীল নয় যেমনঃ তারাবীহ এবং সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করা। এ সকল ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ ও বিনিময় প্রদানকে কোন আলেম জাযিয় বলেননি বরং নির্ভরযোগ্য সকল ফিক্বাহবিদ লেনদেনকে হারাম বলেছেন। (ফাতওয়া রশীদিয়া ৩২৪পৃঃ, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ৪৮৪ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল মুফতীন ৩১৫ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল আহকাম ৩য় খণ্ড ৫১৭ পৃষ্ঠা। আহসানুল ফাতওয়া ৩য় খণ্ড ৫১৪ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা, ফাতওয়া দারুল উলুম ৪র্থ খণ্ড ২৭৩ পৃষ্ঠা।)

সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবের “ইসলামী জীবন পাতায়” একটি প্রশ্নের জবাবে দুজন আলেম তারাবীহের বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে একজন আলেম তার বর্ণনার এক পর্যায়ে লিখেছেন “যুগের সকল ইমাম মুজতাহিদ ঐক্যবদ্ধভাবে রায় দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন সুন্নাহর হেফাজত তথা তালীমে ইলমে দীন, ওয়াজ নসীহত, আযান ইকামত এক কথায় যাবতীয় ধর্মীয় আমলগুলোর উপর হাদিয়া বা উজরত যে কোন নামে দেয়া নেয়ায় কোন দোষ নেই বরং উচিত।” এ উক্তি়র শেষ বাক্যে তিনি ইবাদাতের সব শ্রেণীকে একাকার করে ফেলেছেন। যার মর্ম দাঁড়ায় যে অন্যের জন্য নামায পড়ে, রোযা রেখে বিনিময় গ্রহণ করা যাবে বলে যুগের সকল ইমাম মুজতাহিদ ও আলেম ঐক্যবদ্ধ রায় দিয়েছেন। এমন কথা কোন মূর্খ বা দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট খেয়ানতকারী ছাড়া বলতে পারে না। তিনি প্রমাণ করতে গিয়ে যে সকল কিতাবের বরাত দিয়েছেন, সেগুলোতে এ জাতীয় ফতোয়ার কোন উল্লেখ নেই। আর তারাবীহের বিনিময় আদান-প্রদান বৈধতার কথা থাকার তো প্রশ্নই আসেনা। আর অপর আলেম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ইমামতের উপর কিয়াস করে তারাবীহের ইমামতকেও জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এর বিনিময়কে জাযিয় বলেছেন। অথচ তারাবীহের নামায একদিকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ অপরদিকে জামা‘আত সহকারে খতম তারাবীহের পরিবর্তে সূরা তারাবীহ পড়ার অবকাশও রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার ২য় খণ্ডঃ ৪৫পৃঃ রদ্দুল মুহতার ২য় খণ্ড ৪৭ পৃঃ)

পক্ষান্তরে পাঁচ ওয়াক্তের জামা‘আত মুসাফির ও মায়ূর লোক ছাড়া সকল সাবালক পুরুষের জন্য বিশেষ ওয়র না থাকলে মসজিদে গিয়ে আদায় করা ওয়াজিব। তাহলে উভয়টা এক রকম কি করে হলো? এ ছাড়া হাফেযগণ নিজ নিজ হিফয ঠিক রাখার তাগিদেই তারাবীহ পড়ানোর সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এমতাবস্থায় বিনিময় না দিলে হাফেয পাওয়া যাবে না, বা খুব কম পাওয়া যাবে

এ ধারণা তাঁর মধ্যে কি করে জন্ম হলো? তদুপরি জনাব মুফতি সাহেব তারাবীর বিনিময় বৈধতায় নিজ মত উল্লেখ করার পর এ ব্যাপারে উলামায়ে মুতাআখখিরীনদের ফাতাওয়া নিম্নরূপ বলে যে বরাত দিয়েছেন তাতে সকলেই সর্বসম্মতভাবে এর বিনিময় লেন-দেনকে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন। তাঁরা পরিস্কার ভাবে বলেছেন তারাবীহের নামায সুন্নাত আর এর বিনিময় লেন-দেন হারাম। তাই সুন্নাত কায়েমের জন্য হারাম কাজের অনুমতি নেই। (ইমদাদুল ফাতওয়া ১ম খণ্ড ৪৮৪ পৃষ্ঠা ইমদাদুল মুফতীন ৩১৫ পৃষ্ঠা)

আর তৎপূর্ববর্তীগণ সম্ভবত তারাবীহ এর বিনিময় নেয়ার কল্পনা করেননি। যার কারণে তাদের কিতাবাদীতে এতদসংক্রান্ত কোন আলোচনাই পাওয়া যায় না। তাছাড়া আলোচ্য মুফতী সাহেব তাঁর বর্ণনায় এক পর্যায়ে লিখেছেন, ‘তারাবীহের নামাযের ইমামতি অন্য নামাযের ইমামতি হতে পৃথক নহে।’ (হেদায়া প্রথম খণ্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)

এটা পত্রিকার ছাপার ভুল না হয়ে থাকলে ইলমী বিষয়ে চরম খেয়ানত বিবেচিত হবে। কেননা হেদায়া গ্রন্থের কোথাও তারাবীহের জামা‘আতের ইমামতীকে অন্য নামাযের ইমামতীর ন্যায় বলা হয়নি, এটা নিছক মুফতী সাহেবের নিজস্ব উক্তি, যার রেফারেন্স কোন ফাতাওয়ার কিতাবে নেই।

সারকথা, ঢালাওভাবে সকল ধর্মীয় আমলের বিনিময় আদান-প্রদানের কথা যেমন ঠিক নয়, তেমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান-ইমামত যেমন জরুরত, তারাবীহের ইমামত ঠিক সে রকম জরুরত সে কথাও কোথাও নেই। বরং আকাবির সাহাবাগণ তো তারাবীহ নামায নিজ নিজ বাড়িতে পড়তেন। এ কারণে বর্তমান ও নিকট অতীতের সকল নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া অনুযায়ী তারাবীহ-এর ইমামতী করে বিনিময় দেয়া ও নেয়া বৈধ নয়। আর হাদিয়ার সাথে তারাবীহ এর ইমামতের কোন সম্পৃক্ত নেই। কাজেই হাদিয়ার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। খতমের সময় ব্যতীত অন্য সময় যদি হাফেজ সাহেবের মুহাব্বতে ব্যক্তিগতভাবে কেউ হাদিয়া পেশ করেন তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস এবং তা শরী‘আতেও অনুমোদিত। (ফাতাওয়া রশীদিয়া ৩২৫ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল মুফতীন ৩১৪ পৃষ্ঠা, ফাইজুল বারী ৩য় খণ্ডঃ ১৮১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং হাফেজদের নিজেদের হারাম রিযিক থেকে পরহেজ করা ফরয এবং মুসল্লীদেরও উচিত ক্বারী, হাফেজ আলেমদেরকে সহীহ পছন্দ্য হাদিয়া পেশ করা।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

## দশম অধ্যায়

### আশুরাঃ তাৎপর্য, ফযীলত, করণীয় ও বর্জনীয়

#### তাৎপর্য

আশুরা মুহাররম মাসের ১০ তারিখকে বলা হয়। ইসলাম ধর্মে এই দিবসটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এই দিনে ইসলামের অনেক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্য পূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে।

যেমনঃ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, (একদা) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের কতিপয় এমন লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যারা আশুরার দিনে রোযা রেখেছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন “এটা কিসের রোযা?” উত্তরে তারা বলল, “এই দিনে আল্লাহ তা‘আলা হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছিলেন। (অন্য বর্ণনায় আছে ফিরআউনের নির্যাতন থেকে মুক্ত করেছিলেন।) এবং ফিরআউনকে দল-বল সহ নিমজ্জিত করেছিলেন। আর এই দিনেই হযরত নূহ আ.- এর কিশতী জুদী পর্বতে স্থির হয়েছিল। ফলে এই দিনে হযরত নূহ আ. ও হযরত মূসা আ. কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রোযা রেখেছিলেন। তাই আমরাও এই দিনে রোযা রাখি।” তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “মূসা আ.-এর অনুসরণের ব্যাপারে এবং এই দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী হকূদার।” অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন (আশুরার দিন) রোযা রাখেন এবং সাহাবাদেরকেও রোযা রাখতে আদেশ করেন। (বুখারীঃ হাঃ নং ২০০৪, মুসলিমঃ হাঃ নং ১১৩০, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং-৩৬০)

#### ফযীলত

১. হযরত আবু কাতাদাহ রাযি.থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি আশাবাদী যে, আশুরার দিনের রোযার উসীলায় আল্লাহ তা‘আলা অতীতের এক বৎসরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।” (তিরমিযীঃ হাঃনং ৭৫১)

২. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “রমাযানের রোযার পর মুহাররম মাসের রোযা সর্বোত্তম।” (মুসলিমঃ হাঃ নং ১১৬৩)

## করণীয়

১. আশুরার দিনে রোযা রাখা। তবে এর সাথে ৯ তারিখ বা ১১ তারিখ মিলিয়ে রাখা। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমরা আশুরার দিনে রোযা রাখ। তবে এ ক্ষেত্রে ইয়াহুদীদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বন করতঃ তোমরা আশুরার পূর্বে অথবা পরের একদিন সহ রোযা রাখবে।” (মুসনাদে আহমাদ-হাঃ নং ২৪১)

২. এই দিন বেশী বেশী তাওবা-ইস্তিগফার করা। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুহাররম হলো আল্লাহ তা‘আলার (নিকট একটি মর্যাদাবান) মাস। এই মাসে এমন একটি দিন আছে, যাতে তিনি অতীতে একটি সম্প্রদায়কে ক্ষমা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অপরাপর সম্প্রদায়কে ক্ষমা করবেন। (তিরমিযীঃ নং ৭৪১)

৩. দীনের খাতিরে এই দিনে হযরত হুসাইন রাযি. যে ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন করেছেন তা থেকে সকল মুসলমানের দীনের জন্য যে কোন ধরনের ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করার শিক্ষা গ্রহণ করা।

## বর্জনীয়

১. তা‘যিয়া বানানো অর্থাৎ, হযরত হুসাইন রাযি. এর নকল কবর বানানো। এটা বস্তুত এক ধরনের ফাসেকী শিরকী কাজ। কারণ মূর্খ লোকেরা ‘হযরত হুসাইন রাযি. এতে সমাসীন হন’ এই বিশ্বাসে এর পাদদেশে নযর-নিয়ায পেশ করে, এর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, এর দিকে পিঠ প্রদর্শন করাকে বেয়াদবী মনে করে, তা‘যিয়ার দর্শনকে ‘যিয়ারত’ বলে আখ্যা দেয় এবং এতে নানা রকমের পতাকা ও ব্যানার টাঙ্গিয়ে মিছিল করে; যা সম্পূর্ণ নাজায়িয় ও হারাম। এছাড়াও আরো বহুবিধ কুপথা ও গর্হিত কাজের সমষ্টি হচ্ছে এ তা‘যিয়া। (ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৯৪, ৩৩৫, কিফায়াতুল মুফতীঃ ৯/৩২, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়াঃ ২/৩৪৩)

স্মর্তব্যঃ তা‘যিয়ার সামনে যে সমস্ত নযর-নিয়ায পেশ করা হয় তা গাইরুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয় বিধায় তা খাওয়া হারাম। (সূরয়ে মা ইদাহঃ ৩)

২. মর্সিয়া বা শোকগাঁথা পাঠ করা, এর জন্য মজলিস করা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা সবই নাজায়িয়। (ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৯৪, কিফায়াতুল মুফতীঃ ৯/৩২, ৪২)

৩. ‘হায় হুসেন’, ‘হায় আলী’ ইত্যাদি বলে বলে বিলাপ ও মাতম করা এবং ছুরি মেরে নিজের বুক ও পিঠ থেকে রক্ত বের করা। এগুলো করনেওয়ালা, দর্শক ও শ্রোতা উভয়ের প্রতি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। (আবু দাউদ, হাঃ নং ৩১২, ইবনে মাজাহঃ হাঃ নং ১৫৮৪)

৪. কারবালার শহীদগণ পিপাসার্ত অবস্থায় শাহাদতবরণ করেছেন তাই তাদের পিপাসা নিবারণের জন্য বা অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এই দিনে লোকদেরকে পানি ও শরবত পান করানো। (ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ৫/২৮৯, কিফায়াতুল মুফতীঃ ৯/৪০)

৫. হযরত হুসাইন রাযি. ও তাঁর স্বজনদের উদ্দেশ্যে ঈছালে সাওয়াবের জন্য বিশেষ করে এই দিনে খিচুড়ি পাকিয়ে তা আত্মীয়-স্বজন ও গরীব মিসকীনকে খাওয়ানো ও বিলানো। একে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ যেহেতু নানাবিধ কু-প্রথায জড়িয়ে পড়েছে তাই তাও নিষিদ্ধ ও না-জায়িয। (কিফায়াতুল মুফতীঃ ৯/৪০)

৬. হযরত হুসাইন রাযি.-এর নামে ছোট বাচ্চাদেরকে ভিক্ষুক বানিয়ে ভিক্ষা করানো। এটা করিয়ে মনে করা যে, ঐ বাচ্চা দীর্ঘায়ু হবে। এটাও মুহাররম বিষয়ক কু-প্রথা ও বিদ'আত। (ইসলাহুর রুসুম)

৭. তা'যিয়ার সাথে ঢাক-ঢোল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানো। (সূরায়ে লুকমানঃ ৬)

৮. আশুরার দিনে শোক পালন করা; চাই তা যে কোন সূরতেই হোক। কারণ শরীয়ত শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন আর বিধবা গর্ভবতীর জন্য সন্তান প্রসব পর্যন্ত এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সর্বোচ্চ ৩ দিন শোক পালনের অনুমতি দিয়েছে। এই সময়ের পর শোক পালন করা জায়িয নেই। আর উল্লেখিত শোক পালন এগুলোর কোনটার মধ্যে পড়ে না। (বুখারীঃ হাঃ নং ৫৩৩৪, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়াঃ ২/৩৪৪)

উল্লেখ্য যে শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত শোক পালনের অর্থ হলো শুধুমাত্র সাজ সজ্জা বর্জন করা। শোক পালনের নাম যাচ্ছেতাই করার অনুমতি শরী'আতে নেই। (দুররে মুখতারঃ ২/৫৩০)

৯. শোক প্রকাশ করার জন্য কালো ও সবুজ রঙের বিশেষ পোশাক পরিধান করা। (ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়াঃ ২/৩৪৪)

১০. এই দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করার জন্য মিথ্যা ও জা'ল হাদীস বর্ণনা করা। কারণ হাদীসে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীকে জাহান্নামে ঠিকানা বানিয়ে নিতে বলা হয়েছে। (বুখারীঃ হাঃ নং ১০৭)

এখানে আশুরার দিনের নিন্দিত ও গর্হিত কাজসমূহের কিছু নমুনা পেশ করা হলো মাত্র। মূলকথা, বক্ষ্যমাণ পর্চার 'করনীয়' শিরোনামের অধীনে উল্লেখিত ৩টি আমল ব্যতীত এই দিনে আর কোন বিশেষ আমলের কথা শরী'আতে প্রমাণিত নেই। তাই এই হলো ব্যতীত আশুরাকে কেন্দ্র করে বিশেষ যে কোন কাজই করা হবে তা বিদ'আত ও মনগড়া আমল হবে।



আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে শিরক, বিদ‘আত ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন।

## একাদশ অধ্যায়

### শরী‘আতের দৃষ্টিতে শবে মি‘রাজ

মি‘রাজ আরবী উরুজ শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ উর্ধ্বে গমন করা। আর মি‘রাজ শব্দের অর্থ উর্ধ্বে আরোহণের বাহন। মি‘রাজের ঘটনা কখন সংঘটিত হয়েছিলো এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে নির্ভর যোগ্য সূত্রে শুধু এতটুকুই পাওয়া যায় যে, মি‘রাজের ঘটনা হিজরতের এক বা দেড় বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মাস, দিন তারিখের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। যদিও সাধারণ জনগণের মাঝে প্রসিদ্ধ হলো রজব মাসের ২৭ তম তারিখে সংঘটিত হয়েছিল। (আল মাওয়াহিবুল লাডুন্নিয়াহ ও শরহুল মাওয়াহিবিল লাডুন্নিয়াহ খঃ৮ পৃঃ ১৮/১৯)

পরিভাষায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাত্রি ভ্রমণকে ইসরা ও তথা হতে সিদরাতুলমুনতাহা ও তদূর্ধ্ব পর্যন্ত ভ্রমণকে মি‘রাজ বলা হয়। ইসরা ও মি‘রাজের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ: পবিত্র ঐ মহান সত্ত্বা যিনি রাত্রি বেলায় তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার আশপাশকে আমি বরকতময় করেছি। এটা এজন্য যাতে আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাতে পারি। (সূরা বনী ইসরাইল আয়াত নং-১)

### হাদীসের আলোকে মি‘রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

একদা রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হানী রা. এর ঘরে শুয়েছিলেন। রাসূলের অর্ধনিদ্রা অবস্থায় হযরত জিবরীল আ. অন্যান্য ফেরেশতাসহ অবতরণ করেন এবং হযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মসজিদে হারামে নিয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হাতীমে কা’বায় ঘুমিয়ে পড়েন। হযরত জিবরীল ও মীকাদীল আ. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জাগিয়ে যমযমের পাশে নিয়ে সীনা মুবারক বিদীর্ণ করে অন্তরাত্মা বের করে যমযমের পানিতে ধুয়ে ইলম ও হিকমতে পরিপূর্ণ করে স্বর্ণের তশতরীতে রাখেন। অতঃপর পুনরায় বক্ষে স্থাপন করে দেন। এরপর বোরাক নামক বাহনে করে হযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে



মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যান। অতঃপর সেখান থেকে আসমানে নিয়ে যান। প্রথম আসমানের নিকট গিয়ে জিবরীল আ. দরজা খোলার আবেদন জানান। ফেরেশতাগণ অভিবাদন জানিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বরণ করে নেন। এভাবে সপ্তম আসমান অতিক্রম করেন। এসময়ে যথাক্রমে প্রথম আসমানে হযরত আদম আ., দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া এবং ঈসা আ. তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ আ. চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস আ. পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন আ. ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা আ. সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম আ. এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সকলেই হযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানান। সপ্তমাকাশ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফরফ নামক বাহনের মাধ্যমে সিদরাতুলমুনতাহা ও আরশে আযীমে গমন করেন। সেখানে অনেক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর জিনিস প্রত্যক্ষ করেন। জান্নাত জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখেন। পরিশেষে আল্লাহর দীদার ও কালাম লাভে ধন্য হন। এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের বিধান নিয়ে জমিনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে হযরত মূসা আ. এর পরামর্শক্রমে কয়েকবার আল্লাহর নিকট গিয়ে নামাযের সংখ্যা কমানোর আবেদন জানান। অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামায (যাতে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব পাওয়া যাবে।) এর বিধান নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৮৮৭, ফাতহুলবারী ৭/২৫০, ২৫৯, শরহে যুরকানী ৮/৪২, সীরাতে ইবনে হিশাম ২/১০, খাসায়েসুল কুবরা ১/১৫২)

**রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস‘রাজ স্বশরীরে হয়েছিল, স্বপ্ন যোগে নয়**

হযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিস‘রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে হয়েছিল। তবে এছাড়া অন্য সময় হযুরের স্বাপ্নিক মিস‘রাজও হয়েছে। যার বর্ণনা হাদীস শরীফে এসেছে। তথাপি কতিপয় লোক রাসূলের স্বশরীরের মিস‘রাজকে কিছু ভ্রান্ত যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। যা আদৌ ঠিক নয়। মূলত প্রসিদ্ধ মিস‘রাজ স্বশরীরে হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত ও অনেক সহীহ হাদীস সহ বিভিন্ন দলিল রয়েছে। তন্মধ্যে:

১. রূহানী মিস‘রাজ কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। বরং শারীরিক মিস‘রাজই আশ্চর্যের বিষয়। এ দিকে ইংগিত করে আল্লাহ তা‘আলা উক্ত ঘটনার বর্ণনার শুরু করেছেন ‘সুবহানা’ শব্দ দিয়ে। তাছাড়া উক্ত আয়াতে ‘বি আবদিহী’ (অর্থাৎ, নিজের বান্দাকে) শব্দ রয়েছে। যা মিস‘রাজ স্বশরীরে হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

২. মিস‘রাজ যদি স্বাপ্নিক হত তাহলে কেউ মুরতাদ হতো না। কারণ স্বপ্নের কোনো কিছুকে কেউ অস্বীকার করে না।

৩. স্বশরীরে মি‘রাজ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে। অতএব প্রসিদ্ধ মি‘রাজকে রুহানী বা স্বাপ্নিক বলে ব্যক্ত করার কোন অবকাশ নেই। (শরহে যুরকানী ৮/১৩৮)

### মি‘রাজের শিক্ষা ও নসীহতঃ

মি‘রাজের রাতে ছয়র সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতকে তিনটি জিনিস হাদিয়া দেওয়া হয়।

১. এই উম্মতের যে কোনো ব্যক্তি শিরকমুক্ত ঈমান নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে চিরকাল আযাব দিবেন না। বরং তাকে একদিন অবশ্যই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং চিরকালের জন্য আরামে রাখবেন।

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব দিবেন এবং নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

৩. সূরায় বাকারার শেষ আয়াতসমূহ, যার মধ্যে এই উম্মতের প্রতি আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত মাগফিরাত দয়া ও অনুগ্রহ এবং কাফেরদের মুকাবেলায় সাহায্য ও সফলতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাছাড়া এ আয়াতসমূহ রাতে ঘুমানোর পূর্বে পড়লে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের সওয়াব সহ সমস্ত বিপদ আপদ থেকে সে ব্যক্তি হিফায়তে থাকে।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী যে প্রাথমিক ভাবে এ তিনটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং সঠিক ও সুন্দরভাবে তা হাসিল করা। সাথে সাথে দীনের অন্যান্য বিষয় অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। বিশেষ করে দীনের যে পাঁচটি বিষয়ের ইলম অর্জনকে ফরযে আইন ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্যই হাসিল করা। (সূরা বাকারঃ ১৭৭, মুসলিম হাদীস নং ২৮৯)

### শবে মি‘রাজ সম্পর্কিত বর্জনীয় বিষয়সমূহঃ

মি‘রাজের ঘটনা কোন্ বছর কোন্ মাসের কোন্ তারিখে এবং কোন্ রাতে হয়েছিল তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে অনেক মতভেদ রয়েছে এবং এ রাতটি পৃথিবীর ইতিহাসে একবারই এসেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো মি‘রাজ সংঘটিত হবে না। সুতরাং কোন একটা তারিখ চূড়ান্ত মনে করা ও অন্যান্যগুলিকে ভুল বলা যাবে না। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলা যায় না যে কোন তারিখের কোন্ রাতে মি‘রাজের ঘটনা ঘটেছিল। শবে

মি‘রাজের ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে কোন ফযীলত কুরআন হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। সুতরাং সম্ভাব্য এই দিনে রোযা রাখা শবে কদরের মত এই রাতকে ফযীলতপূর্ণ মনে করা, রাতে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হওয়া, দিনে রোযা রাখা, সরকারীভাবে শবে মি‘রাজ পালনের উদ্যোগ নেওয়া, এই রাত্রকে উদ্দেশ্য করে মসজিদে ভীড় জমানো, মসজিদে আলোকসজ্জা করা, রাত্র জাগরণ করা, বাড়ী বাড়ী মীলাদ পড়া, প্রচার মাধ্যমে এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা, পত্রপত্রিকায় বিশেষ নিবন্ধন প্রকাশ করা, শবে মি‘রাজ উপলক্ষে হালুয়া রুটির আয়োজন করা ইত্যাদি কোনটাই সহীহ নয়। শবে মি‘রাজ যদি শবে বরাত বা শবে কদরের মত ফযীলতপূর্ণ কোন ইবাদতের রাত হত। তাহলে তার দিন তারিখ সংরক্ষিত থাকতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হতো। সাহাবায়ে কেরাম রা. এর কোন না কোন আমল পাওয়া যেতো। অথচ এ বিষয়ে কুরআন হাদীসে কোন আমলের কথা বর্ণিত নেই। অতএব বৎসরের অন্যান্য দিনের মত স্বাভাবিক ইবাদত বন্দেগী করাই আমাদের এ দিনের কর্তব্য। (সূরায় মায়েদা- আয়াত ৩, বুখারী-হাদীস ২৬৯৭, মুসলিম-হাদীস ৫৯৬)

রজব মাস শুরু হলেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু‘আ খুব বেশী করে পড়তেনঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

(আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফী রজাবা ওয়া শা‘বান ওয়া বল্লিগনা রমযান)

অর্থ: “হে আল্লাহ পাক আপনি আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং রমযান শরীফ পর্যন্ত পৌঁছে দেন।”

أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ الْحَدِيثِ - ৩৯৩৯

## দ্বাদশ অধ্যায়

### শরী‘আতের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারা‘আত

লাইলাতুল বারা‘আতের ফযীলত নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোন রূপ না দিয়ে এবং এ রাত উদযাপনের বিশেষ কোন পন্থা উদ্ভাবন না করে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বেশী বেশী ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। এখানে লাইলাতুল বারা‘আতের ফযীলত ও করণীয় বিষয়ের কিছু হাদীস যথাযথ উদ্ধৃতি ও সনদের নির্ভরযোগ্যতা সহ উল্লেখ করা হলো।

#### প্রথম হাদীস

হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি. বলেন. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ তা‘আলা ১৫ই শা‘বানের রাতে সৃষ্টির দিকে

রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বৈষ পোষণকারী ব্যতীত আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান-৫৬৬৫, সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ-৩/৩১৫)

### দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আ'লা ইবনুল হারেস থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সিজদা করেন যে, আমার ধারণা হলো তিনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তখন উঠে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী নাড়া দিলাম, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী নড়ল। যখন তিনি সিজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন, তখন আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা/হুমাইরা! তোমার কি এ আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না; ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দীর্ঘ সিজদা থেকে আমার আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা? নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন. তুমি কি জানো এটা কোন রাত? আমি বললাম. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল তখন ইরশাদ করলেন, এটা অর্ধ শা'বানের রাত। আল্লাহ তা'আলা এ রাতে বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন এবং ক্ষমাপ্রার্থীদের ক্ষমা করেন ও অনুগ্রহপ্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন। আর বিদ্বৈষপোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই। (শু'আবুল ইমান-হাদীস নং- ৩৬৩৫)

### তৃতীয় হাদীস

একদা হযরত আয়েশা রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না পেয়ে খুঁজতে বের হলেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে পেলেন- তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ১৪ই শা'বান দিবাগত রাতে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং 'বনু কালব' গোত্রের পালিত ছাগল পালের শরীরের পশমের চেয়েও অধিক সংখ্যক বান্দাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী শরীফ-হাঃ নং ৭৩৯, ইবনে মাযাহ- হাঃ নং ১৩৮৫)

### চতুর্থ হাদীস

হযরত আলী ইবনে আবী তালেব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন অর্ধ শা'বানের রাত যখন আসে তখন তোমরা এ রাত্রি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা এ রাতের সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে আসেন এবং বলেন, কোন ক্ষমা প্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দিব। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাকে ডাকতে থাকেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ-১৩৮৪, শু'আবুল ইমান-৩৮২৩-২২)

মাত্র কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হলো। আরো বহু হাদীস কিতাবে বর্ণিত আছে।

## উল্লেখিত হাদীস সমূহের সনদ বিষয়ক আলোচনাঃ

১ম হাদীসের সনদ সহীহ, এ জন্য ইমাম ইবনে হিব্বান একে কিতাবুস সহীহ-এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুনিযীরী, ইবনে রজব, কাস্তাল্লানী, যুরকাবী, নুরুদ্দীন হাইসামী এবং অন্যান্য হাদীস বিশারদ এ হাদীসটিকে আমলযোগ্য সহীহ বলেছেন। (দেখুন! তারগীব তারহীব ২/১১৮, ৩/৪৫৯ লাত্বাইফুল মা'আরিফ ১৫১-৩, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ৮/৬৫, শারহুল সাওয়াহিব-১০/৫৬১)

বর্তমানে আহলে হাদীস ভাইদের প্রসিদ্ধ শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী রহ. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ৩/১৩৫-১৩৯-এ এই হাদীসের সমর্থনে আরো আটটি হাদীস উল্লেখ করার পর লেখেন, 'এ সব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ প্রমাণিত হয়।' এরপর শাইখ আলবানী রহ. ঐ সব লোকের বক্তব্য খণ্ডন করেন, যারা কোনধরনের খোঁজ-খবর ছাড়াই বলে দেন যে লাইলাতুল বরা'আতের ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। তদ্রূপ শাইখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াজী -২/৫৩-এ লাইলাতুল বরা'আতের হাদীসকে আমলযোগ্য প্রমাণিত করেন।

২য় হাদীসটি ইমাম বাইহাকী রহ. বর্ণনা করার পর সনদের ব্যাপারে বলেছেন, 'মুরসালুন জায়্যিডুন' অর্থাৎ, আমলযোগ্য। ৩য় হাদীসটি আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। সকল রাবী সিক্কাত, সনদের মধ্যে ইনকিতা থাকায় ইমাম বুখারী রহ. যয়ীফ বলেছেন। (দেখুন! সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ-৩/৩১৮)

৪র্থ হাদীসটির সনদ যয়ীফ কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো- ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। দেখুন! (কিতাবুল আযকার-৭, ফাতহুল কাদীর-১/৪৬৭, আল আজবিবাতুল ফাযেলাহ-৫৭)

## ফুকুহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বরা'আত

### ফিকুহে হানাফী

আল্লামা শামী, ইবনে নুজাইম, আল্লামা শরমবুলালী, শাইখ আব্দুল হক দেহলভী, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা আব্দুল হাই লাফ্ফনৌভী, মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ. সহ প্রমুখ উলামায়ে কেরামের মতে লাইলাতুল বরা'আতে শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী জাগ্রত থেকে একাকীভাবে ইবাদত করা মুস্তাহাব, তবে জমায়েত হয়ে নয়। (আদ দুররুল মুখতার-২/২৪-২৫, আল বাহরুর রায়িক-২/৫২, মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ-৩৬, মারাক্কিল ফালাহ-২১৯, জাওয়ালুস সিনাহ-১৭, লাইলাতুল বরা'আতের হাকীকত- শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী)

### ফিকুহে শাফেয়ী

ইমাম শাফী রহ.-এর মতেও শা'বানের ১৫তম রাতে অধিক অধিক দু'আ কবুল হয়ে থাকে। (কিতাবুল উম্ম-১/২৩১)

### ফিকুহে হাম্বলী

শাইখ ইবনে মুফলিহ হাম্বলী, আল্লামা মানসূর আল বাহুতী এবং ইবনে রজব হাম্বলী রহ. সহ প্রমুখ উলামায়ে কিরামের নিকট লাইলাতুল বারা'আতে ইবাদাত করা মুস্তাহাব। (দেখুন! আল মাবদা-২/২৭, কাশশাফুল কিনা-১/৪৪৫, লাতায়িফুল মা'আরিফ-১৫১-৬০)

### ফিকুহে মালিকী

ইবনুল হাজ্জু মালিকী রহ. বলেন সলফে সালিহীন তথা পূর্বযুগের আউলিয়াগণ এ রাতকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং এর জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। (আল মাদখাল-১/২৯২-৯৩)

**সারকথাঃ** সকল মাযহাবের উলামায়ে কিরামের মতে লাইলাতুল বারা'আতে ইবাদাত করা মুস্তাহাব।

### আহলুল হাদীস ভাইদের প্রতি আবেদন

লাইলাতুল বারা'আত সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে আপনারা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর ইকুতিয়াউস সিরাতুল মুস্তাক্বীম-২/৬৩১-৬৪৩, আলবানী রহ. এর সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ-৩/১৩৫-১৩৯, ইমাম মুবারকপুরীর তুহফাতুল আহওয়াজী-২/৫৩ এবং ইবনে রজব হাম্বলীর লাতায়িফুল মা'আরিফ ১৫১-১৬০ ইত্যাদি প্রমুখ উলামাদের কিতাব দেখুন।

### করণীয় ও বর্জনীয়

**এ রাতে করণীয়ঃ** বেশী বেশী নফল ইবাদত, যেমন- কুরআন তিলাওয়াত, যে কোন সূরা দিয়ে নফল নামায, যিকির আযকার, দু'আ ইস্তিগফার। উক্ত ইবাদাতসমূহ সমবেত ভাবে নয় বরং একাকী করতে হবে। উল্লেখ্য উক্ত রাতে কোন ধরা বান্ধা নিয়মে নফল নামায পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। উল্লেখ্য লাইলাতুল বারা'আতের পরদিন রোযা রাখা নফল ইবাদত, কেউ শা'বানের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখতে পারলে উত্তম।

**বর্জনীয়ঃ** আতশবাজী, হালুয়া রুটি, শিরণী-তাবারক্ক, মাইকে কুরআন তিলাওয়াত ও শবীনা, আলোকসজ্জা করা, মসজিদে বা বাড়ীতে জমায়েত হয়ে বড় আওয়াজে প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম করা, গোরস্থানে যাওয়া, মেলা বসানো, জামা'আতের সাথে সালাতুত তাসবীহ বা তাহাজ্জুদের নামায পড়া ইত্যাদি। (বিস্তারিত দেখুন! লাইলাতুল বারা'আতের হাক্কীকৃত মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী।)

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### শরী‘আতের দৃষ্টিতে শবে ক্বদর

শবে ক্বদর এমন একটি মহা পূণ্যময় রজনী যা আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ অনুগ্রহে একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীকে প্রদান করেছেন। অন্য কোন উম্মত উক্ত পবিত্র রজনী পায়নি।

#### শবে ক্বদরের ফযীলত

১.উক্ত রজনীর অধিক গুরুত্ব, মর্যাদা ও ফযীলত বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে কারীমে স্বতন্ত্র একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। যার নাম সূরাতুল ক্বদর।

২.শবে ক্বদরে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে কারীম লাউহে মাহফূয থেকে প্রথম আকাশ অবতীর্ণ করেন।(সূরাতুল ক্বদর: ১)

৩.শবে ক্বদরের এক রাত্রির ইবাদাত তিরিশি বছর চার মাসের ইবাদতের চেয়েও অধিক উত্তম। (সূরাতুল ক্বদর:৩)

৪.হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল ক্বদর ইবাদতের মাধ্যমে কাটাতে আল্লাহ তা‘আলা তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ কবে দিবেন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯০১, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৭৫)

৫.এই রাতে আল্লাহ তা‘আলার অনুমতিক্রমে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের একটি জামা‘আত নিয়ে পৃথিবীতে গুভাগমন করেন এবং আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতগুয়ার বান্দাদেরকে সালাম ও রহমতের দু‘আ করতে থাকেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর:৮/৪১৪)

#### ক্বদরের রাত কোনটি

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, আমি কুরআনে কারীমকে ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরাতুল ক্বদর: ১)

অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ রমায়ান মাসে কুরআনে কারীমকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (বাকারা:১৮৫)

উক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, শবে ক্বদর রমায়ান মাসেই সংঘটিত হয়।



আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলোতে লাইলাতুল কুদর তালাশ কর। (বুখারী শরীফ: হাঃ নং ২০১৭, মুসলিম শরীফ হাঃ নং ১১৬৯)

যির ইবনে হুবাইশ রহ. বর্ণনা করেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা‘আব রা. কে লাইলাতুল কুদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম আপনার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলে থাকেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ এক বৎসর জাগ্রত থাকবে সে লাইলাতুল কুদর পাবেই। উত্তরে হযরত উবাই ইবনে কা‘আব রা. বলেনঃ আল্লাহ তার উপর রহম করণ তিনি ইচ্ছা করেছেন লোকেরা যেন এক রাতের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। নিশ্চয় তিনি জানেন তা রমাযানে এবং তাও জানেন যে তা রমাযানের শেষ দশকে এবং ২৭ তারিখে। অতঃপর হযরত উবাই ইবনে কা‘আব রা. শপথ করে বললেনঃ অবশ্যই তা ২৭ তারিখের রজনীতেই হয়ে থাকে। যির ইবনে হুবাইশ বলেনঃ আমি বললামঃ হে আবুল মুনযির! (উবাই ইবনে কা‘আব এর উপ নাম) এটা কিসের ভিত্তিতে বলছেন? তদুত্তরে তিনি বললেনঃ আলামত বা নিদর্শনের ভিত্তিতে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন; সে দিন সূর্যের কিরণ থাকে না। (মুসলিম শরীফ হাঃ নং ৭৬২)

### **শবে কুদর হাসিল করার উপায়**

ক. রমাযানের শেষের দশকে ই‘তিকাফ করা অর্থাৎ, ২০শে রমাযান সূর্য ডোবার পূর্ব হতে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা। পেশাব পায়খানা বা ফরয গোসলের প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের না হওয়া।

খ.এটা সম্ভব না হলে অন্তত শেষ দশকের শুধু রাত গুলোতে মসজিদে নফল ই‘তিকাফ করা। দিনে দুনিয়াবী জরুরত পূর্ণ করা।

গ.এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে শেষ দশকের ইশা ও ফজরের নামায গুরুত্ব সহকারে জামা‘আতের সাথে আদায় করা। এবং বেজোড় রাতগুলোতে নফল নামায, তিলাওয়াত ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে বেশী করা।

### **শবে কুদরে করণীয় কাজসমূহ**

১.এ পূণ্যময় রজনীতে অবহেলা না করে গুরুত্ব ও ইখলাসের সাথে ইবাদত বন্দেগীতে লেগে থাকা চাই। চাই নফল নামায বা তিলাওয়াত যিকির আযকারে হোক কিংবা দু‘আয় মশগুল থাকার মাধ্যমে হোক।

২.নিজের জীবনের পাপরাশির কথা স্মরণ করে আল্লাহ তা‘আলার নিকট কাকুতি মিনতি ও রোনাজারীর সাথে তাওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া। (সূরা নূহ: ১০)



৩.ইখলাসের সাথে সাওয়াবের আশায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে নেক আমলে লিপ্ত থাকা। (বুখারী: হাঃ নং ১৯০১, মুসনাদ আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৫)

৪.এ রাত্রিতে বেশী বেশী নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে থাকা-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (আমালুল যাউমি ওয়াললাইলাহ: হাঃ নং ৭৬৭  
ইবনে মাজাহ: নং ৩৮৫০)

৫. উক্ত রাত্রির কিছু অংশ কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকা। কিছু অংশে নফল নামায বিশেষ করে সালাতুত তাসবীহ আদায় করা। আর কিছু অংশে যিকির আযকার দু'আ মুনাযাত করা। (সূরা আনকাবূত:৪৫)

### শবে কুদরে বর্জনীয় কাজসমূহ

১.মসজিদে নিঃপ্রয়োজনে মোমবাতি জ্বালানো ও আলোক-সজ্জা করা। কারণ এটা অপব্যয়। আর অপব্যয় করা নাজাযিয়া। (সূরায়ে আ'রাফ: ৩১, বনী ইসরাঈল:২৭)

২.জামা'আতের সাথে সালাতুল তাসবীহ, তাহাজ্জুদ কিংবা অন্য কোন নফল নামায পড়া। কারণ নফল নামায জামা'আতের সাথে নাজাযিয়া। (রদ্দুল মুহতার: ১/৫৫২)

৩.ঘোষণা করে মসজিদে সম্মিলিত দু'আর আয়োজন করা। হ্যাঁ ! ঘোষণা বা ডাকাডাকি ছাড়া এমনিতে যারা উপস্থিত ছিল তারা দু'আ করে নিলে তা জাযিয়া।

৪.এই রাতে মসজিদে প্রচলিত মীলাদ-ক্বিয়াম করা। কারণ ইহা সুম্পষ্ট বিদ'আত। (মুসনাদে আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৯)

৫. এত অধিক রাত্র পর্যন্ত জাগ্রত থাকা, যাতে ঘুমের তাড়নায় ফজরের জামা'আত ছুটে যায় কিংবা কাযা-ই হয়ে যায় বা এমন হয়ে যায় যে নামাযে কি সূরা কালাম পড়ছে তা নিজেরও খবর নেই। (মুআত্তা ইমাম মালেক: হাঃ নং ১৫৫, আল ইসাবা: ৩/২০০)

বি:দ্র: মসজিদে ইমাম ও খতীবগণের কর্তব্য ঐদিন লম্বা সময় ওয়াজ ও বয়ানে না কাটানো। বরং তার আগে জুমু'আয় বা কোন একদিন শবে কুদরের আহকাম বলে দেয়া। একান্ত ঐ দিনই কথা বলার প্রয়োজন হলে সংক্ষেপে এই রাত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কিছু কথা বলে মুসল্লীদেরকে উৎসাহ দিয়ে ইবাদতের প্রতি নিবিষ্ট করার চেষ্টা করবে। তবে সর্বাবস্থায় জ্বাল হাদীস ও ভিত্তিহীন ঘটনাবলী বর্ণনা থেকে বিরত থাকা চাই। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম: হাঃ নং ৭)

পটকাবাজী, আতশবাজী ইত্যাদি কুসংস্কার থেকে বিরত থাকা। বিশেষ করে অভিভাবকদের কর্তব্য হলো ছোটদেরকে উক্ত ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া এবং তাদের হাতে টাকা পয়সা না দেয়া। কারণ এই অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে নিজেকে যেমন উক্ত রাতে অনেক ফযীলতপূর্ণ ইবাদত থেকে বঞ্চিত রাখা হয়, ঠিক তেমনই উক্ত জিনিসগুলোর বিকট ও ভয়ংকর শব্দের দরুন আল্লাহর বান্দাদেরকে আতংকের মধ্যে ফেলে কষ্ট দেয়া হয়। তাই উক্ত শরীয়ত পরিপন্থী জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়া কবীরা গুনাহ ও হারাম। (সূরা বাকারা: ১১৪, বনী ইসরাঈল: ২৭)

এই রাত্রিকে উপলক্ষ করে অধিক ও উত্তম খানা ও তাবারকের আয়োজন থেকে বিরত থাকা। মসজিদে শিরনী, মিষ্টি ইত্যাদির আয়োজন থেকে বেঁচে থাকা।

## চতুর্দশ অধ্যায়

### তোহফাতুল হুজ্জাহ

#### উমরা পালন করার নিয়ম

**ইহরাম বাঁধা (ফরয):** উমরা পালনকারী মীকাতে পৌঁছে অথবা তার পূর্ব হতে গোসল বা উযু করে (পুরুষগণ ইহরামের কাপড় পরে) ২ রাকা‘আত নামায পড়ে মাথা হতে টুপি ইত্যাদি সরিয়ে কেবলামুখী হয়ে উমরার নিয়ত করবে। নিয়ত শেষে অন্ততঃ ৩ বার (পুরুষগণ সশব্দে) ৪ শ্বাসে তালবিয়াহ পাঠ করবে। তালবিয়া এই

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ -  
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ -  
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ  
لَا شَرِيكَ لَكَ

নিয়ত ও তালবিয়ার দ্বারা ইহরাম বাঁধা হয়ে গেল। এখন বেশী বেশী এ তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকবে।

**তাওয়াফ করা (ফরয):** অতঃপর মসজিদুল হারামে প্রবেশের সুন্নাহের প্রতি লক্ষ রেখে তাওয়াফের স্থানে প্রবেশ করবে। এরপর তাওয়াফের স্থানে পৌঁছেই তালবিয়াহ বন্ধ করে দিবে। হাজরে আসওয়াদের দাগের বাঁয়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে উমরার তাওয়াফের নিয়ত করবে। তারপর দাগের উপর এসে হাজরে

আসওয়াদকে সামনে করে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত তুলবে এবং তাকবীর বলবে। অতঃপর হাত ছেড়ে দিবে। এরপর ইশারার মাধ্যমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। অতঃপর পূর্ণ তাওয়াফে ইযতিবা ও প্রথম ৩ চক্রে রমল সহকারে উমরার ৭ চক্কর সম্পন্ন করবে। প্রত্যেক চক্কর শেষে হাজরে আসওয়াদকে ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করবে। তাওয়াফ শেষে সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে মূলতায়ামে হাযিরী দিয়ে দু‘আ করবে, তারপর মাতাফের কিনারায় গিয়ে মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে বা যেখানে সহজ হয় ওয়াজিবুত তাওয়াফ দু‘রাকা‘আত নামায আদায় করবে। এরপর যমযমের পানি পান করবে।

**সায়ী করা (ওয়াজিব):** এরপর সাফা মারওয়া এর সায়ী করার উদ্দেশ্যে হাজরে আসওয়াদকে ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করে বাবুস সাফা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে কিছুটা উপরে চড়বে এবং বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে দু‘আ করে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলবে। মারওয়াতে পৌঁছলে একবার সোত হয়ে গেল। এভাবে সাত সোত অর্থাৎ, ৭ বারে সায়ী সম্পন্ন করবে। মারওয়াতে কিছুটা উপরে চড়ে বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে দু‘আ করে সাফার দিকে চলবে। প্রত্যেক বার সাফা মারওয়াতে বাইতুল্লাহ মুখী হয়ে দু‘আ করবে এবং প্রতিবার (পুরুষগণ) সবুজ বাতিদয়ের মাঝে দ্রুত চলবে। সায়ির পর ২ রাকা‘আত নফল নামায পড়বে। এবার সায়ী সম্পূর্ণ হল।

**হালাল হওয়া (ওয়াজিব):** এরপর মাথা মুন্ডিয়ে বা চুল ছোট করে হালাল হতে হবে। এখন আপনার উমরার কাজ সম্পূর্ণ হল।

**হজ্জে ইফরাদ পালনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**

**ইহরাম বাঁধা (ফরয):** হজ্জে ইফরাদ পালনকারী হজ্জের মাস সমূহে মীকাতে পৌঁছে বা তার পূর্ব হতে (বাংলাদেশী হাজীদের জন্য বাড়ী বা ঢাকা থেকে) হাজামাত (ক্ষৌরকার্য) ইত্যাদি সমাপ্ত করে গোসল করে বা কমপক্ষে উযু করে ইহরামের কাপড় পরিধান করে টুপি পরে দু‘রাকা‘আত ইহরামের নামায আদায় করবে। নামায শেষে টুপি খুলে হজ্জের নিয়ত করবে। নিয়ত শেষে অন্তত তিন বার আওয়াজ করে তালবিয়াহ পাঠ করবে। হজ্জের ইহরাম বাঁধা হল। এখন বেশী বেশী তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে। তালবিয়াহ এই

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ -  
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ -  
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ -  
لَا شَرِيكَ لَكَ

**তাওয়াফ করাঃ** অতঃপর মক্কা মুকররমায় পৌঁছে মসজিদে প্রবেশের সুন্নত অনুযায়ী মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফের স্থানে গিয়ে প্রথমে তাওয়াফে কুদূম সম্পূর্ণ করবে। তাওয়াফের সংক্ষিপ্ত নিয়ম উমরার বয়ান থেকে দেখে নিন। ৭ চক্রে তাওয়াফ সম্পন্ন করে মাতাফের নিকটি গিয়ে মাকামে ইবরাহীমকে সামনে করে বা অন্য স্থানে ২ রাকা' আত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায এমনভাবে পড়বে, যেন তাওয়াফকারীদের সমস্যা না হয়। তারপর যমযমের পানি পান করবে, হজ্জের সায়ী এ তাওয়াফের পরই করার ইচ্ছা করলে উক্ত তাওয়াফে ইযতিবা ও ১ম তিন চক্রে রমল করতে হবে। উল্লেখ্য, ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে কুদূমের পর মক্কায় অবস্থান কালে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে সাধ্যমত বিরত থেকে বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করার চেষ্টা করবে। উল্লেখ্য সব ধরনের তাওয়াফের পর দু'রাকা' আত নামায পড়া ওয়াজিব। তাওয়াফকালে তালবিয়াহ উচ্চস্বরে পাঠ করবে না এবং হাজরে আসওয়াদ সামনে করা ছাড়া বাইতুল্লাহ এর দিকে সীনা ও দৃষ্টি করা যাবে না।

**৮ই যিলহজ্জ করণীয়ঃ** ৮ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়া সুন্নাত। ঐ দিন মিনায় গিয়ে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং রাত্রি যাপন করে পর দিন ফজরের নামায সেখানে আদায় করা সুন্নাত। মুআল্লিমগণ সাধারণতঃ ৭ই জিলহজ্জ রাত্রই হাজীদেরকে মিনার তাবুতে পৌঁছে দেয়। নতুন লোকদের জন্য পেরেশানী থেকে বাঁচার জন্য অগ্রিম যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। ৮ তারিখ যোহরের পূর্বেই মিনায় পৌঁছতে হবে। সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত জরুরী সামান-বিছানা এবং পরিধেয় কাপড় নিতে হবে এবং কয়েক দিনের খাবারের জন্য মুয়াল্লিমের নিকট টাকা জমা দেয়াটাই সহজ উপায়। আর মিনাতেও খানা-পিনা কিনে খাবার ব্যবস্থা আছে।

**৯ই যিলহজ্জ করণীয়ঃ**

**উকুফে আরাফা (ফরয)ঃ** ঐদিন ফজরের নামায যথা সময়ে আদায় করে (পুরুষগণ আওয়াজ করে, এবং মহিলাগণ নীরবে ১ বার) তাকবীরে তাশরীক পড়ে নিবে। নাস্তা ইত্যাদির জরুরত শেষে সূর্য উঠার পর তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হতে হবে। আরাফায় পৌঁছে মুয়াল্লিমের তাবুতে উকুফ করতে হবে, তাবুতে না থাকলে আরাফায় নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে অবস্থান করবে।

**সংক্ষেপে উকুফের পদ্ধতিঃ** এই ময়দানে পৌঁছে সেখানে আউয়াল ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ে দাঁড়িয়ে, আর কষ্ট হলে বসে দু'আ-কালাম-তাসবীহ-তাহলীল পড়তে থাকবে। তারপর হানাফী মাযহাব মতে আসরের সময় হলে

আসর নামায পড়ে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে দু‘আ ও যিকিরে মশগুল থাকবে। অন্য আযান শুনে কোন অবস্থায় আসরের ওয়াক্তের পূর্বে আসর পড়বে না। আরাফার ময়দানে এই অবস্থানকে ‘উকূফে আরাফা’ বলা হয়। সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পরে এখানে বা রাস্তায় মাগরিব না পড়ে তালবিয়াহ পড়তে পড়তে মুআল্লিমের গাড়ীতে করে মুযদালিফায় রওয়ানা হবে যাবে।

**মুযদালিফায় রাতে অবস্থান করা (ওয়াজিব):** মুযদালিফা ময়দানে পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর এক আযান ও এক ইকামতে প্রথমে মাগরিব ও পরে ইশার ফরয নামায আদায় করতে হবে। তারপর সুন্নাত, নফল ও বিতির পড়বে। অতঃপর মুযদালিফার খোলা ময়দানে রাতে অবস্থান করতে হবে। আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করে তাসবিহ-তাহলীল যিকির ও দু‘আয় মশগুল থাকবে। এ সময় অবস্থান করাকে “উকূফে মুযদালিফা” বলে। এখান থেকে ৪৯ টি পাথরকণা সঙ্গে নিবে। সূর্য উঠার কিছুক্ষণ পূর্বেই তালবিয়া পড়তে পড়তে মিনার উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে রওয়ানা হয়ে যাবে।

**১০ই যিলহজ্জে করণীয়ঃ** রমী করা জামরায়ে উকবা তথা বড় শয়তানকে কংকর মারা (ওয়াজিব): মিনায় পৌঁছে জরুরত সেরে এই দিন শুধুমাত্র জামরায়ে উকবায় তথা বড় শয়তানের স্থানে রমী করার জন্য ভীড় করার অপেক্ষা করবে। কারণ এখানে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আজকাল সাধারণত আসরের নামাযের পূর্বে ভীড় কমে না। এ জন্য আউয়াল ওয়াক্তে আসর পড়ে বা প্রয়োজনে আরো পরে বড় শয়তানের বেষ্টনীর মধ্যে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে। এটাকেই রমী করা বলা হয়। উল্লেখ্য, ১০ই যিলহজ্জে বড় শয়তানের নিকট পৌঁছে প্রথম কংকর নিক্ষেপের পূর্বক্ষণেই তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে।

**কুরবানী করা (মুস্তাহাব):** রমী শেষে সময় থাকলে এদিন অন্যথায় পরের দিন পশু বাজারে গিয়ে বা আমানতদার কাউকে পাঠিয়ে কুরবানী করবে। হজ্জু ইফরাদ পালনকারীর জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। সুতরাং তাওফীক থাকলে কুরবানী করতে চেষ্টা করবে।

**হালাল হওয়া (ওয়াজিব):** বড় শয়তানকে কংকর মারার পরে এবং কুরবানী করলে কুরবানী শেষে মাথা মুন্ডাতে বা চুল ছাটতে হবে এবং এর মাধ্যমেই মুহরিম হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হয়ে গেল। হালাল হওয়ার সময় চেহারার নূর দাঁড়ি কোনক্রমেই মুন্ডাবেন না। যাদের এখনো দাঁড়ি রাখার সৌভাগ্য হয়নি তারা পূর্বেই এব্যাপারে পাক্ষা নিয়ত করে নিবেন। যাতে করে দাঁড়ি নিয়ে রওজা শরীফ যিয়ারত করতে পারেন।

**তাওয়াফে যিয়ারত (ফরয) ও সায়ী করা (ওয়াজিব):** হালাল হওয়া তথা ইহরাম মুক্ত হওয়ার পর স্বাভাবিক পোষাকে বাইতুল্লাহ গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা ও সাফা-মারওয়াতে সায়ী করা। ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জে সূর্য ডোবার পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পূর্ণ করতে হবে। তাওয়াফে কুদূমের পরে হজ্জের সায়ী না করে থাকলে এই তাওয়াফের পরে সাফা-মারওয়াতে সায়ী করতে হবে। সায়ী করার তরীকা উমরা এর বর্ণনায় দেখে নিন। সায়ীর পরে দু'রাকা'আত নামায পড়বে। এরপর মিনা ফিরে আসবে।

### ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জের করণীয়:

**তিন জামরায় কংকর মারা ওয়াজিবঃ** ১১ ও ১২ যিলহজ্জে ভীড় থেকে বাঁচার জন্য বাদ আসর প্রথমে ছোট, পরে মাঝারী সবশেষে বড় জামরার বেষ্টনীর মধ্যে ৭টি করে কংকর মারবে। এ কয়দিন মিনায় রাত যাপন করা সুন্নাহ। উল্লেখ্য, ১২ই যিলহজ্জে ৩ জামরায় কংকর মেরে কেউ মক্কা চলে গেলে কোন অসুবিধা নাই। তবে বিশেষ কোন জরুরত না থাকলে ১৩ই যিলহজ্জে বিকাল ৩টার দিকে পর্যায়ক্রমে তিন জামরায় কংকর মেরে মক্কা যাওয়া উত্তম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ যিলহজ্জে কংকর মেরে মক্কা গিয়েছিলেন। ১৩ যিলহজ্জে আসর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীক পড়তে হবে।

**তাওয়াফে বিদা (ওয়াজিব):** যখন মক্কা শরীফ থেকে চলে আসার সময় হয় তখন শান্তভাবে কয়েক ঘণ্টা পূর্বে স্বাভাবিক পোষাকে বাইতুল্লাহ শরীফে এসে ৭ চক্রর তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। তারপর ওয়াজিবুত তাওয়াফ দু'রাকা'আত নামায পড়ে যমযমের পানি পান করে আবারও বাইতুল্লাহ যিয়ারতের তাওয়াফ লাভের জন্য মনে প্রাণে দু'আ করা অবস্থায় চলে আসবে। ইহাকে তাওয়াফে বিদা বলা হয়। এ তাওয়াফের মধ্যে ইযতিবা ও রমল নেই এবং পরে কোন সায়ী নেই উল্লেখ্য প্রতিবার মসজিদে হারামে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সুন্নাহের প্রতি খেয়াল রাখবে।

### হজ্জে তামাত্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

যারা তামাত্তুর হজ্জ করতে চায় তারা প্রথমে উমরার বর্ণিত নিয়মে উমরা পালন করে মাথা মুন্ডিয়ে হালাল হয়ে যাবে। (এরপর যে কয়দিন মক্কা শরীফে থাকবে, বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করবে। বেশী বেশী নফল উমরা করা থেকে নফল তাওয়াফ করাই উত্তম।) তারপর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ ইফরাদের বর্ণিত নিয়মে হজ্জ সম্পূর্ণ করবেন।

### হজ্জে কিরানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আর যারা হজ্জ কিরান করতে চান তারা মীকাত থেকে বা তার পূর্ব হতে একত্রে উমরা ও হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বাঁধবেন। তারপর তারা উমরা শেষে

ইহরাম অবস্থায় থাকবেন। তারা উমরাহ করে হালাল হতে পারবেন না। হজ্জে সকল কাজ সম্পন্ন করে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে মাথা মুন্ডিয়ে হজ্জ থেকে হালাল হওয়ার সময় হজ্জ ও উমরার উভয় ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, কিরান ও তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব এবং তাদের জন্য মাথা মুন্ডানোর পূর্বেই কুরবানী করা ওয়াজিব। আর ব্যাংকের ওয়াদাকৃত সময় সাধারণত ঠিক থাকে না সে জন্য হালাল হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ জন্য তামাত্তু ও কিরানকারীরা কোনো অবস্থায় ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করবে না।

### মহিলাদের হজ্জের পার্থক্য

মহিলাগণ স্বাভাবিক পোষাকেই ইহরাম বাধবে এবং মাথা ঢেকে নিবে চেহারা খোলা রাখবে না বরং চেহারার পর্দা করবে এবং এমনভাবে নেকাব লাগাবে যেন চেহারার সাথে কাপড় লেগে না থাকে। তালবিয়াহ নিম্ন আওয়াজে পড়বে। তাওয়াফের মধ্যে ইযতিবা ও রমল করবে না। সারীতে সবুজ বাতিদয়ের মাঝে স্বাভাবিক চলবে। চুলের আগা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে হালাল হবে। পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে মাতাফের কিনারা দিয়ে বা ছাদে গিয়ে তাওয়াফ করবে। হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করবে না, চলে আসার সময় হায়েযা হলে তাওয়াফে বিদা মাফ হয়ে যাবে। নামায সমূহ মক্কা বা মদীনার অবস্থানগৃহে আদায় করবে, এত সাওয়াব বেশী হবে। মক্কা শরীফে শুধু তাওয়াফের জন্য এবং মদীনা শরীফে নির্দিষ্ট সময়ে শুধু রওজা যিয়ারতের জন্য মসজিদে যাবে।

### পঞ্চদশ অধ্যায়

## কুরবানীর ফযীলত ও জরুরী মাসাইল

### কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ রাক্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, (তরজমা) “আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।” (সূরা কাউছার-২)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে।” (ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩১২৩)

কুরবানীর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কুরবানীকৃত পশুকে তার শিং, পশম, খুর, ইত্যাদিসহ কিয়ামতের ময়দানে হাজির করা হবে এবং নেকীর পাল্লায় তা ওজন করা হবে। আর কুরবানীর পশু যবেহ করার সাথে সাথে তার রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই



আল্লাহ পাকের দরবারে তা কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সম্ভ্রষ্ট চিত্তে কুরবানী কর।” (তিরমিযী শরীফ হাঃ নং ১৪৯৭)

### কুরবানীর হুকুম

যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ সূর্যোদয় হতে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যদি কোন সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক মুকীম ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, অর্থাৎ ঋণমুক্ত থাকা অবস্থায় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫০) তোলা রূপা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য সমপরিমাণ নগদ টাকা বা ব্যবসায়ের মাল কিংবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত যে কোন সম্পদ থাকে তাহলে তার উপর নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব। কিন্তু পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। বরং তারা নিসাবের মালিক হলে নিজেরাই নিজের কুরবানী আদায় করবে। অথবা তাদের অনুমতিক্রমে গৃহকর্তা তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী দিবে। (শামী-৬/৩১২, আল ফিকহুল ইসলামী-৪/২৭১১, ২৭০৮)

কারো পক্ষ হতে তার অনুমতি ব্যতীত ওয়াজিব কুরবানী করা হলে সে ওয়াজিব আদায় হবে না। অবশ্য একই পরিবারভুক্ত কোন সদস্য অন্য সদস্যের পক্ষ হতে তার জ্ঞাতসারে নিয়মিত কুরবানী করে আসলে সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে, তবে এক্ষেত্রে উত্তম হল প্রকাশ্যে তার থেকেও অনুমতি নিয়ে নেয়া। (আদদুররুল মুখতার-৬/৩১৫)

### কুরবানীর পশু

চান্দ্র মাস হিসাবে পূর্ণ এক বৎসর বয়সের ছাগল, ভেড়া, দুগ্ধা ও পূর্ণ দুই বৎসর বয়সের গরু, মহিষ এবং পূর্ণ পাঁচ বৎসর বয়সের উট-এ ছয় প্রকারের জন্তু দ্বারা কুরবানী করা যায়। প্রথম তিনটি মাত্র এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং পরের তিনটি সর্বোচ্চ সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। তবে শর্ত হল, সকলের নিয়ত খাঁটি ভাবে সওয়াবের জন্য হতে হবে। সাত শরীকের কোন একজনের নিয়তও যদি শুধু গোশত খাওয়ার জন্য হয় তাহলে কারো কুরবানীই আদায় হবে না। (শামী-৬/৩১৫)

তেমনিভাবে কোন শরীকের মাল হারাম হলে বা অনুমতি না নিয়ে কাউকে শরীক করলে সেক্ষেত্রে সকলের কুরবানী বাতিল হয়ে যায়। (শামী-৬/৩২৬)

উল্লেখ্য যে, ভেড়া ও দুগ্ধা যদি এমন হুষ্ট-পুষ্ট হয় যে, ছয় মাসের বয়সেরটিও দেখতে এক বৎসর বয়স্ক মনে হয় তবে এর দ্বারাও কুরবানী জাযিয় আছে। কিন্তু বকরী বা ছাগলের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। (আদদুররুল মুখতার-৬/৩২১)



অন্ধ, কানা ও ল্যাংড়া জন্তু বা এমন রুগ্ন ও দুর্বল জন্তু কুরবানীর স্থান পর্যন্ত যার হেঁটে যাওয়ার শক্তি নেই, অনুরূপভাবে এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী লেজ ও কান কাটা কিংবা লেজ ও কান বিহীন পশুর কুরবানী সহীহ হবে না। এবং অধিকাংশ দাঁত পড়ে যাওয়া পশু দ্বারাও কুরবানী সহীহ হবে না। (শামী:৬/৩২৩, আল বাহরুর রায়িক:৮/৩২৪)

### যবাইয়ের মাসাইল

১. নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাই করা মুস্তাহাব, নিজে সক্ষম না হলে অন্য লোক দ্বারা করানো যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও নিজে উপস্থিত থাকা উত্তম। মহিলাগণও সম্পূর্ণ পর্দার আড়ালে থেকে অবলোকন করতে পারলে করবেন। (ফাতাওয়ায়ে শামী:৬/৩২৮, আল বাহরুর রায়িক:৮/২৩৮)

২. কুরবানী নিয়ত শুধু মালিক কর্তৃক মনে মনে করাই যথেষ্ট, মুখে কিছু বলার আবশ্যিকতা নেই। অনুরূপভাবে মালিক নিয়ত করার পর যবাইকারী কর্তৃক নামের লিষ্ট পড়ারও জরুরত নেই। তবে “বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার” অবশ্যই বলতে হবে। (শামী:৬/২৯৭-৩০১, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/২৭৩১)

৩. কুরবানীর দু’আ সশব্দে পড়া জরুরী নয়, মনে মনে পড়াই যথেষ্ট। দু’আ না পড়লেও কুরবানীর কোন অসুবিধা হবে না। (শামী:৬/২৯৭)

৪. হলক এবং কষ্ঠের মধ্যখানে যবেহ করতে হবে। নতুবা জানোয়ারটি হালাল হবে না। (বাদায়িয়ুস সানায়ে:৫/৪১)

৫. গলার ৪টি রগ তথা: খাদ্যানালী, শ্বাসনালী, দুটি রক্তনালী হতে কমপক্ষে ৩টি রগ না কাটলে পশু হালাল হবে না। (বাদায়িয়ুস সানায়ে:৫/৪১)

৬. কুরবানীর পশুকে মাথা দক্ষিণ দিকে দিয়ে কিবলামুখী করে শুইয়ে প্রথমে এ দু’আটি পড়তে পারলে পড়বে:

اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

অত:পর “বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ” বলে যবাই করবে। যবাই করার পর এ দু’আটি পড়া ভাল:

اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد و خليلك إبراهيم عليهما الصلاة والسلام  
(বাদায়িয়ুস সানায়ে:৫/৬০, জাওয়াহিরুল ফিকহ:১/৪৫০)

### কুরবানীর গোশত

১. কুরবানী শরীকানা হলে গোশত ওজন করে সমানভাগে বণ্টন করা জরুরী। অনুমান করে বণ্টন করা নাজাযিয। (আল বাহরুর রায়িক:৮/৩২৭)

২. মুস্তাহাব বা উত্তম হচ্ছে, কুরবানীর গোশত তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজেরা রাখবে, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দিবে এবং এক ভাগ গরীব মিসকীনদের দান করবে। তবে এটা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। তাই যদি কেউ কুরবানীর সমস্ত গোশত প্রয়োজনে নিজেরা খায় তাতেও গুনাহগার হবে না।

### কুরবানীর চামড়া

১. কুরবানীর চামড়া বিক্রি না করে পরিশোধন করে নিজে ব্যবহার করা যায়। কুরবানীর চামড়া কুরবানী দাতার জন্য বিক্রি না করা উত্তম। এতদসত্ত্বেও কেউ বিক্রি করলে বিক্রয় মূল্য সদকা করে দেয়া ওয়াজিব। যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়িয় তারাই এর উপযুক্ত পাত্র। যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়িয় নেই তাদেরকে কুরবানীর চামড়ার মূল্য দেওয়াও জায়িয় নেই। (হিদায়া:৪/৪৫০)

২. কুরবানীর চামড়ার ব্যাপারে উত্তম পন্থা হল: তা গরীব আত্মীয়-স্বজন বা দীনী শিক্ষায় অধ্যয়নরত গরীব ও এতীম ছাত্রদেরকে সরাসরি দান করে দেয়া। তালিবে ইলমদের দান করলে একদিকে যেমন দান করার সওয়াব পাওয়া যায়, অপরদিকে ইলমে দীন চর্চার মহান কাজে সহযোগিতাও করা হয় এবং এতে সদকায়ে জারিয়ারও সওয়াব পাওয়া যায়। কুরবানীর চামড়া কোন দীনী প্রতিষ্ঠানের গরীব ছাত্রদের দান করে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রি করানো উত্তম। কেননা এতে অধিক মূল্য অর্জিত হয়ে গরীবের বেশী উপকার হয় এবং দাতার সওয়াবও বেশী হয়। (জাওয়াহিরুল ফিকহ:১/৪৫৬)

৩. কুরবানীর গোশত বা অন্য অংশের বিনিময়ে, অনুরূপভাবে চামড়া বা চামড়া বিক্রিত টাকা দ্বারা যবাই করানো বা গোশত কাটানোর পারিশ্রমিক দেয়া জায়িয় নেই। দিলে তার উপযুক্ত মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। (শামী:৬/৩২০, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩৭)

যদি কোন কারণে কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানী করা সম্ভব না হয় তাহলে কুরবানীর পশুর মূল্য গরীবদের মাঝে সদকা করে দেওয়া জরুরী। (শামী-৬/৩২০)

৪. কুরবানীর গোশত, চামড়া বা চামড়ার মূল্য ইমাম, মুআযযিন, মাদরাসার শিক্ষক বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়া যাবে না। তেমনভাবে মসজিদ মাদরাসার নির্মাণ কাজেও লাগানো যাবে না। (শামী: ৬/৩২৮, ফাতহুল কাদীর:৮/৪৩৭)

### তাকবীরে তাশরীক

যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সকল সাবালক পুরুষ, মহিলার জিন্মায় উক্ত তাকবীর একবার বলা

ওয়াজিব। তিনবার বলা ওয়াজিব নয়। পুরুষগণ উচ্চস্বরে আর মহিলাগণ নিম্নস্বরে পড়বে। তাকবীরে তাশরীক এই :

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

(আব্দুররুল মুখতার:২/১৭৭-১৮০)

### ঈদের নামায সম্পর্কিত জরুরী দুটি মাসআলা

১. যদি কেউ ঈদের নামাযের প্রথম রাকা‘আতে রুকুর পূর্ব মুহূর্তে ইমামের সাথে শরীক হয় তাহলে যদি তার ধারনানুযায়ী তাকবীরে তাহরীমা পড়ার পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর বললেও রুকু পাওয়ার আশা থাকে তাহলে নিয়মানুযায়ী অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলে রুকু করবে। আর যদি অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি বললে রুকু পাবে না বলে ধারণা হয় তাহলে রুকুতে গিয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে। যদি প্রথম রাকা‘আতই না পায় তাহলে ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পর ছুটে যাওয়া নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে সানা পড়ার পর অতিরিক্ত ৩ তাকবীর বলবে। (আব্দুররুল মুখতার:১/১৫০, আল বাহরুর রায়িক:২/২৮২)

২. বর্তমানে ঈদের খুতবার শুরুতে ও মাঝে মাঝে খতীব সাহেবগণ যে তাকবীরে তাশরীক বলে থাকেন; নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা হল: প্রথম খুতবার শুরুতে ৯বার, দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে ৭বার এবং দ্বিতীয় খুতবার শেষে মিস্বর থেকে নামার পূর্বে ১৪বার শুধু “আল্লাহু আকবার” বলবে। এবং এটাই মুস্তাহাব। খুতবার সময় তাকবীরে তাশরীক বলবে না। হ্যাঁ! ঈদের নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে তাকবীরে তাশরীক একবার বলবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-৪/২৫২, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/২৯০, বাইহাকী সুনানুল কুবরা-৩/৪২০, ফাতাওয়ায়ে শামী:২/১৭৫, আহসানুল ফাতাওয়া:৪/১২৭)

## ষোড়শ অধ্যায়

### যাকাতের গুরুত্ব, ফযীলত ও জরুরী মাসাইল

#### যাকাতের আভিধানিক অর্থ

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্র করা, বৃদ্ধি পাওয়া (বস্ত্ত যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়।)

#### পারিভাষিক অর্থ

কোন অসচ্ছল গরীব মুসলমানকে বা মুসলমানদেরকে কোন প্রকার বিনিময় ও শর্ত ছাড়া যে সকল মালের উপর যাকাত প্রযোজ্য ঐ মালের (বর্তমান বাজারের বিক্রয় মূল্যের) চল্লিশ ভাগের এক অংশের মালিক বানানো। (আব্দুরুল মুখতার ২:২৫৬)

## যাকাত আদায়ের হুকুম ও তরককারীর পরিণতি

যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম রুকন, নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট সম্পদের মালিকের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত অস্বীকার করলে ঈমান চলে যায়। যাকাতের ফরযিয়াত স্বীকার করে আদায় না করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

যারা যাকাত আদায় করবে না তাদের সম্পর্কে কুরআন হাদীসে অনেক কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা তাওবায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন (তরজমা) “যারা স্বর্ণ রূপা (ধন-সম্পদ) জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না (অর্থাৎ, যাকাত দেয় না) তাদেরকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তাদের সম্পদ উত্তপ্ত করা হবে এবং সে গুলোর দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে।”

সেদিন বলা হবে এগুলো সেই সম্পদ যার যাকাত না দিয়ে তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন তার স্বাদ আন্বাদন কর। (সূরা তাওবা- ৩৪/৩৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার গলায় সেই মালকে সাপ বানিয়ে ঝুলিয়ে দিবেন। অন্য এক হাদীসে আছে যে, সাপ তার দুই চোয়ালে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চয়। (তিরমিযী হাঃ নং ২৪৪১, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৭৮৪)

এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে আরো অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

## যাকাত যোগ্য সম্পদ ও যাকাতের নিসাব

ঋণ ও মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য, অথবা ৫২.৫ তোলার রূপার মূল্য সমপরিমাণ নগদ টাকা বা ব্যবসায়ের মালের মালিক হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হয়। (আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২)

উল্লেখ্য যে, কোন প্রকার সম্পদ স্বতন্ত্রভাবে নেসাব পরিমাণ না হয়ে একাধিক প্রকারের অল্প অল্প হয়ে সমষ্টিগতভাবে মূল্য হিসাবে ৫২.৫ তোলার মূল্য সমপরিমাণ হলেও যাকাত প্রযোজ্য হবে। (আল বাহরুল রায়েক ২:৪০০,৪০১)

**যাকাত যার উপর ফরয হয়**

সাবালক সজ্জন মুসলমান নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর চন্দ্র মাস হিসেবে এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়।

একই পরিবারে একাধিক ব্যক্তি (যেমন, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে) নেসাবের মালিক হলে প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। নেসাবের মালিক প্রত্যেকের উপরই যাকাত আদায় করা ফরয। স্ত্রীর যাকাত স্বামীর উপর বর্তায় না, তেমনিভাবে সন্তানদের যাকাত পিতার উপর বর্তায় না। তবে কেউ যদি অন্যের অনুমতিক্রমে তার পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

### যাকাত কাকে দিবেন?

যাদের সাথে দাতার জন্মগত সম্পর্ক আছে যেমনঃ তার পিতা মাতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী, প্রমুখ এবং দাতার সাথে যাদের জন্মগত সম্পর্ক আছে যেমনঃ তার ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী ইত্যাদি তাদেরকে যাকাত ফিতরা দেওয়া যায় না।

অনুরূপ ভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত ফিতরা দিতে পারবে না। অমুসলিম ও ধনী ব্যক্তি (নেসাব পরিমাণ মালের মালিক) কিংবা ধনীর নাবালগ সন্তানকে দান করলেও যাকাত ফিতরা আদায় হবে না। বরং যাকাত ফিতরা দিতে হবে এমন গরীব ও ফকীর মিসকীনকে যাদের নিকট নিসাব পরিমাণ মাল নেই।

ধর্মীয় খিদমতে রত নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তিবর্গকে যাকাত ফিতরা দান করলে ধর্মীয় খিদমতের সহযোগিতা হিসেবে অধিক সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। (সূরা বাকারাহঃ ২৭৩)

### যাকাত কখন আদায় করতে হয়?

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় যদি রমায়ান মাস না হয়ে অন্য কোন মাস হয় তাহলে সে মাসেই যথা তারিখে সমুদয় মালের হিসাব নিকাশ করে যাকাতের পরিমাণ বের করা জরুরী। আদায়ের ক্ষেত্রেও রমায়ানের অপেক্ষা না করে সাথে সাথে আদায় করে দেওয়া জরুরী। যাতে রমায়ানের পূর্বে ইস্তেকাল হয়ে গেলে ফরয জিন্মায় বাকী না থেকে যায়। দেরি করে আদায় করলে যদিও যাকাত আদায় হয়ে যায়। কিন্তু ওয়াজিব তরক করার দরুন গুনাহগার হতে হয়। তবে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যদি যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (কিফায়াতুল মুফতী ৪:২৬২, আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২)

### যাকাত সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল

### ১। শুধু স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকলে তার যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

কোন ব্যক্তি যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মালিক হয় চাই তা ব্যবহার করুক বা নাই করুক ঋণ মুক্ত অবস্থায় তার নিকট এক বৎসর কাল থাকলে তার উপর যাকাত দেওয়া ফরয। যদি তার নিকট অন্য কোন মাল না থাকে তাহলে উক্ত মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ কিংবা তার সমপরিমাণ মূল্য আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত স্বর্ণ বা রূপা থেকে কিছু অংশ বিক্রি করে হলেও যাকাত আদায় করা জরুরী। (আদদুররুল মুখতার ২:২৯৫)

২। যদি ব্যাংকে বা অন্য কোন তহবিলে কারো টাকা জমা থাকে আর ঐ টাকাগুলো ঋণমুক্ত অবস্থায় নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে চন্দ্র মাস হিসেবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার যাকাত দিতে হবে। (আলমগীরী ১:৭২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৩:৫৭)

### ৩। দোকান/বাড়ী ভাড়ার জন্য প্রদত্ত এডভান্স টাকায় যাকাত

যদি কোন সাহিবে নিসাব ব্যক্তি দোকান কিংবা বাড়ী ভাড়া নেয় আর মালিকের নিকট সিকিউরিটি হিসাবে জমা রাখে যা পরবর্তীতে ফেরতযোগ্য তাহলে উক্ত টাকার যাকাত দেয়া ফরয। কারণ, উক্ত টাকা তার মালিকানায়ই রয়েছে। জমা রাখার দরুন তার মালিকানা শেষ হয়নি, সুতরাং অন্যান্য মালের সাথে হিসাব করে তার এ টাকার যাকাতও আদায় করতে হবে। (আদদুররুল মুখতার ২:৩০৫, দারুল উলুম ৬:৭৭ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৫১)

তবে উক্ত টাকা যদি এডভান্স ভাড়া হয় যা থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু কাটা যায় তাহলে উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে না।

### ৪। টাকা ও স্বর্ণ রূপা মিলে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাতের হুকুম

স্বর্ণ বা রূপার মধ্যে যে কোন একটির গহনা আছে, কিন্তু নিসাব পরিমাণ নয়, কিন্তু তাহার সাথে নগদ টাকা (চাই পাঁচ/দশ টাকাই হোক না কেন) সারা বৎসর হাতে আছে। যদি উক্ত স্বর্ণ বা রূপার সাথে টাকা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের সমান হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। (রদ্দুল মুহতার ২:২৯৬, ফাতাওয়া দারুল উলুম, ৬:৫০)

### ৫। করয দেয়া টাকার উপর যাকাত

করয দেয়া টাকা উসূল হওয়ার পর উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে এবং বিগত বছর সমূহে উক্ত টাকার যাকাত না দিয়ে থাকলে সেই বকেয়া যাকাতও দিতে হবে। তবে কেউ যদি করযের টাকা উসূল হওয়ার পূর্বে প্রতি বছর উক্ত টাকার যাকাত দিয়ে দেয়, তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (আদদুররুল মুখতার ২:২৬৬, দারুল উলুম ৬:৪৫, ৭৭)

যে করযের টাকা পাওয়ার কোন আশা নেই সে টাকার যাকাত দিতে হবে না। আর যদি কখনো উসূল হয় তাহলে সে বছর থেকে যাকাত দিবে। অতীতের যাকাত দিতে হবে না। (কিতাবুল ফিকহ ১:৫৪৮, দূররে মুখতার ও রদ্দুলমুহতার খণ্ড-২ পৃ-২৬৬)

#### ৬। যাকাতের নিয়তে ঋণ মাফ করে দেওয়া

যাকাতের নিয়তে ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাত আদায় হওয়ার জন্য তামলীক তথা অন্যকে খালেছ ভাবে যাকাতের মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। আর যাকাতের নিয়তে ঋণ মাফ করে দিলে গরীবকে যাকাতের টাকার মালিক বানানো হচ্ছে না। তাই এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হবে না।

তবে এরূপ ক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের সঠিক পন্থা হলো, ঋণ দাতা প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে গরীব ঋণ গ্রহীতাকে নিঃশর্তভাবে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিবে। তারপর তার থেকে পাওনা ঋণের টাকা উসূল কবে নিবে, এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং ঋণও উসূল হয়ে যাবে। (আদদুররুল মুখতার ২:২৭০, ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৭১, রহীমিয়া ২:১২)

#### ৭। রাজনৈতিক দলকে যাকাত দেওয়ার বিধান

যদি কোন রাজনৈতিক দল যাকাতের টাকা কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা সেবার নামে সংগ্রহ করে আর সেগুলোকে ইলেকশনে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করে এবং রাজনৈতিক কর্মীদের ভাতা হিসেবে প্রদান করে তাহলে তাদেরকে এ জাতীয় সদকা (অর্থাৎ, সদকায়ে ওয়াজিবাহ) প্রদান করা জাযিয় নয়। এবং এতে যাকাত দাতার যাকাত আদায় হবে না। (খাইরুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৭)

#### ৮। মসজিদ মাদরাসার কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা

মসজিদ, মাদরাসা, এতীমখানা, হাসপাতাল ইত্যাদির নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যাকাতের প্রকৃত হকদারকে বিনিময়হীন ভাবে উক্ত মালের মালিক বানিয়ে দেয়া। নির্মাণ কাজে ব্যয় করলে যেহেতু কোন হকদার ব্যক্তিকে মালিক বানানো হয় না তাই এ সুরতে যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং এসব নির্মাণ কাজে কেউ যাকাত দিয়ে থাকলে ঐ পরিমাণ টাকার যাকাত দ্বিতীয়বার আদায় করতে হবে। উল্লেখিত কারণেই যাকাতের মাল জনকল্যাণমূলক কাজে যেমন, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা না জাযিয়। অনুরূপভাবে ইসলামের নামে টিবি চ্যানেল বা পত্র-পত্রিকার কাজে যাকাত দিলে সে যাকাত আদায় হবে না। (আলমগীরী ১:১৮৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৮২)



## ৯। হিসাব করে যাকাত দেয়া জরুরী

বহু লোক যাকাত-ই দেয় না। আর কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা যাকাত দেয় ঠিক কিন্তু যাকাত দেয়ার সঠিক পদ্ধতি তারা অবলম্বন করে না।

শরী‘আতে যখন শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে বলা হয়েছে তখন উহার দাবী হলো যাকাতযোগ্য সমস্ত সম্পদ হতে হিসাব করে শতকরা আড়াই ভাগ বের করে যাকাত দেয়া। যদি কেউ হিসাব না করে যাকাত আদায় করে আর এই টাকাও নির্দিষ্ট পরিমাণ হতে কম আদায় করে তাহলে তার জন্যও আখিরাতে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। (সূরা তাওবা ৩৪/৩৫)

হিসাব করার সময় যাকাতযোগ্য মালের বর্তমান বাজার দর হিসেবে হিসেব বের করবে। যে দামে খরিদ করা হয়েছে বা ভবিষ্যতে যে দামে বেচা যাবে তা ধর্তব্য নয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২:২৮৬)

উল্লেখ্য যে, গরীব আত্মীয়-স্বজনকেও যাকাতের মাল দেয়া যায় বরং তাদেরকেই আগে দেওয়া উচিত। অবশ্য তাদেরকে হাদিয়া বলে দেয়া ভালো যাতে তারা মনে কষ্ট না পায়। তবে মেহমানে রাসূল তালিবে ইলমের কথা ভুলে গেলে চলবে না। তাদেরকে যাকাতের বড় অংশ দেয়া উচিত তাতে যাকাত তো আদায় হবেই সেই সাথে কুরআনী তা‘লীমের সহযোগিতা করার দরুন ছদকায়ে জারিয়ার সাওয়াবও হাসিল হবে। (সূরায়ে বাকারা ২৭৩)

## সপ্তদশ অধ্যায়

### কতিপয় জরুরী আমল

#### পূর্ণ হায়াতের জন্য করণীয় আ‘মাল

#### সকল শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য জরুরী

উভয় জগতে কামিয়াবীর জন্য হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের সাথে মুহাব্বত ও শ্রদ্ধা রাখা জরুরী। আল্লাহ তা‘আলাকে পাওয়া এবং হেদায়েতের উপর কায়ম থাকার জন্য আল্লাহওয়ালাদের সোহবত অপরিহার্য বিষয়। (সূরায়ে তাওবা ১১৯, সূরায়ে নাহল ৪৩)

দীনের খেদমতে নিয়োজিত উলামায়ে কেরামের কখনো সমালোচনা করবে না। এত নিজের দীন ও ঈমানের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। হ্যাঁ তাদের কোন ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে, তারা তো আর ফেরেশতা নন। তবে তাদের মুরক্বীগণ তাদের সে সব ভুলের সংশোধন করবেন। এটা অন্যদের দায়িত্ব নয়। অধুনা অনেকে উলামায়ে কেরামের ভুল ধরে এবং একা একা গবেষণা করে বা আল্লাহওয়ালাদের সোহবত বঞ্চিত ইসলামী চিন্তাবিদদের অনুসরণ করে দীনদার

হতে চায়। এটা গোমরাহী ও দোযখের রাস্তা। তাই এ পথ কখনো অবলম্বন করবে না।

নিঃস্বার্থ ও হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে নিচের কাজগুলো সারাজীবন আনজাম দিতে হবেঃ

ক. ঈমানী বিষয়ের তা'লীমের মাধ্যমে নিজের ঈমান ও আক্বীদা বিশ্বাসকে সঠিক করতে হবে এবং ঈমানকে কুফরী ও শিরকী বিশ্বাস থেকে হেফাজত করতে হবে এবং ঈমানী দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানকে মজবুত ও পোক্তা করতে হবে। (সূরায়ে নিসা ১১৫, সূরায়ে বাকারা ১৩)

খ. ইবাদাত তথা নামায, রোযা, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত, যাকাত, হজ্জু ইত্যাদি ইবাদাতসমূহ সুন্নাত মুতাবিক সুন্দরভাবে করতে হবে। এর জন্য হক্কানী আলেমদের মজলিসে শরীক হয়ে নামায ও অন্যান্য আমলের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। (সূরায়ে আলে ইমরান ৩১, তিরমিযী ২৬৭৮, মুয়াত্তা মালেক ৪৩৩)

গ. মু'আমালাত তথা হালাল রিযিকের পাবন্দী করবে। সুতরাং ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, কৃষিজীবীসহ সকল স্তরের উপার্জনকারী স্ব-স্ব পেশার হালাল-হারাম কোন হক্কানী মুফতী থেকে ভালভাবে জেনে নিবে। কারো ইনতিকাল হলে মীরাছ বণ্টনে দেরী করবে না, তার কোন ইয়াতীম বাচ্চা থাকলে তার অংশ খুব হেফাজত করবে, তার মাল খাওয়া থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকবে। হালাল রিযিক ইবাদতের দিকে ধাবিত করে আর হারাম রিযিক গোনাহের দিকে ধাবিত করে। (সূরায়ে মুমিনুন-৫১, সূরায়ে বাকারাহ-১৬৮)

ঘ. মু'আশারাত তথা বান্দার হক বিশেষ করে পিতা-মাতা, বিবি বাচ্চা ও অন্যান্যদের হক হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিয়ে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে। কারো হক নষ্ট করবে না। কাউকে অনর্থক কষ্ট দিবে না। এমনকি জীব-জন্তুকে কষ্ট দেয়া থেকেও বিরত থাকবে। নিজের হক উসুলের তুলনায় অন্যের হক আদায় করাকে প্রাধান্য দিবে। আল্লাহর হক আল্লাহ হয়তো মাফ করে দিবেন কিন্তু বান্দার হক তিনি মাফ করবেন না। হাশরের ময়দানে পাওনাদারকে নেকী দিতে হবে কিংবা তার গোনাহের বোঝা বহন করতে হবে। (সূরায়ে নিসা ৩৬, বুখারী শরীফ ৬৪৮৪)

ঙ. তায়কিয়াহ তথা আত্মশুদ্ধির ফিকির রাখবে। কুরআনে কারীমে আত্মশুদ্ধির গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে যত কসম ব্যবহৃত হয়েছে অন্য কোন ছকুমের ব্যাপারে তা হয়নি। সুতরাং অন্তরের দশটি মন্দ স্বভাব তথা আধ্যাত্মিক রোগ বা গুনাহ সংশোধনের মাধ্যমে যাবতীয় গুনাহ পরিত্যাগ করার জন্য এবং অন্তরের দশটি ভাল স্বভাব অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কোন আল্লাহওয়ালা শাইখের সাথে সরাসরি অথবা চিঠিপত্রের মাধ্যমে ইসলামী সম্পর্ক রাখাকে ফরয মনে করবে।

এবং সুযোগমত তাদের মজলিসে বসতে চেষ্টা করবে। (সূরায় শামস-৯-১০, মুসলিম শরীফ হাঃ নং ১৫৯৯)

\* এই পাঁচটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন এবং এ পাঁচ বিষয়ের উপর আমলকারীকে মুত্তাকী বা আল্লাহওয়ালা বলা হয় এবং প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আল্লাহওয়ালা হওয়া ফরয। (বাকারা-১৭৭)

### **আল্লাহর দীনের জন্য সময় ফারেগ করা**

উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করার লক্ষ্যে সারা জীবন দাওয়াত, তা'লীম, তায়কিয়াহ-এই তিন প্রকার মেহনতের জন্য সময় বের করবে। এর কোন একটির জন্য মেহনত করাকে যথেষ্ট মনে করবে না। এ তিনটির ব্যাখ্যা হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিবে। (বাকারা-১২৯, আলে ইমরান-১৬৪)

### **দৈনন্দিন আমল**

#### **জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা**

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে। জামা'আতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব। জামা'আত তরককারী ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে। তাহাজ্জুদ সহ অন্যান্য নফল নামায পড়বে। মহিলাদের জন্য বিনা উযরে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শরীক হওয়া নাজাযিয় ও গুনাহ। (বাকারা-৪২, বুখারী-৯৬)

#### **গুনাহ বর্জন**

শিরক বিদ'আত ও গুনাহ থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকবে। একটি গুনাহই মানুষকে দোষখে নিয়ে যেতে পারে। নেক কাজ দুধের মত আর গুনাহ হল বিষের মত। উভয়টি একত্রিত হলে বিষের ক্রিয়াই প্রকাশ পায়। (আনআম-১২০, মিশকাত-২২৮)

#### **সুন্নাতের অনুসরণ**

প্রতিটি কাজ নবীজীর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত অনুযায়ী করার জন্য সুন্নাত শিকতে থাকবে, সুন্নাতের প্রশিক্ষণ নিবে এবং তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সহজ সুন্নাতকে (তথাঃ ক. পরস্পর সালাম আদান প্রদান। খ. উপরে উঠতে আল্লাহু আকবার বলা। নিচে নামতে সুবহানাল্লাহ বলা। সমতলে চলতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির করা। গ.প্রত্যেক ভাল কাজে ডানকে প্রাধান্য দেওয়া। নিম্ন কাজে বামকে প্রাধান্য দেওয়া) আমলে আনবে। যাতে করে অবশিষ্ট সকল সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। (আলে ইমরান-৩১)

#### **কুরআন শরীফ তিলাওয়াত**

কুরআনে কারীমের সহীহ শুদ্ধ তিলাওয়াত করবে। এটা ফরয। সূরা কিরা‘আত অশুদ্ধ তিলাওয়াত করা বড়ই আফসোসের বিষয়। ফরয তরককারী কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারে না। প্রতিদিন এক পারা করে কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করবে। এজন্যই কুরআনকে ত্রিশ পারায় বিভক্ত করা হয়েছে। যারা হাফেয তারা তিন পারা করে তিলাওয়াত করবে। তবে সাধারণ অবস্থায় সাত দিন বা তিন দিনের কমে খতম করবে না। কেননা, হাদীস শরীফে তাড়াছড়া করে খতম করতে নিষেধ করা হয়েছে। বাদ ফজর সূরায়ে ইয়াসীন, বাদ মাগরিব সূরায়ে ওয়াক্বিয়াহ ও শোয়ার পূর্বে সূরায়ে মুলক তিলাওয়াত করবে। (আবু দাউদ-১৩৮৮)

### ফরয নামাযের পরে ওজীফা পড়বে

প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে তিনবার ইস্তিগফার পড়বে। (তাবারানী কাবীর-৮৫৪১)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

এবং এ দু‘আটি পড়লেও ভাল হয়। (বুখারী শরীফ-১/১১৭)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

আরো কিছু দু‘আ কালাম আছে যা ফরযের পর সুন্নাত ও নফল থাকলে, সুন্নাত ও নফলের পরে পড়বে। আর সুন্নাত নফল না থাকলে ফরযের পরে পড়বে।

(ক) আয়াতুল কুরসী, একবার। (নাসাঈ-৯৮৪৮)

(খ) সূরা ফালাক, সূরা নাস-তিনবার করে, এর সাথে সূরায়ে কাফিরুন ও ইখলাস মিলিয়ে নিলে ভাল। (তিরমিযী-২৯০৩)

(গ) তাসবীহে ফাতেমী একবার। (৩৩ বার اللَّهُ، ৩৩ বার الْحَمْدُ لِلَّهِ، ৩৪ বার اللَّهُ أَكْبَرُ) (মুসলিম ৫৯৭)

এগুলো পাঁচ ওয়াক্তেই পড়বে। শুধু ফজর ও মাগরিবে এ তিনটির আগে নিচের দুটি পড়বে।

(ঘ) اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

(ঙ) ফজর ও মাগরিবের পর পড়বে-৩ বার اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم  
পড়ে, বিসমিল্লাহ পড়ার পর ১ বার سورة الحشر এর শেষ ৩ আয়াত পড়বে। (তিরমিযী, ২ : ১২০)

বিঃদ্রঃ হাদীসে আরো কিছু দু‘আ আছে, সুযোগ হলে সেগুলোও পড়বে। জুমু‘আর দিন আসরের পরে এই দু’রুদটি ৮০ বার পড়বে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

\* তাছাড়া প্রতিদিন যে কোন সময় একশবার দুর্রুদ শরীফ পড়বে। (আদদুররুল মানদুদ-১৬০)

\* প্রতিদিন মুনাজাতে মকবুল থেকে এক মনযিল পাঠ করতে চেষ্টা করবে।

\* আল্লাহ তা‘আলার যিকির করবে

\* তাহাজ্জুদের পরে বা ফজরের পরে অথবা যখন সুযোগ হয় আসন দিয়ে বসবে। তারপরে কয়েকবার ইস্তিগফার ও কয়েকবার সহীহ দরুদ শরীফ পড়বে। (ইবনে হিব্বান-৮১৭)

\* তারপরে কসদুস সাবীলের বর্ণনা অনুযায়ী যিকির করবে। যিকিরের সময় শরীর সামান্য হেলাবে। যথেষ্ট পরিমাণ সময় না পেলে বা অন্য কোন সমস্যা হলে বার তাসবীহ এর যিকির করবে।

\* বার তাসবীহ এর যিকিরের বিবরণ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০০ বার (১০/১৫ বার পর পর পূর্ণ কালেমা)

ইল্লাল্লাহ ৪০০ বার। (প্রত্যেকটায় একবার পরে শ্বাস ফেলবে।)

আল্লাহু আল্লাহ ৬০০ বার। (প্রথমটার শেষে পেশ।)

আল্লাহ ১০০ বার। (শেষে সাকিন।)

### বিশেষ কয়েকটি আমল

১. ফজরের নামাযের পর কয়েক মিনিট মৃত্যু, কবর ও হাশরের ময়দানের মুরাকাবা করা।

২. এই দু‘আ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ) করবে। এরপর জরুরত অনুযায়ী দীন ও দুনিয়ার যে কোন কাজে লাগবে।

৩. দীন দুনিয়ার যে কোন কাজ করবে সেখানে আল্লাহর হুকুম ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত আছে কিনা দেখা এবং আল্লাহপাকের নাফরমানী তথা গুনাহ থেকে খুব সতর্কতার সাথে বিরত থাকা।

৪. (রাত্রে) বিছানায় সুন্নাত তরীকায় শুয়ে ঘুমানোর আগে ২ হতে ৩ মিনিট সারা দিনের আমলের হিসাব নেওয়া। অর্থাৎ, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ রাখবে।

\* সারা দিনের ভুল (গুনাহ) কাজের জন্য আল্লাহপাকের কাছে তাওবা করা। (কিতাবুল ঈমানের তাওবার ৩ শর্ত দেখুন পৃঃ ৫৫)

\* সারা দিনের সহীহ কাজের জন্য আল্লাহপাকের কাছে শুকরিয়া আদায় করা।

\* পরবর্তী দিনের জন্য সহীহভাবে কাজ-কর্ম করার নিয়ত করা।

উপরোক্ত আমলের বদৌলতে যদি সে এ রাতে মার যায় তবে সে জালাতী হবে ইনশাআল্লাহ।

**আল্লাহওয়লাগণ তাঁদের অভিজ্ঞার আলোকে বলেনঃ**

৫. নিম্নোক্ত তিনটি সুন্নাতের উপর গুরুত্ব সহকারে আমল করতে পারলে অন্যান্য সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়-

১ম সুন্নাত: সালামকে ব্যাপক করা এবং আগে আগে সহীহ শুদ্ধ ভাবে সালাম দেওয়া।

হাদীসে আছে “যে ব্যক্তি আগে আগে সালাম দিবে আল্লাহপাক তাকে অহংকার হতে মুক্তি দিবেন।”

২য় সুন্নাত: কোনটা উন্নত আর কোনটা নিম্নমানের কাজ তা বিচার করে উন্নত কাজ ও স্থানে ডান দিককে (ডান হাত/ডান পা) এবং নিম্নমানের কাজ ও স্থানে বা দিককে (বাম পা/বাম হাত) প্রাধান্য দেওয়া।

৩য় সুন্নাত: আল্লাহপাকের যিকির বেশি বেশি করা।

অর্থাৎ, ক. প্রতিদিন কুরআন শরীফ হতে কিছু না কিছু তিলাওয়াত করা। (কুরআনকে সহীহ করা, সম্ভব হলে এক মাস জামি‘আ রাহমানিয়া মাদরাসায় হারদুই ট্রেনিং নেওয়া) দেখে পড়া ভাল অন্যথায় যে সূরা মুখস্থ আছে সেটা হাঁটতে হাঁটতে বা গাড়ীতে পড়তে থাকা।

খ. ফরয নামাযের শেষে কিছু ওজীফা পড়া-

\* তিনবার ইস্তেগফার পড়া। (মুসলিম-হাদীস নং ৫৯১),

\* একবার আয়াতুল কুরছী পড়া। (সুনানে কুবরা, হাদীস নং ৯৮৪৮),

\* তাসবীহ ফাতেমী পড়া। (৩৩ বার اللَّهُ سُبْحَانَ, ৩৩ বার الْحَمْدُ لِلَّهِ, ৩৪ বার (اللَّهُ أَكْبَرُ) (মুসলিম হাদীস নং: ৫৯৬)

উক্ত আমলসমূহ পাঁচ ওয়াঞ্জেই করবে। আর ফজর এবং মাগরিবে ২টা আমল বৃদ্ধি পাবে।

\* ৭ বার (কথা বলার পূর্বে) (اللَّهُمَّ أَجْرُنِي مِنَ النَّارِ) (মুঃ আহমাদ হাদীস নং ১৮০৫৪)

\* সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত পড়তে হবে। (মুঃ আহমাদ হাদীস নং ২০৩০৬)

গ. প্রতি দিন কালেমা সুওম (১০০ বার), সহীহ দুরুদ (১০০ বার), ইস্তেগফার (১০০ বার) (মুসলিম হাদীস নং ২৬৯২)

ঘ. রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেখানে যে দু‘আ পড়েছেন সেখানে সে দু‘আ পড়া (লেখকের মাসনূন দু‘আ ও দরুদ পুস্তিকাটি দেখে মুখস্থ করা যেতে পারে।)

ঙ. উপরের দিকে উঠতে- (اللَّهُ أَكْبَرُ), নিচের দিকে নামতে- (سُبْحَانَ اللَّهِ), সমান জায়গায় চলতে- (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) (দাঃ কুতনী-২/২৩৩, মাউসুআহ-৬/৪৭৫)

#### ৬. ফজরের পর সূরা ইয়াসীন পড়া।

ফায়দাঃ একবার সূরা ইয়াসীন পড়লে ১০ বার কুরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায়। (তিরমিযী হাদীস নং ২৮৮৭)

৭. চার রাকা‘আত করে ইশরাক ও চাশতের নামায পড়া (সময়ঃ বেলা উঠার ১৫ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের ৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত) (উত্তম সময়ঃ বেলা উঠার এক/দেড় ঘণ্টার পর ইশরাক পড়া এবং বেলা ১০/১১ টায় চাশতের নামায পড়া।)

ফায়দাঃ ইশরাকের প্রথম দু‘রাকা‘আতে ১টা কবুল হজ্জের নেকী এবং ২য় দু‘রাকা‘আতে আল্লাহপাক তার সারা দিনের যিম্মাদারী নিয়ে নিবেন। (তিরমিযী হাদীস নং ৫৮৬; হাদীস নং ৪৭৫)

৮. যুহরের নামায এর সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে যাওয়ালের নামায পড়া। (রাকা‘আতের সংখ্যাঃ ২ কিংবা ৪ রাকা‘আত)

ফায়দাঃ আল্লাহপাক এ সময় আসমানের সব দরজা খুলে দেন এবং আছানীর সাথে সব ইবাদাত বন্দেগী ও দু‘আ কবুল হয়ে যায়। (তিরমিযী হাদীস নং ৪৭৮)

#### ৯. মাগরিবের ফরযের পর ৬ রাকা‘আত আওয়াবীন নামায পড়া।

(বিঃদ্রঃ মাসআলা-কেউ যদি দু‘রাকা‘আত সুন্নাত সহ বাকী ২,২ রাকা‘আত নফল নামায পড়ে তবে তার ৬ রাকা‘আত আওয়াবীন হয়ে যাবে।)

ফায়দাঃ আল্লাহপাক তাকে একটানা ১২ বৎসর ইবাদাত করার সওয়াব দিবেন (তিরমিযী হাদীস নং ৪৩৫)

#### ১০. সূরা ওয়াকিয়াহ পড়া।

সময়ঃ মাগরিবের পর থেকে ইশার আগ পর্যন্ত।

ফায়দাঃ আল্লাহপাক রিয়িকের মধ্যে প্রশস্ততা ও বরকত দান করবেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর-পৃঃ ৪/২৯৭)



## ১১. ইশার পর সূরা মুলক পড়া।

ফায়দাঃ আল্লাহপাক কবরের আযাব কেয়ামত পর্যন্ত মাফ করে দিবেন। (তিরমিযী হাদীস নং ২৮৭৫)

## ১২. তাহাজ্জুদ নামায পড়া।

তাহাজ্জুদের উত্তম সময় হলো সুবহে সাদিকের ২ ঘণ্টা আগে থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময়।

### তাহাজ্জুদের ফায়দাঃ

ক. পূর্ববর্তী সকল নবী ওলীদের আমল ছিল,

খ. আল্লাহপাকের অত্যাধিক নৈকট্য লাভ হয়।

গ. গুনাহ হতে বাঁচার তাওফীক হয়,

ঘ. আল্লাহপাক এ সময় প্রথম আসমানে এসে ডাকতে থাকেন। (তিরমিযী হাদীস নং ২১৭; তিরমিযী হাদীস নং ৩৫৪৯)

১৩. বাসায় তালীম করতে থাকা (বিশেষ করে কিতাবুল ঈমানের গুনাহের অধ্যায় পড়া ও নিজের গুনাহের আলাদা লিষ্ট করা এবং কোন হক্কানী পীরের পরামর্শ অনুযায়ী তা পরিহার করা) (তাফসীরে তুবারী-১৫/১৮৫)

১৪. নিজ আত্মীয়-স্বজন মহল্লাবাসী এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট দীনের দাওয়াত পেশ করা এবং দীনের জরুরী কথার তালীম করা। (রহুল মাআনী-১৪/২৩২)

১৫. আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে বসা এবং তাদের সাথে ইসলামহী সম্পর্ক করে নিজের অন্তরের রোগসমূহের চিকিৎসা করা। (তাফসীরে রুহুল মাআনী-৬/৮১)

### জুম'আর দিনের আমল

১. জুম'আর দিনে ৬টি বিশেষ আমল

ক. জুম'আর নামাযের উদ্দেশ্যে গোসল করা।

খ. আযানের পূর্বেই মসজিদে রওনা হওয়া।

গ. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।

ঘ. ঈমাম সাহেবের কাছাকাছি বসা অর্থাৎ, স্থান পেলে ১ম কাতারে নতুবা ২য় কাতারে বসা।

ঙ. উভয় খুতবা মনোযোগ সহকারে শুনা।

চ. খুতবার সময় কোন কথা বা কাজ না করা।

ফায়দাঃ প্রত্যেক কদমে ১ বৎসর পর্যন্ত নফল রোযা রাখার ও ১ বৎসর নফল নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যাবে। (তিরমিযী হাদীস নং:৪৯২)

### জুম'আর দিনের অন্যান্য আমল

২. সূরা কাহাফ পড়া। (কমপক্ষে ১০ আয়াত) (মুসলিম হাদীস নং ৮০৯; তাফসীরে ইবনে কাসীর-৩/৭৯)

**ফায়দাঃ** দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩. সালাতুত তাসবীহ নামায পড়া।

রাকা'আতঃ এক সাথে ৪ রাকা'আত অথবা, ২,২ রাকা'আত করে পড়া। (আবু দাউদ হাদীস নং ১২৯৭)

**ফায়দাঃ** সকল প্রকার গুনাহ থেকে মারফ পাওয়া যায়।

৪. উত্তম পোশাক ও খুশবু লাগিয়ে নামাযে আসা। (বুখারী হাদীস নং ৮৮৩, ৮৮৬)

**খুশবু ব্যবহারে নিম্নোক্ত নিয়ত করবে**

এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুম্মাত।

আমাদের শরীরের ঘামের গন্ধ হতে যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়।

মুসলমান ভাইদের অন্তর খুশি করা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -“যারা গরীব, খুশবু কেনার টাকা নেই, তাদের জন্য গোসল হচ্ছে খুশবু।”

৫. দুই খুতবার মাঝে যখন ঈমাম সাহেব বসে তখন অন্তরে দু'আ করা, মুখে নয়। (তিরমিযী হাদীস নং ৫২৮)

**ফায়দাঃ** এ সময় দু'আ কবুল হওয়ার ওয়াদা রয়েছে।

৬. আছরের পর ৮০ বার এই দুরুদ শরীফ পড়া-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

(আদদুররু মানযুদ ফিন সালাতি ওয়াস সালামি আলা সাহিবিল মাকামিল মাহমুদ-পৃষ্ঠা ১৬০)

**ফায়দাঃ** আল্লাহপাক ৮০ বৎসরের গুনাহ মারফ করে দিবেন। যদি গুনাহ না থাকে তবে জান্নাতে তার মর্তবা বৃদ্ধি করবেন এবং তার আমল নামায ৮০ বৎসরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিবেন।

৭. বেলা ডোবার আগে (মাগরিবের) ১০/১৫ মিনিট আগে মসজিদে এসে দু'আয় মশগুল হওয়া। (আবু দাউদ-হাদীস নং ১০৪৮)

**ফায়দাঃ** এ সময়ও দু'আ কবুল হওয়ার ওয়াদা রয়েছে।

৮. এ দিনে অন্য দিনের তুলনায় বেশী দুরুদ পড়া। (আবু দাউদ হাদীস নং ১০৪৭)

## অষ্টাদশ অধ্যায়

### মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.-এর বাতানো কিছু জরুরী আমল

#### রিযিকের প্রশস্ততার আমল

পূর্বে এবং পরে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করে এই দু‘আ পড়া  
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ এই দু‘আ ফিতনা ও বিপদ মুক্তির জন্য ৩৪১ বার। বিশেষ  
কোন মকছুদ পূরণের জন্য ১১১ বার, রিযিকের প্রশস্ততার, অভাব অনটন দূর  
হওয়া এবং করজ আদায়ের জন্য ৩০৮ বার, বিভিন্ন মুসীবত পেরেশানী দূর  
হওয়ার জন্য ১৪০ বার পড়া।

#### রোগ মুক্তির দু‘আ

যে কোন রোগ থেকে মুক্তির জন্য প্রত্যহ ১১ বার আলহামদু শরীফ পূর্ণ পড়ে  
পানিতে দম করে পান করা এবং করানো। এর সাথে সূরায়ে ফালাক এবং  
সূরায়ে নাস পড়ে নেয়া অত্যন্ত ভাল।

শত্রুদের শত্রুতা থেকে মুক্তির জন্য ১১ দিন এক হাজার বার ইশার নামাযের পর  
এরপর প্রত্যহ একশত বার নিম্নোক্ত দু‘আটি পড়তে থাকবে।  
إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

#### শারীরিক সুস্থতার দু‘আ

সকাল বিকাল ১৪১ বার (يَا سَلَامُ) ইয়া সালামু পড়বে, আগে পরে তিনবার করে  
দুরুদ শরীফ পড়ে নিবে। ইহা যে কোন সময় পড়া যায়। বিভিন্ন সময়ে ভাগ ভাগ  
করেও পড়া যায়।

#### ইসলাহের আমল

নিজের অবস্থার ইসলাহ পরিশুদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের হক আদায়ের জন্য চল্লিশ  
দিন পর্যন্ত যে কোন সময়, দৈনিক ২১ বার নিম্নের দু‘আ পড়বে- আগে পরে ১১  
বার দুরুদ শরীফ পড়ে নিবে।

(يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ يَا خَالِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا عَزِيزُ يَا طَئِيفُ يَا غَفَّارُ)

#### বিপদ মুক্তির আমল

শত্রু এবং বিপদ থেকে মুক্তির জন্য বাদ ফজর এবং বাদ মাগরিব তিনবার করে  
সূরায়ে ইখলাস, ফালাক এবং সূরায়ে নাস পড়া অত্যন্ত উপকারী।

## বিরোধীদেরকে দমনের আমল

প্রত্যেক নামাযের পর ১৩ বার-

اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُمْ بِمَا شِئْتَ- اللَّهُمَّ إِنِّي اجْعَلْكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَاعْزُدْ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

## বিবাহের জন্য আমল

ভাল পরিবারে তড়িৎ বিবাহের জন্য মাতা-পিতা অথবা কোন মুরুব্বী আগে পরে ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করে ১১০০ বার এই দু'আ পড়বে (يَا لَطِيفُ يَا دَوُدُ)। আর আগে ১১ বার দুরুদ পাঠ করে ছেলে/মেয়ে ১১০০ বার পড়বে (يَا جَامِعُ)।

## পেরেশানী দূর করার আমল

দুনিয়া আসলে চিন্তা এবং পেরেশানীর নাম। দুনিয়ায় যারা বসবাস করে তাদের কোন না কোন ব্যাপারে পেরেশানীতে পড়তেই হয়। তাই সর্বাবস্থায় পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা অনর্থক। তাই পেরেশানী দেখা দিলে অধৈর্য না হওয়া, অস্থির না হওয়া। এর তরীকা দুইটি-

ক. এই মনে করা যে, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। যা কিছু ঘটে তাঁরই হুকুমে ঘটে। তাঁর হুকুম ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না।

খ. এই মনে করা যে আল্লাহ পাক হিকমতওয়ালা, তাঁর কোন কাজ হিকমত বিহীন হয় না। তাঁর কাজের অন্তরালে গভীর রহস্য-তাৎপর্য নিহিত থাকে, যা বান্দার জন্য অবগত হওয়ার হুকুমও নেই, প্রয়োজনও নেই। বর্ণিত দু'টি বিষয় বারবার চিন্তা করা উচিত, যাতে একটু চিন্তা ভাবনা করলেই মনে এই বিষয় দু'টির উদয় সহজেই হয়। এছাড়া নিম্ন বর্ণিত আমলসমূহ করা।

(১) অধিক পরিমাণে নফল নামায আদায় করা।

(২) উঠা-বসা, চলা-ফেরা সর্বাবস্থায় অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকা। নির্দিষ্ট সময়, পরিমাণ অথবা কোন নির্ধারিত যিকিরের প্রতি খেয়াল রাখবে না। যখন যে যিকির মনে আসে তাই করা। যেমন- (سُبْحَانَ اللَّهِ) (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

(৩) সর্বদা আখিরাতের ছাওয়াবের প্রতি ধ্যান রাখা, যেমন-যদি কোন সন্তানের মৃত্যু হয়, তাহলে সে আখিরাতে শাফা'আত করবে-এই মনে করে ধৈর্য ধারণ করা।

(৪) কারো মৃত্যুর সময় যে প্রিয় পাত্র জীবিত আছে, তার প্রতি মনকে নিয়োজিত রাখা।

(৫) অধিক পরিমাণে (يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ) পড়া। রাত দিন কমপক্ষে পাঁচশত বার এবং বৈঠকে একশত বার অবশ্যই পড়া।

(৬) “তাবলীগ দীন” কিতাবের সবর, শুকর এবং তাফতীজ সম্পর্কীয় অধ্যায় পড়া-শুনা করা।

(৭) আল্লাহ এবং আল্লাহওয়ালাদের অথবা নেক মুসলমানদের সাহচর্য অবলম্বন করা। তাদের সাথে ওঠাবসা করা। যদি সাহচর্য অবলম্বনে সুযোগ না হয় তাহলে তাদের মাওয়ায়েয ও মালফূযাত (জীবন ও কর্ম সম্পর্কীয় বই) পড়াশুনা করা।

(৮) জায়াউল আমল এবং হায়াতুল মুসলিমীন রুহ নং ২৩ নিজে পড়া এবং পরিবারের অন্যান্য লোকজনকে পড়ে শুনানো।

### রিযিকের বরকতের জন্য আমল

নিজে অথবা পরিবারের লোকজন দ্বারা দৈনিক ১১ বার (يَا مُغْنِي) পড়বে এবং পড়াবে।

### হিফাজতের আমল

\* নিজের এবং পরিবারের হিফাজতের জন্য সূরায়ে ইখলাস, ফালাক এবং নাস বিসমিল্লাহ সহ তিন তিনবার করে বাদ ফজর এবং বাদ মাগরিব নিজেও পড়বে এবং পরিবারে লোকজনদেরকেও পড়তে বলবে।

\* ফরজ নামায আদায় করে যদি নফল নামায পড়ার সময় হয় তাহলে দুই রাকা‘আত নফল নামায আদায় করে অত্যন্ত একাগ্রতা এবং তাওয়াজ্জুর সাথে মুনাযাত করা। এ নামাযকে ফিক্‌হের পরিভাষায় সালাতুল হাজত বলে। এ সালাতুল হাজত গুরুত্বের সাথে আদায় করা চাই।

\* পরিবারের মধ্যে যারা নামাযের পাবন্দী করে না, তাদেরকে নামাযের পাবন্দীর জন্য তাকীদ করতে থাকা।

আল্লাহপাক সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা, দয়াময়, করুণাময়, সাহায্যকারী, অভিভাবক, পরাক্রমশালী, কারীম, মালিক, হাকীম। তাঁর কোন কাজ হিকমত বিহীন হয় না একথা বারবার গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে।

## উনবিংশ অধ্যায়

### শরী‘আতের দৃষ্টিতে বেচা-কেনা

ব্যবসা-বাণিজ্য মানব জীবনের প্রয়োজনীয় এক অধ্যায়। জীবনের বহুবিধ প্রয়োজনের সব কিছুই একজনের পক্ষে নিজে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। বিধায়

পরস্পরের প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই ব্যবসার পথে অগ্রসর হতে হয়। বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্য জীবন-জীবিকা লাভের অন্যতম এক উপায়। মহান আল্লাহ তা‘আলা এর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য নামায সমাপনান্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়তে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা জুম‘আঃ:১০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন নিজে ব্যবসা করেছেন, তেমন এর গুরুত্ব বুঝাতে ইরশাদ করেছেনঃ সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা ক্রিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে। (তিরমিযী হাঃ নং ১২০৯)

তবে ইসলাম ব্যবসা বাণিজ্যের ভিত্তি রেখেছে পারস্পরিক সহযোগীতার উপর। তাই প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে এ ধরনের মন-মানসিকতা থাকা একান্ত জরুরী। তাহলেই এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান এবং নীতিমালা মেনে নেওয়া সহজ হয়।

সাথে সাথে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার যে, নামায, রোযা, হজ্ব যাকাত ইত্যাদি বিষয়ের বিধি-বিধান জেনে নেয়া যেমন ফরয, তেমন মাসআলা-মাসাইল জেনে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করাও আবশ্যিক। এ ফরযের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করলে হারাম এবং সূদী কারবারে জড়িত হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা থাকে। যেমনটি বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও দেখা যায়। অথচ কুরআন-হাদীসে সুদখোর ব্যক্তির ব্যাপারে অনেক ধমকী এবং শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ২৭৯) এজন্য এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া একান্ত জরুরী।

বেচা-কেনার সংজ্ঞা: বেচা-কেনা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা ও তিজারত এগুলো সমার্থক শব্দ। সাধারণ অর্থে লাভের আশায় বৈধ পণ্যের লেন-দেনকে ব্যবসা ও তিজারত বলা হয়। যেমন ফিক্‌হের কিতাবে বলা হয়েছে, مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالْإِضَاحِ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুই পক্ষের পূর্ণ সম্মতিক্রমে মুদ্রা কিংবা বৈধ পণ্যের বিনিময়ে বৈধ পণ্যের হস্তান্তরকে ইসলামী শরী‘আতে বেচা-কেনা বলে। হিদায়া-টিকাঃ ৩/১৮

সুতরাং বেচা-কেনা শরীয়ত সম্মত উপায়ে সংঘটিত হওয়ার জন্য মোট ৩টি জিনিষ পাওয়া যেতে হবে।

১. বৈধ মাল হতে হবেঃ মাল না হলে তা বিক্রি করা বা খরীদ করা জাযিয় হবে না। যেমনঃ শুকর, রক্ত, মদ, গান-বাদ্যের যন্ত্র, সিনেমার বা নৃত্য অনুষ্ঠানের টিকেট ইত্যাদি। এগুলো শরী‘আতের দৃষ্টিতে মাল নয়, তাই এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় হারাম।

২. পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হতে হবেঃ দোকানদার ক্রেতাকে বললোঃ এটা নগদ নিলে এত দাম, আর বাকী নিলে এত দাম। এখন যদি ক্রেতা শুধু বলেঃ ঠিক আছে। কিন্তু উভয়টির কোনটা নির্দিষ্ট করল না। তাহলে এ বেচা-কেনা জায়িয় হবে না। বরং এটা সূদী কারবারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. উভয় পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পাওয়া যেতে হবেঃ অনেকে গায়ের জোরে নির্ধারিত মূল্য থেকে কম মূল্যে জিনিস ক্রয় করে। এটা হালাল হবে না। অনেক সময় একতরফা মূল্য নির্ধারিত করা হয়। যার প্রতি অন্য পক্ষের সম্মতি থাকে না। এটাও জায়িয় নেই।

### বেচা-কেনার প্রকারভেদ

বেচা-কেনা মোট চার প্রকার। যথাঃ

১. পণ্যের বিনিময়ে পণ্য (বাইয়ে মুকায়াযাহ)
২. মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য (সাধারণ বিক্রি)
৩. মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা (বাইয়ে সরফ)
৪. নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকী পণ্য ত্রয় (বাইয়ে সালাম)

**শর'ই হুকুমঃ** প্রথম প্রকারে যদি উভয়টির (جنس) তথা জাত এবং (قدر) তথা পরিমাপ পদ্ধতির দিক দিয়ে এক হয়। যেমনঃ ধানের বিনিময়ে ধান বিক্রি করা- তাহলে নগদা-নগদী বিক্রি করতে হবে। এবং উভয়ের মধ্যে পরিমাণের দিক দিয়ে সমতা রক্ষা করতে হবে। নতুবা জায়িয় হবে না। আর যদি উভয় দিক দিয়ে ভিন্ন হয় অর্থাৎ, উভয়টির জাত ভিন্ন এবং পরিমাপ পদ্ধতিও ভিন্ন হয় যেমনঃ ধানের বিনিময়ে পাট বিক্রি করা-তাহলে পরিমাণে কম-বেশী করে বেচাও জায়িয় হবে। এবং বাকীতে বেচাও জায়িয় হবে। আর যদি উভয় দিকের এক দিক দিয়ে ভিন্ন হয় অপর দিক দিয়ে এক হয়- যেমনঃ ধান এবং গম উভয়টির জাত ভিন্ন কিন্তু পরিমাপ পদ্ধতি অভিন্ন- তাহলে কম-বেশীতে বিক্রি জায়িয় হবে। কিন্তু বাকীতে বিক্রি করা জায়িয় হবে না।

আর দ্বিতীয় প্রকারে (সাধারণ বিক্রিতে) নগদ-বাকী উভয় ভাবেই বিক্রি জায়িয়। তৃতীয় প্রকারে (মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার বিক্রয়) উভয়টি এক দেশী হলে কম-বেশী এবং বাকী কোনটিই জায়িয় নেই। (হিদায়াঃ৩/৭৯)

আর চতুর্থ প্রকারে তথা বাইয়ে সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত আছে। যেমনঃ

ক. নগদ কত টাকার বিনিময়ে কি পণ্য দেয়া হবে তার জাত নির্ণয় করা।

খ. উক্ত পণ্যের প্রকার বা ধরণ বর্ণনা করা।

গ. গুণাগুণ বর্ণনা করা। অর্থাৎ, উন্নত মানের না মাঝারী ধরনের কিংবা নিম্ন মানের পণ্য হবে তা বর্ণনা করা।



ঘ.মালের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।

ঙ. পণ্য কোন দিন, কোন সময়, কোথায় হস্তান্তর করা হবে তা নির্দিষ্ট করা।

চ. যে পণ্যে বাইয়ে সালাম হবে সে মালটি লেন-দেনের দিন থেকে পরিশোধের দিন পর্যন্ত বাজারে মজুদ থাকা।

উল্লেখিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে বাইয়ে সালাম জাযিয় হবে। অন্যথায় নয় এবং এই শর্তগুলো চুক্তিনামার মধ্যে লিখিত থাকতে হবে। (হিদায়াঃ ৩/৯৫)

### বেচা-কেনার মূলনীতি

১. লেন-দেন কারীদের মাঝে অবশ্যেই লেন-দেনের যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ, তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক না হলেও লেন-দেনের বুঝ রাখে এমন সুস্থ মস্তিষ্ক, স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। (দুররে মুখতারঃ ৪/৫০৪)

২. ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্বাচিত পণ্যের মাঝে অবশ্যেই পণ্য হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। পণ্য হওয়ার যোগ্য না হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যেমনঃ

ক. দ্রব্যটি বেশী সম্মানিত হওয়া, যেমনঃ মানুষ এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

খ. বেশী ঘৃণ্য হওয়া। যেমন শুকর ইত্যাদি।

গ. শরীয়ত কর্তৃক তার ভোগ ব্যবহার হারাম হওয়া। যেমনঃ শরাব, মাদক দ্রব্য, মৃত প্রাণী ইত্যাদি। (দুররে মুখতারঃ ৪/৫০৬)

৩. পণ্য হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। সুতরাং আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা এবং নদী বা পুকুরের পানির ভিতরে মাছ বিক্রি করা জাযিয় নেই। (হিদায়াঃ ৩/৫১)

৪. বিক্রেতার নিকট পণ্য উপস্থিত থাকতে হবে। সুতরাং বর্তমানে যে বিদেশ থেকে মাল আমদানি করে তা আনার আগেই উক্ত মালের ডকুমেন্ট বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা আবার আরেক জনের নিকট বিক্রি করে দেয়। এভাবে মাল আসার আগেই কয়েকবার বিক্রি হয়ে যায় এটা জাযিয় নেই। (হিদায়াঃ ৩/৫১)

৫. পণ্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা থাকতে হবে। (হিদায়াঃ ৩/৫১)

৬. উক্ত মাল হারাম উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট না হতে হবে। যেমনঃ টি ভি, ভি সি আর, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। (হেদায়াঃ ৪/৫৪)

৭. মালের মূল্য নির্ধারিত হতে হবে। মূল্য অস্পষ্ট থাকলে বেচা-কেনা বৈধ হবে না। যেমন বললোঃ এ মালটা নিয়ে যান ইনসাফ করে দাম দিয়ে দিবেন। কেননা এ ধরনের অস্পষ্টতা পরিণামে আত্ম-কলহ ও ঝগড়া-বিবাদের কারণ হয়। (হিদায়াঃ ৩/৫৪)

৮. বেচা-কেনার চুক্তিতে এমন কোন শর্ত জুড়ে দেওয়া যাবে না যা উক্ত পণ্যের বেচা-কেনার চুক্তির সাথে স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। যেমনঃ বর্তমানে “মাল্টিলেভেল মার্কেটিং” ব্যবসার মধ্যে দালালী শর্ত করা হয়। অথবা বলা হল যে, বাড়িটি বিক্রি করলাম কিন্তু এক মাস আমাকে থাকতে দিতে হবে। কিংবা বলা হল যে, আমাদের থেকে এত টাকার মাল কিনতে হবে। এবং আরো দুজন গ্রাহক সংগ্রহ করতে হবে। (হিদায়াঃ৩/৫৯)

৯. এমন কোন চুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয় যেখানে এক পক্ষের নিশ্চিত লাভের ও অপর পক্ষের নিশ্চিত ক্ষতির শর্ত সংশ্লিষ্ট থাকে। যেমনঃ জুয়া, হাজী, লটারী ইত্যাদি। (হিদায়াঃ ৩/৫৪)

১০. বেচা-কেনায় কোনরূপ ধোঁকা, প্রতারণা, জালিয়াতী, ফটকাবাজী ও ভেজাল থাকতে পারবে না এবং এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না যার দ্বারা সাধারণ ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (হিদায়াঃ৩/৫২)

১১. যে মাল জমা রাখলে জনগণের কষ্ট হয় তা জমা রাখা জাযিয় নেই। শরীয়াতের পরিভাষায় একে ইহতেকার বা মুজুতদারী বলে। (হিদায়াঃ৪/৪৬৮)

এছাড়াও আরো অনেক নীতিগত বিষয় আছে যা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নেওয়া আবশ্যিক। উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে ব্যবসার নামে অবাধ শোষণ, অন্যায় আত্মসাৎ, দ্রব্যে ভেজাল, মাপে কম দেয়া, ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন, মুজুতদারী ও কালো বাজারীর মাধ্যমে বাড়তি মূল্য আদায় বা পর্যাপ্ত মাল থাকা সত্ত্বেও তা আটকে রেখে বাজার মূল্য বৃদ্ধি করা, কিংবা কাউকে বেকায়দায় ফেলে ক্রয়-বিক্রয়ে বাধ্য করা, অথবা কারো বিপদের সুযোগে তার থেকে অধিক হারে লাভবান হওয়ার মানসে ক্রয় বিক্রয় করা, পণ্যের উপর এক চেটিয়া দখল সৃষ্টি করে বাড়তি মূল্যে বিক্রি করা ইত্যাদি ধরনের বেচা-কেনা শরী‘আতের দৃষ্টিতে নাজাযিয় এবং অবৈধ ও হারাম। এবং এর দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল নয়। এধরনের অর্থ দ্বারা হজ্ব ও উমরা করা, মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করার দ্বারা উক্ত হারাম পয়সার দায় থেকে আল্লাহর দরবারে রেহাই পাওয়া যাবে না। বরং এর জন্য হুক্কানী মুফতীদের নিকট থেকে শরী‘আতের বিধান জেনে সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এবং খালিস দিলে তাওবা-ইস্তিগফার করলে আল্লাহ তা‘আলার আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়।

**বেচা-কেনার প্রচলিত কয়েকটি সূরত এবং তার শর‘ই বিধান**

১. বীজ ধানের বিক্রিঃ আমাদের সমাজে সাধারণ ধান দিয়ে বীজ ধান নেওয়া হয় কমবেশী করে। শরী‘আতের দৃষ্টিতে এটা নাজাযিয়। এর থেকে বাঁচার উপায়

হলঃ প্রথমে টাকা দিয়ে বীজ ধান কিনবে। এরপর বীজ ধানের বিক্রেতা ঐ টাকা দিয়ে সাধারণ ধান কিনবে। (হিদায়াঃ৩/১০৪)

২. আর একটা ব্যবসা হল টাকা পয়সার বেচা-কেনা, টাকা ভাঙ্গানো, ছেড়া টাকা দিয়ে ভাল টাকা নেওয়া। এগুলোকে বাইউস্ সরফ বলে। এখানে সাধারণভাবে কমবেশী করা জায়য নেই। এবং কোন পক্ষ বাকী রেখে লেন-দেন করাও জায়য নেই। প্রয়োজনে করজ নেয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপ ৫০০ টাকার খুচরা করার প্রয়োজন। কিন্তু অপর পক্ষের নিকট ঐ পরিমাণ নিবে না। বরং ৩০০ টাকার খুচরা আছে। তখন খুচরা হিসাবে ৩০০ টাকা রাখবে। পরে এক সময় ঐ ৩০০ টাকার করজ পরিশোধ করে আমানতের ৫০০ টাকা নিয়ে আসবে। (হিদায়াঃ৩/১০৪)

৩. গ্রাম থেকে আগত ব্যক্তির কাছ থেকে কম দামে মাল ক্রয় করে শহরের লোকদের নিকট অতিবেশী দামে বিক্রি করা। এর দরুন যদি গ্রামের বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা শহরের লোকদের কষ্ট হয়। এটাও নাজায়য। (হিদায়াঃ৩/৬৭)

৪. শহরের ব্যবসায়ী গ্রামের ব্যবসায়ীর দালাল হয়ে তার মাল শহরের লোকদের নিকট বেশী দামে বিক্রি করা। এটাও নাজায়য। (হিদায়াঃ ৩/৬৭)

## বিংশ অধ্যায়

### হুক্কুল ইবাদ

পিতা-মাতার হক জানা এবং সন্তানের তা পালন করা একান্ত কর্তব্য। পিতা-মাতার হক ১৪টি। জীবিত অবস্থায় ৭টি, মৃত্যুর পরে ৭টি।

#### জীবিত অবস্থায় ৭টিঃ

১. পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। ২. মনে প্রাণে মহব্বত করা। ৩. সর্বদা তাদেরকে মেনে চলা। ৪. তাদের খিদমত করা। ৫. তাদের প্রয়োজন পূরা করা। ৬. সর্বদা তাদের আরাম পৌঁছানোর চিন্তা-ভাবনা করা। ৭. নিয়মিত তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা।

#### মৃত্যুর পর ৭টিঃ

১. তাদের মাগফিরাতের জন্য দু‘আ করা। ২. সাওয়াব রেসানী করা। ৩. তাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মান করা। ৪. তাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য-সহায়তা করা। ৫. ঋণ পরিশোধ ও আমানত আদায় করা। ৬. তাদের শরীয়তসম্মত অসীয়াত পূর্ণ করা। ৭. মাঝে মাঝে তাদের কবর যিয়ারত করা।

## পিতা মাতার দায়িত্বে সন্তানের হক

সন্তানের দায়িত্বে যেমন মা-বাপের হক রয়েছে তেমনি মা-বাপের দায়িত্বেও সন্তানের কিছু হক রয়েছে, যেমন-

১. সতী সাধ্বী ও চরিত্রবান মহিলাকে বিবাহ করা যাতে তার গর্ভে সুসন্তান জন্ম লাভ করে।

২. শিশুকালে যত্ন ও স্নেহ মমতার সাথে সন্তানদেরকে লালন-পালন করা। এর অনেক ফযীলত রয়েছে।

বিশেষতঃ কন্যা সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে মনে কোন সংকোচ দেখা না দেয়া। কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফযীলত অপরিসীম। ধাত্রীর দুধপান করাতে হলে চরিত্রবান ও দীনদার ধাত্রী খুঁজে নেওয়া। কেননা শিশুর চরিত্র গঠনে দুধের প্রভাব অবশ্যই পড়ে থাকে।

৩. দীনী ইলম ও আদব শিক্ষা দেওয়া।

৪. বিবাহের বয়স হলে অবিলম্বে বিবাহ দেওয়া। বিবাহিতা কন্যার যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে দ্বিতীয় বিবাহ হওয়া পর্যন্ত নিজের ঘরে তাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা।

## স্বামী-স্ত্রীর হক

### স্বামীর দায়িত্বে স্ত্রীর হক হলো

১. সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর খোরপোষ দিতে অবহেলা না করা।

২. স্ত্রীকে দীনী মাসআলা-মাসায়েল শিখাতে থাকা এবং নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকা।

৩. মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেয়া এবং তাদের অসাবধানতা ও বুদ্ধিমত্তার অভাবে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে ধৈর্য্য ধারণ করা। কখনো শাসন ও সংশোধনের প্রয়োজন হলে ভারসাম্য রক্ষা করা।

### স্ত্রীর দায়িত্বে স্বামীর হক

১. যথাযথভাবে স্বামীর আনুগত্য করা, আদব, খেদমত, মন জয় ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। তবে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হলে এত অপারগতা প্রকাশ করবে।

২. স্বামীর সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন চাপ সৃষ্টি না করা।

৩. অনুমতি ছাড়া স্বামীর সম্পদ ব্যয় না করা।

৪. স্বামীর আত্মীয় ও আপনজনদের সাথে এমন ব্যবহার না করা যাতে তার মনে কষ্ট হয়। বিশেষতঃ স্বামীর মা-বাপকে শ্রদ্ধা ও সেবার পাত্র মনে করে যথাসম্ভব শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সেবা করা।

## একবিংশ অধ্যায়

### বিবাহ-শাদীর প্রচলিত ভুলসমূহ

বিবাহ-শাদী মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা মহান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে বিশেষ নে‘আমত হিসাবে দান করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিবাহ-শাদী দুনিয়াবী কাজ বা মুবাহ মনে হলেও যথা নিয়মে সুন্নাত তরীকায় যদি তা সম্পাদন করা হয় তাহলে সেটা বরকতপূর্ণ ইবাদত ও অনেকে সওয়াবের কাজ হয়। এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিবাহ-শাদী সুন্নত তরীকায় তো হয়ই না। উপরন্তু এটা বিভিন্ন ধরনের কুপ্রথা এবং বড় বড় অনেক গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পারিবারিক জীবনে অশান্তির ঝড় বয়ে চলছে। এজন্য নিম্নে বিবাহ-শাদী সম্পর্কিত কিছু ভুল এবং কুপ্রথা তুলে ধারা হল। যাতে এগুলো থেকে বাঁচা হয়।

### বিবাহের পূর্বের ভুলসমূহ

১. বিবাহ শাদী যেহেতু ইবাদত, সুতরাং এখানে দীনদারীকে প্রাধান্য দিতে হবে। দুনিয়াদারগণ সৌন্দর্য, মাল, দৌলত ও খান্দানকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এটা রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত হওয়ায় শাস্তি বয়ে আনে না।

২. কোন কোন জায়গায় অভিভাবক এবং সাক্ষী ছাড়া শুধু বর কনের পরস্পরের সম্মুখিতাই বিবাহের প্রচলন আছে। অথচ এভাবে বিবাহ বিশুদ্ধ হয় না। বরং এটি যিনা-ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও যদি মেয়ে পক্ষের অভিভাবকের সম্মতি না থাকে, আর ছেলে সে মেয়ের “কুফু” তথা দীনদারী মালদারী ও পেশাগত দিক থেকে সামঞ্জস্যশীল না হয় তাহলে সে বিবাহও শুদ্ধ হয় না।

৩. কেউ কেউ ধারণা করে যে মাসিক চলাকালীন সময় বিবাহ শুদ্ধ হয় না। অথচ এ অবস্থায়ও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এ অবস্থায় সহবাস জাযিয় নেই।

৪. কেউ কেউ ধারণা করে যে মুরীদনীর সাথে পীর সাহেবের বিবাহ জাযিয় নেই। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ সকলেই তাঁর মুরীদনী ছিলেন।

৫. অনেকে অনেক বয়স হওয়ার পরও বিবাহ করে না কিংবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর বা সে মৃত্যু বরণ করার পর আর ২য় বিবাহ করে না।

অথচ শারীরিক বিবেচনায় তার বিবাহ করা জরুরী ছিল। এ অবস্থায় থাকা মানে যিনা-ব্যভিচারে জড়িত হওয়ার রাস্তা খুলে দেয়া।

৬. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় (উদাহরণ স্বরূপ) ৬০ বছরের বয়স্ক লোক অল্প বয়সী যুবতী মেয়েকে বিবাহ করে বসে। ফলে ঐ মেয়ে নিশ্চিত জুলুমের শিকার হয়।

৭. অনেকে স্ত্রীর খেদমতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দুর্বলতা লুকিয়ে লোক দেখানোর জন্য বিয়ে করে স্ত্রীর জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এটা মারাত্মক গুনাহের কাজ।

৮. কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত লোক আধুনিক শিক্ষা তথা ডাক্তারি প্রফেসারি ইত্যাদি ডিগ্রি দেখে মেয়ে বিয়ে করে। তাদের ভাবা উচিত বিয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য কী? যদি তার স্ত্রীর দ্বারা টাকা কামানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা তো বড় লজ্জাজনক কথা যে, পুরুষ হয়ে মহিলাদের কামাইয়ের আশায় বসে থাকবে। মনে রাখতে হবে এধরণের পরিবারে শান্তি আসে না।

৯. কেউ কেউ পালক পুত্রের তালুক দেয়া স্ত্রী বিবাহ করাকে না জায়িয় মনে করে। এটা জাহিলী যুগের বদ-রসম।

১০. কেউ কেউ বিধবা মহিলাদের বিবাহ করাকে অপছন্দ করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ স্ত্রী বিধবা ছিলেন। (বুখারী হাঃ নং ৫০৭৭)

### **বিবাহের সময়ের ভুলসমূহ**

#### **বর পক্ষের ভুলসমূহ**

১. বিবাহ শাদী যেহেতু ইবাদত, সুতরাং বিবাহকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার গুনাহ না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে খায়ের বরকত লাভ হবে। যদি বিবাহকে গুনাহ মুক্ত করা না যায় তাহলে সেখানে অশান্তি হওয়া নিশ্চিত। ২. প্রথাগতভাবে অনেক লোকের বর যাত্রী হিসেবে যাওয়া। ৩. দাওয়াতকৃত সংখ্যার অধিক লোক নিয়ে যাওয়া। ৪. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কন্যার জন্য যৌতুক পাঠানো এবং এটাকে জরুরী মনে করা। ৫. গায়ের মাহরাম পুরুষ দ্বারা মেয়ের ইজেন বা অনুমতি আনা। ৬. বেগানা পুরুষদের কন্যার মুখ দেখা এবং দেখানো। ৭. নাচ-গান, বাজনা ইত্যাদি করা। ৮. সালামী গ্রহণ করা। ৯. মোহরানা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পূর্বেই না করা, বরং করাকে দোষ মনে করা। অতঃপর বিবাহের সময় তর্ক-বিতর্ক করা। ১০. লোক দেখানোর জন্য বা গর্বের সাথে ওলীমা করা। ১১. মোহরানার বিষয়ে গুরুত্ব না দেয়া এবং মোহরানা আদায়ে গাফলতী করা। ১২. ইচ্ছাকৃত এমন কর্মকাণ্ড করা যে কারণে কোন পক্ষের অদূরদর্শিতা প্রমাণিত হয় অথবা তাদের অস্তিত্বের কারণ হয়। আর

নিজেদের সুনাম প্রকাশ পায়। ১৩. বিবাহ অনুষ্ঠানের কারণে ফরয ওয়াজিবসহ শরী‘আতের বিধানের ব্যাপারে উদাসীনতা এবং অনীহা প্রকাশ করা।

### কন্যা পক্ষের ভুলসমূহ

১. বর যাত্রার চাহিদা। ২. ছেলের জন্য উপটোকন/যৌতুক প্রকাশ্যে পাঠানো, পাঠানোকে পছন্দ করা এবং জরুরী মনে করা। ৩. আত্মীয়-স্বজন মহল্লাবাসীদের জন্য প্রথাগত দাওয়াত এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা। ৪. বিবাহের সরঞ্জাম, অলংকারাদী প্রকাশ্যে দেখা এবং অন্যদেরকে দেখানো। ৫. বিবাহের পর রসম হিসাবে জামাতাকে শরবত পান করানো। ৬. বেগানা মহিলারা জামাতার সামনে আসা। ৭. সালামী গ্রহণ করা। এটাকে জরুরী মনে করা এবং নেয়া দেয়া। ৮. যাতে মহল্লায় খুব প্রসিদ্ধ হয় সে জন্যে ইচ্ছাকৃত কোন কিছু করা। ৯. ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন হওয়া। এছাড়াও বিবাহ উপলক্ষে অনেক বেপর্দা, যুবক যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা, অপব্যয়, ছবি এবং ভিডিও ইত্যাদি করা হয়, যাতে বিবাহের সকল খায়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

### বিবাহের কিছু কুপ্রথা

১. মেয়ের ইযিন আনার জন্য ছেলেপক্ষ স্বাক্ষী পাঠিয়ে থাকে, শরী‘আতের দৃষ্টিতে এর কোন প্রয়োজন নেই।  
২. বিবাহের সময় অনেকে বর-কনের দ্বারা তিনবার করে ইজাব কবুল পাঠ করিয়ে থাকে এবং পরে তাদের দ্বারা আমীন বলানো হয়। শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই।  
৩. ইজাব কবুলের মাধ্যমে আকদ সম্পাদন হওয়ার পর মজলিসে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে সামনে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে বর যে সালাম করে থাকে তারও কোন ভিত্তি নেই।  
৪. ঝগড়া-ফাসাদের আশংকা থাকা সত্ত্বেও খেজুর ছিটানোকে জরুরী মনে করা হয়। অথচ এ সম্পর্কিত হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম যঈফ বলেছেন।

### বিবাহ শাদীর আরো কতিপয় কুসংস্কার

১. অনেক জায়গায় বিবাহ রওয়ানা হওয়ার আগে এলাকার প্রসিদ্ধ মাযার যিয়ারত করে তারপর রওয়ানা হয়। শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই।  
২. বরের নিকট কনে পক্ষের লোকেরা হাত ধোয়ানোর টাকা, পান পাত্রের পানের সাথে টাকা দিয়ে তার থেকে কয়েকগুণ বেশী টাকা জোর যবরদস্তী করে আদায় করে থাকে। এটা না জায়িয।



৩. অনেক জায়গায় গেট সাজিয়ে সেখানে বরকে আটকে দেয়া হয় এবং টাকা না দেয়া পর্যন্ত ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। এটাও একটা গর্হিত কাজ।

৪. খাওয়া দাওয়া শেষে কনে পক্ষের লোকেরা বরের হাত ধোয়ায়। পরে হাত ধোয়ানো বাবদ টাকা দাবী করে। অনেক জায়গায় এ নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। এটা একেবারেই অনুচিত। মূলতঃ এসব হিন্দুয়ানী প্রথা। দীর্ঘ দিন যাবত হিন্দুদের সাথে বসবাস করার কারণে আমাদের মধ্যে এই কুসংস্কারগুলি অনুপ্রবেশ করেছে।

৫. বিবাহ পড়ানোর আগে বা পরে যৌতুকের বিভিন্ন জিনিস-পত্র প্রকাশ্য মজলিসে সকলের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এটাও অন্যায় ও নির্লজ্জতার কাজ।

৬. বিবাহের পরে নারী-পুরুষ সকলের সামনে কনের পিতা বা মাতা জামাই-মেয়ের হাত একসাথে করে তাদেরকে দু'আ দেয়। কনের পিতা জামাইকে বলে “আমার মেয়েকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম, তুমি এক দেখে গুনে রেখ” এর কোন ভিত্তি শরী‘আতে নেই।

৭. বিবাহ করে আনার পর শ্বশুর বাড়ীতে নববধূকে বিভিন্ন কায়দায় বরণ করা হয়। কোথাও ধান, দুবলা ঘাস, দুধের স্বর ইত্যাদি দিয়ে বরণ করা হয় এবং নববধূর চেহারা সকলকে দেখানো হয়; এসবই হিন্দুয়ানী প্রথা। কোন মুসলমানের জন্য এসব করা জাযিয় নেই।

৮. অনেক জায়গায় মেয়ের বিয়ের আগের দিন আর কোথাও মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার পরের দিন মেয়ের বাড়ী থেকে ছেলের বাড়ীতে মাছ-মিষ্টি ইত্যাদি পাঠানো হয়ে থাকে। কোথাও এটাকে চৌথি বলা হয়। এটাও বিজাতীয় নাজাযিয় প্রথা।

৯. বর বা কনেকে কোলে করে গাড়ী বা পালকী থেকে নামিয়ে ঘরে তোলাও চরম অভদ্রতা বৈই কিছু নয়।

১০. ঈদের সময় বা অন্য কোন মৌসুমে মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে চাল, আটা, ময়দা, পিঠা ইত্যাদি পাঠানো এবং এ প্রচলনকে জরুরী মনে করার প্রথা অনেক জায়গায় চালু আছে। আবার অনেক জায়গায় আনুষ্ঠানিকভাবে জামাইকে এবং তার ভাই-বোনদেরকে কাপড়-চোপড় দেয়ার প্রথা আছে। এমনকি এটাকে এতটাই জরুরী মনে করা হয় যে, ঋণ করে হলেও তা দিতে হয়। এটা শরী‘আতের সীমালঙ্ঘন ছাড়া আর কিছু নয়।

১১. আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠানে বেগানা মহিলাদের সাজ-সজ্জা করে নিজেকে বিকশিত করে একত্রিত হতে দেখা যায় এবং যুবক যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা করতেও দেখা যায়। এধরনের বেপর্দা আর বেহায়াপনার কারণে উক্ত মজলিসে উপস্থিত নারী পুরুষ সকলেই গুনাহগার হবে।

১২. বিবাহ উপলক্ষে গান-বাজনা, ভিডিও, ভিসিআর ইত্যাদি মহামারী আকার ধারণ করেছে। আর কোন কোন এলাকায় তো যুবতী তরুণী মেয়েরা একত্রিত হয়ে নাচ গানও করে থাকে। শরী‘আতের দৃষ্টিতে এসব হারাম ও নাজাযিয়।

১৩. আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠান মানেই গুনাহের ছড়াছড়ি। এমন এমন গুনাহ সেখানে সংঘটিত হয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছবি তোলা ও ভিডিও করা। শরী‘আতের দৃষ্টিতে কোন প্রাণীর ছবি তোলা চাই ক্যামেরার মাধ্যমে হোক কিংবা ভিডিও এর মাধ্যমে হোক বা অংকন করা হোক সবই হারাম।

১৪. বিবাহের পরে মেয়েকে উঠিয়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে মেয়ের বাড়ীতে পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা একত্রিত হয়, আর বরকে অন্দর মহলে এনে সকলে মিলে হৈ হুল্লা করে তার মুখ দর্শন করে। মেয়েরা হাসি মজাক করে বিভিন্ন উপায়ে নতুন ঢুলাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে। আর নির্লজ্জ হাসি তামাশায় মেতে উঠে। এধরনের বেপর্দেগী শরী‘আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।

১৫. অনেক জায়গায় প্রথা চালু আছে যে, নববধূকে বর নিজে বা তার ভগ্নীপতি অথবা তার ছোট ভাই পালকী বা গাড়ী থেকে নামিয়ে কোলে করে ঘরে নেয়। তারপর উপস্থিত মহল্লাবাসীর সামনে নববধূর মুখ খুলে দেখানো হয়। এ সকল কাজ হারাম এবং নাজাযিয়।

## একবিংশ অধ্যায় (২য় অংশ)

### জায়েয-নাজাযেয

### শরী‘আতের দৃষ্টিতে দাঁড়ি

শরী‘আতের দৃষ্টিতে পুরুষদের জন্য দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। দাঁড়ি মুভানো বা কেটে ছেঁতে নিজের হাতের এক মুষ্টির (চার আঙ্গুল পরিমাণের ছোট করা) কম করা হারাম-কবীরা গুনাহ ও গুনাহে জারিয়া। আর মোঁচ এতটুকু ছোট করা সুন্নাত যাতে উপরের ঠোঁটের কিনারা ছাফ থাকে। বড় বড় মোঁচ রাখা অমুসলিমদের তরীকা এবং মোঁচ একেবারে মুভানোও নিষেধ। (আদতুররুল মুখতার, ৫:২৮৮)

## দাঁড়ি রাখার ফায়দাসমূহ

১. দাঁড়ি রাখা শি'আরে ইসলাম অর্থাৎ, এর দ্বারা মুসলমানদের জাতীয় নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় এবং শরী'আতের হুকুম পূর্ণ করা হয়। (মুসলিম শরীফ হাঃ নং ৫৬,২৬১)
২. আল্লাহ তা'আলার খিলকাত ও সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যকে ঠিক রাখা হয়, পবিত্র কুরআনে যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (মুসলিম শরীফ হাঃ নং ৫৬,২৬১)
৩. মহিলাদের সামঞ্জস্যতা থেকে বাঁচা যায়।
৪. চোখের দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকে।
৫. ইমাম ও মুআযযিন হওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে।
৬. মুসলমানদের সম্মান ও সালাম পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়।
৭. চেহারার মধ্যে নূর চমকাতে থাকে ও চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।
৮. অনেক গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়। কারণ, দাঁড়িওয়ালা ব্যক্তিকে শয়তান সহজে অন্যায় কাজে লিপ্ত করতে পারে না। দাঁড়ির কারণে সে ব্যক্তি অবৈধ কাজে অংশগ্রহণ করতেও লজ্জা বোধ করে।
৯. শেভ করার অনর্থক সময় ও অর্থের অপচয় বন্ধ হয়।
১০. ওয়াজিব আদায়কারী হিসেবে দীনদার-পরহেজগার এ জাতীয় সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হয়।
১১. একজন মুমিন হিসেবে সহজে পরিচিত হওয়া যায়। নতুবা মুমিন ও কাফের পার্থক্য করা খুবই মুশকিল হয়ে যায়।
১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তর মুবারক খুশী করা হয়।
১৩. গুনাহে জারিয়া (তথা চলমান গুনাহ) হতে মুক্তি পাওয়া যায়।
১৪. পুরুষদের সৌন্দর্য হচ্ছে দাঁড়ি। কারণ, পুরুষ জাতি তো সিংহের ন্যায় বাহাদুর। আর সিংহের মুখের শোভা হল দাঁড়ি।
১৫. রাস্তা ঘাটে বা অপরিচিত স্থানে মারা গেলে মুসলমান হিসেবে তার গোসল ও কাফন-দাফন নসীব হয়।
১৬. কবরে মুনকার নাকীরের সুওয়াল-জওয়াব সহজ হয়।

১৭. এর দ্বারা হাশরের ময়দানে উম্মতে মুহাম্মাদী বলে চেনা সহজ হবে এবং হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশ লাভের উসীলা হবে।

### দাঁড়ি না রাখার ক্ষতিসমূহ

১. দাঁড়ি মুন্ডালে অথবা এক মুষ্টি থেকে ছোট করলে শি‘আরে ইসলাম তথা মুসলমানদের জাতীয় নিদর্শন এবং শরী‘আতের হুকুম তরক করা হয়। যা জায়েয নয়।

২. আল্লাহ তা‘আলার খিলকাত ও সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করা হয়। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫৮৮৬, মেরকাত ৮/২৭৯)

৩. পুরুষ জাতি মহিলাদের সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা শরী‘আতে হারাম।

৪. চোখের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

৫. সূরাহ-ক্বিরাআত সহীহ থাকলেও শরী‘আতে তার আযান, ইক্বামত ও ইমামতির যোগ্যতা থাকে না। কেননা যে দাঁড়ি এক মুষ্টির কম করে রাখে সে ফাসিক, আর ফাসিক ব্যক্তি ইমাম ও মুআযযিন হওয়ার যোগ্য নয়। (আদদুররুল মুখতার ১/৫৬৭)

৬. মুসলমানদের সম্মান ও সালাম পাওয়ার যোগ্য হয় না। কেননা ফাসিককে সালাম দেওয়া মাকরুহ। (ফাতাওয়ায় শামী ৬/৪১৫)

৭. চেহারার নূর চলে যায় এবং প্রকৃত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে পারস্যের দাঁড়িবিহীন দূতকে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখে চেহারা ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন যে, তোমার চেহারা এত বিশী বানাতে কে বলেছে? (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া ৪/২৯১)

তাছাড়া দাঁড়ি মুন্ডালে অল্প দিনেই তার দাঁড়ি পেকে সাদা হয়ে যায়। যার ফলে তখন তার দাঁড়ি রাখতে ইচ্ছা করলেও লজ্জার দরুন তা রাখা মুশকিল হয়।

৮. বিভিন্ন ধরনের গুনাহ থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে যায় এবং সহজে বিভিন্ন গুনাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়।

৯. শেভ করার মাধ্যমে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। যা স্পষ্ট নাজায়েয। (সূরায়ে বনী ইসরাঈল ২৬, ২৭)

১০. তার শরাফত বা বুয়ুগী নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ তাকে ফাসিক, পাপী ও নাকরমান ইত্যাদি বলে স্মরণ করে থাকে।

১১. ঐ ব্যক্তি মুমিন, নাকি কাফের? তা বুঝা যায় না এবং তার হকও আদায় করা যায় না।

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর মুবারকে আঘাত দেয়া হয়।

১৩. অন্যান্য গুনাহ একবার করলে তার বাহ্যিক আছর পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু দাঁড়ি না রাখলে সর্বদা গুনাহগার হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে।

১৪. পুরুষের সৌন্দর্যের বিকৃতি ঘটে এবং তার গান্ধীৰ্যতা শেষ হয়ে যায়।

১৫. দাঁড়িবিহীন লোক রাস্তা ঘাটে মারা গেলে তার গোসল, কাফন-দাফন নিয়ে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাকে শশ্মানে নেয়া হবে? নাকি গোরস্থানে নেয়া হবে? তা নির্ণয় করাও মুশকিল হয়ে যায়।

১৬. কবরে মুনকার-নাকীরের সুওয়াল-জওয়াব কঠিন হয়ে যাবে।

১৭. হাশরের ময়দানে উম্মতে মুহাম্মাদী বলে দাবী করা ও উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে পরিচয় দিয়ে শাফা‘আতের আশা করাও মুশকিল হবে।

### শরী‘আতের দৃষ্টিতে পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা হারাম

পুরুষদের জন্য টাখনু (পায়ের গিরা)-র নীচে জামা, পায়জামা, প্যান্ট, লুঙ্গি ইত্যাদি কাপড় পরা সর্বাবস্থায় (নামায কিংবা নামাযের বাইরে) হারাম। এ সম্পর্কে বহু হাদীস শরীফে কঠিন শাস্তির ধমকি বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন “লুঙ্গি বা কাপড়ের যে অংশটুকু টাখনুর নীচে থাকবে তা জাহান্নামে যাবে”। অর্থাৎ, পরিধানকারী এই অপরাধে জাহান্নামী সাব্যস্ত হবে। (বুখারী শরীফ হা: নং ৫৮৮৭)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন “আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন না, যে লুঙ্গি, কাপড় ইত্যাদি অহংকারবশতঃ টাখনুর নীচে পরিধান করে।” (বুখারী ২:৮৬১-৮৬৩, আবু দাউদ শরীফ ২:৫৬৬, ইবনে মাজাহ শরীফ ২৫৫)

উল্লেখ্য পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করাটাই অহংকার এর আলামত, চাই তার অন্তরে যাই থাকুক সুতরাং এ কথা বলা অনর্থক যে আমি টাখনুর নীচে কাপড় পরলেও আমার অন্তরে কোন অহংকার নেই। এটা সেই ভিত্তিহীন দাবীর অনুরূপ, যে আমি নামায না পড়লেও আমার ঈমান ঠিক আছে

অথচ হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কুফুরী কাজ করল।  
(মুসলিম শরীফ হা: নং ৮২, আবু দাউদ শরীফ হা: নং ৪৬৭৮)

টাখনুর নীচে সাধারণত: অহংকারী ব্যক্তির পোশাক পরিধান করে থাকে। এ হিসাবে কিছু সংখ্যক হাদীসে অহংকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অহংকার ব্যতীত টাখনুর নীচে কাপড় পরা যাবে। এ ব্যাপারে অনেক মানুষ ভুলের মধ্যে আছে। টাখনুর নীচে কাপড় পড়লে তার অন্তরে যাই থাকুক এর দ্বারা অহংকার প্রকাশ পায় তাই সর্ব অবস্থায় পুরুষদের জন্য টাখনুর নীচে একমাত্র মোজা ব্যতীত অন্য কোন পোশাক পরা হারাম।

হযরত আবু সাঈদ রাযি. বর্ণনা করেন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: মুমিনের কাপড় নিসফে সাক (অর্থাৎ, হাঁটু ও টাখনুর মধ্যবর্তী স্থান) পর্যন্ত, তবে নিসফে সাকের নীচে টাখনুর উপর পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরায় কোন অপরাধ নেই। (আবু দাউদ শরীফ হা: নং ৪০৯৩, ইবনে মাজাহ শরীফ হা: নং ৩৫৭৩)

তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম রাযি. থেকেও নিসফে সাকের নীচে টাখনুর উপর পর্যন্ত কাপড় পরিধান করা প্রমাণিত আছে। (বুখারী শরীফ হা: নং ৪৪২, মুসলিম শরীফ হা: নং ৪৩১)

সুতরাং, নিসফে সাক পর্যন্ত কাপড় পরিধান করা সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং টাখনুর উপর পর্যন্ত পরিধান করা জায়েযের সর্বশেষ সীমা, তবে এ অবস্থায় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যাতে সামান্য অসাবধানতার কারণে কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলে না যায়। প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব যে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানের উপর কায়ম থাকা এবং শরী‘আতের সীমা রেখা কোন অবস্থায় লঙ্ঘন না করা।

বি.দ্র: টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে প্যান্ট-পায়জামা ইত্যাদি পরা বিধর্মীদের শিক্ষা ও তাদের কৃষ্টি-কালচারের অন্তর্গত। এই ধরনের পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করলে, গায়ের কাওমের অনুসরণ হয়। যার দ্বারা আমাদের দীনি চেতনার অভাব প্রকাশ পায়। তাই মুসলমানদের এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা অতীব জরুরী। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:১২২, ইমদাদুল আহকাম ২:১৭৯, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২:১৪০, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭:২৮৪-২৮৮, তাক‘মিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৪:১২৩)

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

### শরী‘আতের দৃষ্টিতে পর্দা

পর্দা আল্লাহর বিধান, লঙ্ঘন করার উপায় নেই। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন: প্রতিটি প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে; তারপর যাকে দোষখ থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে হবে সফলকাম। বস্তুত পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। (সূরায় আলে ইমরান-১৮৫)

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের মধ্যে পর্দা অন্যতম। নারী ও পুরুষের যথাযথ অধিকার সংরক্ষণের জন্যই ইসলাম তাদের প্রতি পর্দার বিধান করেছে। পর্দার বিধান পালনের ফলে মানুষের অন্তর থাকে স্বচ্ছ ও পবিত্র। ফলে সমাজ থেকে অন্যায়, অপকর্ম লোপ পেয়ে সেখানে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে পর্দার বিধান লঙ্ঘনের কারণে সমাজে দেখা দেয় চরম বিপর্যয়, ধ্বংস হয় মানুষের দীন ও ঈমান। নারীরা হয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত। যুব সমাজ হারিয়ে ফেলে তাদের নৈতিক চরিত্র। সমাজ ও রাষ্ট্র হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। বর্তমান বাস্তব অবস্থা এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুতরাং আমাদের পর্দা সংক্রান্ত বিধান জেনে সে অনুযায়ী আমলে ব্রতী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই পুরুষ ও মহিলাগণ যাদের সাথে দেখা করতে পারবেন, তাদের একটি বিস্তারিত তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল। তালিকায় উল্লেখিত লোকদের ছাড়া অন্য সকলের সাথে পর্দা করা ফরয।

**পুরুষগণ নিম্নবর্ণিত ১৫ শ্রেণীর মহিলাগণের সাথে দেখা করতে পারবেন:**

১. স্ত্রী। (সূরা আহযাব-৫৫)
২. মা, দাদী, নানী, ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ।
৩. আপন মেয়ে এবং তার গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান।
৪. আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন এবং বৈপিত্রিয় বোন।
৫. ফুফু অর্থাৎ, পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রিয় বোন।
৬. খালা অর্থাৎ, মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রিয় বোন।
৭. ভাতিজী অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রিয় ভাইয়ের মেয়ে।
৮. ভাগ্নি অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রিয় বোনের মেয়ে।
৯. দুধ সম্পর্কীয় মা, দাদী, নানী, খালা, ফুফু ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ।
১০. দুধ বোন, দুধ বোনের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান।

১১. শাশুড়ি, আপন দাদী শাশুড়ি ও নানী শাশুড়ি এবং তাদের উর্ধ্বতন মহিলাগণ।

১২. যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান।

১৩. আপন ছেলের স্ত্রী, এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান। (সূরা নিসা-২৩)

১৪. যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা যার মাঝে পুরুষের প্রতি কোন প্রকার আকর্ষণ নেই।

১৫. অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমন মেয়ে যার মাঝে এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। (সূরা নূর-৬০)

**মহিলাগণ নিম্নবর্ণিত ১৫ শ্রেণীর পুরুষের সাথে দেখা করতে পারবেন**

১. স্বামী

২. পিতা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

৩. শ্বশুর, আপন দাদা ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

৪. আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান এবং আপন মেয়ের স্বামী।

৫. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

৬. আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্র্যেয় ভাই।

৭. ভতিজা অর্থাৎ, আপন ভাইয়ের ছেলে এবং বৈমাত্রেয় বৈপিত্র্যেয় ভাইয়ের ছেলে।

৮. ভাগ্নে অর্থাৎ, আপন বোনের ছেলে এবং বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্র্যেয় বোনের ছেলে।

৯. যৌনশক্তিহীন এমন বৃদ্ধা যার মাঝে মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

১০. এমন বালক যার মাঝে মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। (সূরা নূর-৩১)

১১. দুধ সম্পর্কীয় পিতা, দাদা, নানা, চাচা, মামা এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

১২. দুধ ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান।

১৩. দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, তার ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান। এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের স্বামী। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫০৯৯, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১১৪৪)



১৪. চাচা অর্থাৎ, বাপের আপন এবং বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রৈয় ভাই।

১৫. মামা অর্থাৎ, মায়ের আপন এবং বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রৈয় ভাই। (সূরা নিসা-২৩)

উপরোক্ত পুরুষ এবং মহিলাগণ যাদের সাথে দেখা করতে বা দেখা দিতে পারবে তারা ছাড়া অন্য সমস্ত পুরুষ এবং মহিলার জন্য একে অপরকে দেখা বা দেখা দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং হারাম।

গায়রে মাহরামের আসল চেহারা দেখা যেখানে হারাম, সেখানে নকল চেহারা দেখা জাযিয় হবে কিভাবে? অতএব টেলিভিশনের মাসআলাও এর দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে, “ পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম নারী দেখা আর নারীর জন্যে গায়রে মাহরাম পুরুষ দেখা সম্পূর্ণ হারাম”। তাছাড়া গায়রে মাহরাম আত্মীয়কে দেখা যেখানে হারাম, সেখানে অনাত্মীয় গায়রে মাহরাম টি, ভি তারকাদের দেখা কিভাবে জাযিয় হবে? (মাজালিসে আবরার)

বিঃদ্র: বর্তমান কতিপয় অসৎ আলেম বলে বেড়ায় যে মহিলাদের চেহারা ও হাত-পা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত এ একটা ধোঁকা। অনেক সহীহ হাদীসে পুরুষদেরকে পর মহিলাদের চেহারার দিকে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপ সূরায়ে আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে মহিলাদের পূর্ণ শরীর ঢাকতে বলা হয়েছে।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

### মোবাইল ও টেলিফোনের মাসাইল

ফোন ও মোবাইল ফোন বর্তমান সময়ের একটি নতুন আবিষ্কার। এর কিছু ভালো দিক যেমন আছে তেমনি মন্দ দিকও আছে। অন্য দশটা প্রয়োজনীয় জিনিসের মতো এরও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার আপত্তিকর নয়। তবে যথেষ্ট ব্যবহার শরী‘আত অনুমোদিত নয়। বরং ফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহারের কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে। ব্যবহারকারীদের জন্য তা মেনে চলা জরুরী।

১। মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে কোন প্রাণীর ছবি শেভ করে রাখবে না, কারণ এর দ্বারা ছবির প্রদর্শনী হয়, যা রহমতের ফিরিশতার আগমন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। আর শরী‘আতে ছবির প্রকাশ ও প্রদর্শন নিষেধ করা হয়েছে এবং এর উপর কঠোর আযাবের ধমকি এসেছে। তেমনিভাবে মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে আল্লাহ তা‘আলার নামের ক্যালিগ্রাফি বা লিখিত আয়াত কিংবা অন্য কোন

যিকির ইত্যাদি শেড করে রাখবে না। কারণ এভাবে ক্ষেত্র বিশেষে এগুলোর সাথে বেয়াদবী হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। (বুখারী শরীফ হা: নং ২১০৬, মুসলিম শরীফ হা: নং ৫৯৬১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫:৩৫৯/১:৫০)

২। আযান, যিকির, তিলাওয়াত ও দু‘আ কালামকে রিংটোন বা ওয়েলকাম টিউন হিসাবে ব্যবহার করবে না। কারণ এসব কিছু অতীব মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। এগুলোর ব্যবহার একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাকে রাজি খুশি করার উদ্দেশ্যে হতে হবে, আর এগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্রও সুনির্ধারিত। কাজেই মোবাইল ফোনের রিংটোন বা ওয়েলকাম টিউন হিসাবে এগুলোর প্রয়োগ অবমাননা এবং অপব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। (আলমগীরী ৫:৩১৫, ফাতাওয়া শামী ১:৫১৮)

৩। মিউজিক, গান-বাদ্যের কলিকে রিংটোন অথবা ওয়েলকাম টিউন হিসাবে ব্যবহার করবে না। কারণ এসব শোনা ও শোনানো সবই কবীরাহ গুনাহ। (তিরমিযী শরীফ হা: নং ১২৮৫)

৪. ঘণ্টার আওয়াজ, হর্নের আওয়াজ, গাড়ীর আওয়াজ, পাখির আওয়াজ বা এ ধরনের স্বাভাবিক কোন আওয়াজ যাকে মিউজিক বলা যায় না বা বিশী কোন আওয়াজও নয় তাকে রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করবে।

৫। ক্যামেরা বা ভিডিও ওয়ালা মোবাইল সেট ব্যবহার করবে না। কারণ এর দ্বারা তার প্রতি অন্যের মনে বদগুমানী বা কু-ধারণা সৃষ্টি হয়। এধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য হাদীসে তাকীদ করা হয়েছে। (ইতহাফ ৮:৫২৪)

৬। নামাযের সময় বা কারো বিশ্রামের সময় বা অন্য কোন ব্যস্ততার সময় তাকে ফোন করে বিরক্ত করবে না বা কষ্টে ফেলবে না। কারণ অন্যকে অযথা কষ্ট দেয়া এবং পেরেশান করা নাজাযিয়। (মাআরিফুল কুরআন ৬:৩৯৪)

৭। একান্ত অপারগতা বা ঠেকা ছাড়া কাউকে মিসড কল দিবে না। কারণ এতে মানুষকে বিরক্ত করা হয় যা গুনাহের কাজ এবং তার দ্বারা নিজের কৃপণতা প্রকাশ করা হয়। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ১০:৬০১৮)

৮। কেউ ফোন করলে পারতপক্ষে অবশ্যই রিসিভ করবে, পরিচিত হোক বা অপরিচিত হোক। হ্যাঁ! একান্ত উজর থাকলে রিসিভ না করার অনুমতি আছে। ঘুমানোর পূর্বে মোবাইল ফোনের রিংটোন বন্ধ করে ঘুমাতে না। এতে অনেক সময় অন্যদের পেরেশানি হয়। প্রয়োজনে মোবাইল ফোন বন্ধ করে ঘুমাতে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬০১৮, মাআরিফুল কুরআন ৬:৩৯৪)

৯। সালাম দিয়ে কথা শুরু করবে। এটাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত, হ্যালো দিয়ে নয়। কারণ হ্যালো দিয়ে কথা শুরু করা সুন্নাত

পরিপন্থী কাজ এবং বিজাতীয় অনুকরণ। (তিরমিযী শরীফ হা: নং ২৭০৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫:৩২৪)

১০। সালামের পর কোন সমস্যা না থাকলে নিজের পরিচয় পেশ করে কথা বলার অনুমতি নিয়ে কথা শুরু করবে। অনেক পরিচয় পেশ না করে কথা শুরু করে। এতে অপর ব্যক্তি বিব্রতবোধ করে এবং বিভ্রান্তির শিকার হয়। আর অনেকে অনুমতি না নিয়েই কথা শুরু করে, অথচ অপরপক্ষ তখন এমন কোন কাজে ব্যস্ত থাকে যার জন্য কথার জওয়াব দেয়া সম্ভব হয় না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৭১০-১৮)

১১। কোন ব্যক্তির মোবাইল ফোনে কথা বলার নির্ধারিত সময় থাকলে তা জেনে নিয়ে শুধুমাত্র সে সময়ে ফোন করবে। আর এ ধরনের সময় নির্ধারিত না থাকলে ফোন করে অপর ব্যক্তির সুযোগ আছে কিনা তা জেনে কথা বলার অনুমতি নিয়ে কথা শুরু করবে। অনেকেই ফোন করে অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই কথা শুরু করে দেয়। অপর ব্যক্তি কোন অবস্থায় আছে তা জানার প্রয়োজন বোধ করে না। এটা বড়ই অভদ্রতা। দীর্ঘ সময় কথা বলার প্রয়োজন হলে তার জন্য অনুমতি চেয়ে নিবে, অনুমতি ছাড়া দীর্ঘ সময় কথা বলে বিরক্ত করবে না। (মাআরিফুল কুরআন ৬:৩৯৪)

১২। একবার ফোন করার পর অপর পক্ষ যদি রিসিভ না করে তবে সে মুহূর্তে আর দ্বিতীয় বার ফোন করবে না। মনে করবে যে অপর ব্যক্তি কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত আছে, এ মুহূর্তে সে রিসিভ করতে অক্ষম। হ্যাঁ ! দশ পনের মিনিট বিরতি দিয়ে পুনরায় করতে পারে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬২৪৫)

১৩। মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিবে। যাতে নামাযের মধ্যে রিংটোন বেজে উঠে মুসল্লীদের একাগ্রতা নষ্ট না করে। কোন কারণে যদি নামাযের পূর্বে মোবাইল ফোন বন্ধ না করে থাকে আর নামায অবস্থায় বেজে উঠে, তখন সম্ভব হলে এক হাত দ্বারা বন্ধ করে দিবে। দুহাত ব্যবহার করবে না। কারণ দুহাত ব্যবহার করা আমলে কাসীর হওয়ায় নামায নষ্ট হয়ে যায়। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১:১০৫, ফাতাওয়া শামী ১:৬২৪)

উল্লেখ্য মোবাইল ফোন মসজিদে বা মজলিসে বন্ধ রাখা ব্যবহারকারীর দায়িত্ব। এ ব্যাপারে মুআযযিনের কোন দায়িত্ব নেই।

১৪। মোবাইল ফোনে বোনাস টকটাইম পাওয়ার জন্য অযথা বেশি বেশি কথা বলবে না। কারণ এতে জীবনের মহামূল্যবান সময় এবং অর্থের অপচয় হয়। আর অপচয় থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য। (সুরায়ে ফাতির আয়াত নং ৩৭, সুরায়ে বনী ইসরাইল আয়াত নং ২৭)

১৫। মোবাইল ফোনে গেমস খেলবে না। কারণ এতে জীবনের মহামূল্যবান সময়কে বেকার নষ্ট করা হয়। তাছাড়াও এ ধরনের খেলায় দীনী বা দুনিয়াবী কোন উপকার নেই। (সূরায়ে ইসরা আয়াত নং ১২-২৭, সূরায়ে ফাতির আয়াত নং ৩৭)

১৬। উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদেরকে ফোন দিবে না। কারণ এতে জানমালের মারাত্মক ক্ষতি এবং তাদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের আশংকা থাকে। (সূরায়ে বাকারা আয়াত নং ১৯৫)

## চতুর্বিংশ অধ্যায়

### টিভি, সিনেমা এবং ভি সি আর দেখার ক্ষতিসমূহ

মানুষের জীবন দু'ধরনের। নববী জীবন আর পাশবিক জীবন। প্রথমটার পরিণাম জান্নাত আর দ্বিতীয়টার পরিণাম জাহান্নাম। আধুনিক যুগের সিনেমা, টিভি এবং ভি সি আর ইসলাম ও মুসলমানদের চির শত্রু ইহুদী-খৃষ্টানদের আবিষ্কার, মুসলমানদেরকে পাশবিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করার এক অত্যাধুনিক যন্ত্র। মুসলমানদেরকে তাদের, কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব-তামাদ্দুন, শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ, নামায, অর্থ, চরিত্র এবং মানবতা থেকে দূরে সরিয়ে বিজাতিদের কৃষ্টি-কালচারে অভ্যস্ত করত: তাদেরকে গোলাম বানানোর এক সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র। কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমান চোখ থাকতেও অন্ধ। বিবেক থাকতেও তাদের এ ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করতে না পেরে শত্রুদের প্রেরিত বিষাক্ত সাপকে শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপ এবং সৌন্দর্যের প্রতি বিস্মিত

হয়ে অবুঝ শিশুর মত সেটাকে স্বাগত জানিয়ে সযত্নে নিজের ঘরে স্থান করে দিচ্ছে। ফলে চারিত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তারা। যিনা-ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার, হত্যা-লুণ্ঠন, রাহাজানি-ধর্ষণ ইত্যাকার বহুবিধ ফিতনা-ফাসাদ দিন দিন বেড়েই চলছে। এহেন পরিস্থিতিতে সমাজে জীবন যাপনই বড় মুশকিল এবং কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য নিম্নে সিনেমা, টি ভি এবং ভি সি আর দেখার দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল, যাতে তার ভয়াবহ পরিণাম দেখে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

১। **চোখের যিনা:** সিনেমা টিভি দেখার সর্ব প্রধান উদ্দেশ্য হল মহিলাদের সৌন্দর্য্য দ্বারা পুরুষদের মনোরঞ্জন করা। নারীদেরকে অশ্লীল আর নির্লজ্জভাবে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ করে উপস্থাপন করা হয়। যা দেখার কারণে চোখের যিনা হতে থাকে। তদ্রূপ পুরুষদের দেখে মহিলারাও চোখের যিনায় লিপ্ত হয়ে গুনাহগার হচ্ছে। হাদীসে এসেছে চোখও যিনা করে, আর তার যিনা হচ্ছে বেগানা মহিলাদেরকে দেখা। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬২৪৩)

২। **কানের যিনা:** সিনেমা ও টিভির পর্দায় গান-বাজনা, কাওয়ালী, যুবতী মেয়েদের উলঙ্গ নাচ আর নায়িকাদের মনোহারিণী আওয়াজ। ঢোল-তবলা, সেতারা বেহালার মনোমুগ্ধকর ঝংকার। গানের সুরলহরী, প্রেম ভালবাসার অশ্লীল ডায়ালগ ইত্যাদি সব কানের যিনা। হাদীসে এসেছে কানও যিনা করে, আর যিনা হচ্ছে গায়ের মাহরামের আওয়াজ শ্রবণ করা। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬২৪৩)

৩। **অন্তরের যিনা:** সিনেমা টি ভির পর্দায় উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ, টাইটফিট পোশাক বেগানা মহিলাদেরকে দর্শন করা আর গান-বাজনার বিভিন্ন আকর্ষণীয় আওয়াজে পুলকিত হওয়া, আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে অন্তরের সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া, তার যৌনতা আর চিত্তাকর্ষকতা কল্পনা করে মনে মনে শিহরিত হওয়া এবং মজা অনুভব করা ইত্যাদি সবই অন্তরের যিনা। হাদীসে এসেছে অন্তরও যিনা করে, আর তার যিনা হচ্ছে কল্পনা আর কামভাব পূরণের আশা করা। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬২৪৩)

৪। **লজ্জা-শরমের বিলুপ্তি:** পরিবারের সকল সদস্য; পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন সকলে একত্র বসে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ ছবি দেখতে থাকে। যার দ্বারা হায়া-শরম খতম হতে থাকে। অথচ লজ্জা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। (বুখারী শরীফ হা: নং ৯)

৫। **অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনার ব্যাপকতা:** যে সকল লোকেরা সিনেমা ও টিভি দেখায় অভ্যস্ত হতে থাকে, চরিত্রগত দিক দিয়ে তাদের মন ও মস্তিষ্ক সব নিম্নস্তরে নেমে আসে। তাদের নির্লজ্জতা এবং অশ্লীলতার মাপকাঠি পরিবর্তন হয়ে যায়। গতকাল পর্যন্ত যে বিষয়টিকে সে উলঙ্গপনা আর অশ্লীলতা বলে জানতো আজ সেটাকে নিতান্তই সাধারণ বা এটাকেই মডার্ন মনে করছে। অথচ অশ্লীলতা আল্লাহ তা‘আলার নিকট মারাত্মক ঘৃণিত। (সূরায় আনআম ১৫১)

৬। **অসৎ সঙ্গতা:** সিনেমা ও টিভি দেখার কারণে অসৎ বন্ধু তথা সিগারেট ও মাদক দ্রব্যে অভ্যস্ত ব্যক্তি, মাতা-পিতার অবাধ্য, স্কুল-কলেজের অসৎ চরিত্রের ছাত্র-ছাত্রী এবং মেয়েদের সাথে চলাফেরা আরম্ভ করে এবং সৎ লোকদের সংশ্রব থেকে দূরে সরে থাকে। (সূরায় তাওবাঃ ১১৯, সূরায় আনআমঃ ৬৮)

৭। **খারাপ অভ্যাসের জন্ম:** ছেলে-মেয়ের সমকামিতা পুংমৈথুন, হস্তমৈথুন এবং ব্যভিচারের মত নানা অভিশপ্ত বদ অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে নিজের জীবনকে নষ্ট করে দেয়। অথচ আল্লাহ তা‘আলা সৎ লোকদের সংশ্রবে থাকার আদেশ করেছেন এবং কুরআন হাদীসে সকল হারাম কাজের প্রতি মারাত্মক ধমকী এসেছে। (সূরায় আনকাবূত: ২৮, তিরমিযী হা: নং ১১৬৭, শামী: ২/৩৯৯)

**৮। যৌন কামিতার শিক্ষা:** প্রায় সকল চলচ্চিত্রের বিষয়ই থাকে অবৈধ প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, যৌন চাহিদা পূরণ করার নানা কৌশল শিক্ষা দেয়া। অথচ কুরআনের স্পষ্ট নিষেধ যে, তোমরা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোন ভাবেই অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হইওনা এবং এগুলোর প্রচার করো না। (সূরায় আনআম: ১৫১, সূরায় নূর: ১৯)

**৯। চরিত্রের অবনতি:** চরিত্র বিনষ্টকারী কথা-বার্তা, অনর্থক কল্পকাহিনী, গীত, মিথ্যা, পরশ্রীকাতরতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কুদৃষ্টি ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে মারাত্মকভাবে চরিত্রের অবনতি ঘটে। অথচ চরিত্র মানব জীবনে অতি মূল্যবান সম্পদ এবং হাশরের ময়দানে সবচেয়ে ওজনদার হবে তার উত্তম চরিত্র। (সূরায় হজরাত: ১১-১২, আবু দাউদ হা: নং ৪৭৯৯)

**১০। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা:** চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ব্যভিচার, ছিনতাই, হত্যা-লুণ্ঠন, রাহাজানি-ধর্ষণ ইত্যাদি মারাত্মক অপরাধ বিভিন্ন পদ্ধতিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে সিনেমা টিভির পর্দায় দেখানো হয়। পরবর্তীতে দর্শকরা এগুলোকে সাধারণ মনে করতে করতে নিজেরাও এগুলোর সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। অথচ এগুলো সবই হারাম এবং কবীরাহ গুনাহ। (সূরায় মুমতাহিনা: ১২)

**১১। পর্দাহীনতার ব্যাপকতা:** বর্তমান সমাজের নারীরা চলচ্চিত্রের পর্দাহীনতা দেখে নিজেরাও পর্দাহীনতা শিখছে। নায়িকাদের অনুসরণে নিজেরা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ ইসলামী শরী‘আতে মহিলাদের জন্য পর্দাবিধান পালন করা ফরয। এটা না থাকলে সংসারের সমস্ত শান্তিই বিনষ্ট হয়ে যায়। (সূরায় আহযাব: ৩৩, ৫৯)

**১২। অবৈধ বিবাহ:** সিনেমা ও টিভি দেখার কারণে ধর্মীয় অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে না। পরকালের চিন্তাও থাকে না। মাসআলা-মাসাইলের গুরুত্বও শেষ হয়ে যায়। এমনকি একজন মুসলিম ছেলে অমুসলিম মেয়েকে বিবাহ করতে অথবা মুসলিম মেয়ে অমুসলিম ছেলের সাথে বিবাহ বসতে কোন দ্বিধাবোধ করে না। বরং এটাকে উদারপন্থী সংস্কৃতি ও আধুনিকতা মনে করে। অথচ এ সূরতদ্বয়ের কোনটাতেই বিবাহ সহীহ হবে না। এর পরেও ঘর-সংসার করলে যিনা হবে এবং তাদের থেকে যে সন্তান হবে সবই হারামজাদা হবে। (সূরায় বাকারা: ২২১)

**১৩। ফ্যাশন পূজা:** সিনেমা টিভি দেখার কারণে পুরুষেরা দাঁড়ি মুন্ডানো, টাখনুর নীচে কাপড় পরা, টাইট পোশাক পরা আর মহিলারা মাথার চুল খাটো করা, চুলে বিভিন্ন কালার করা, নেল পালিশ, লিপস্টিক ইত্যাদি শরী‘আত বিবর্জিত ফ্যাশনে লিপ্ত হয়। অথচ এসব নাজায়িয। (সূরায় আ‘রাফ ২৫-২৬, মায়িদা: ৬, বুখারী হা: নং ৬৮৯২, ৫৭৯৫, শামী: ৬/৪০৭)

**১৪। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষতি:** সিনেমা টিভি দেখার কারণে যুবক ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে হৃদকম্পন, ক্যান্সার, ব্লাড প্রেশার, স্বপ্নদোষ, দুর্বলতা ও শরীরের ব্যথাসহ বহুরোগে আক্রান্ত হয়। অথচ স্বাস্থ্যের হেফাযত করাকে আল্লাহ তা‘আলা জরুরী করেছেন। এর ব্যতিক্রম করলে এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর আদালতে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। (তিরমিযী হা: নং ২৪১৬)

**১৫। চোখের ক্ষতি:** চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে এ কথাটি পরীক্ষিত যে, যত অধিক পরিমাণ সিনেমা ও টিভি দেখা হবে তত দ্রুত চক্ষু খারাপ হয়ে যাবে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে থাকবে। (সাইদ মুহাম্মদ লিখিত সিনেমা টিভি দেখার ভয়াবহ পরিণতি: ৬১)

**১৬। সিনেমা ও টিভি দেখা একটি আত্মার ব্যাধি:** যখন কোন ব্যক্তির সিনেমা ও টিভি দেখার অভ্যাস মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় এবং সেটা ব্যতীত জীবন চলা কঠিন হয়ে পড়ে তখন সে হয়ে যায় একজন আত্মিক রোগী। তখন ঐ ব্যক্তির কাছে চিত্র জগতের প্রত্যেকটি বিষয় খুব ভাল লাগে। সিনেমা ও টিভি দর্শন তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ হয়ে যায়। এ মারাত্মক ক্ষতির কারণে এ লোক ধর্মের কোন কাজ পছন্দই করতে পারে না। দুনিয়ার কাজের জন্যও সে নিষ্কর্মা। আর হারামকে মনে প্রাণে ভালবাসার কারণে তার ঈমান যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারে। (সাইদ মুহাম্মদ লিখিত সিনেমা টিভি দেখার ভয়াবহ পরিণতি: ৬১)

**১৭। আল্লাহ ও রাসূলের অসন্তুষ্টি:** আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ও দীনদার লোকদের মুহাব্বাত ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ (যা তার জন্য জরুরী) পরিবর্তে অভিশপ্ত নায়ক নায়িকাদের মুহাব্বাত ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে পয়দা হয়। যার ফলে তাদের মুহাব্বাতে দুনিয়াতে অনেক সময় আত্মহত্যার মত মহাপাপ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আখিরাতে তাদের সাথী হয়ে জাহান্নামী হওয়ার আশংকা থাকে, যদি সে তাওবা না করে নেয়। (সূরায় আনফাল:৪৬)

**১৮। পিতা-মাতার অবাধ্যতা:** শিশুরা পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে যায়। যে সকল শিশু অনবরত সিনেমা ও টিভি দেখতে থাকে তারা আস্তে আস্তে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে যায়। বরং কতক সময় তাদের সাথে অশ্লীল কথা-বার্তা বলে ফেলে এবং অসামাজিক আচরণ করে বসে। সিনেমা দেখা ও সিডি ক্রয় করার জন্য টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়। যদি পিতা-মাতা পয়সা দিতে অস্বীকৃতি জানায় তবে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। এমনকি চুরি-ডাকাতিও শুরু করে, আবার কখনো মায়ের উপর হামলা করে বসে। অথচ পিতা-মাতার বাধ্য হওয়া এবং তাদের কথামত চলা সন্তানদের জন্য ওয়াজিব। (সূরায় বনী ইসরাইল:২৩-২৪)

**১৯। পড়া-লেখার বিঘ্ন সৃষ্টি:** এগুলোর আসক্তির কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-লেখার দারুণ ব্যাঘাত ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রে পড়া-লেখাই নষ্ট হয়ে যায়। যার



ফলে পড়া-লেখা, কাজ-কর্ম সবকিছু উপেক্ষা করে সিনেমা টিভি দেখে দীন-দুনিয়া বরবাদ করে দেয়। অনেক সময় এ কারণে পরীক্ষায় ফেল করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

**২০। নামায বিনষ্ট হয়:** টিভি দেখতে গিয়ে বেনামাযীর কথা তো বাদই, নামাযী লোকদেরও নামায ছুটে যায় অথবা কমপক্ষে জামা‘আত ছুটে যায়। অথচ নামায আল্লাহ তা‘আলার গুরুত্বপূর্ণ বিধান। যা তিনি বান্দার উপর ওয়াজ্জমত ফরয করেছেন এবং তার জন্য জামা‘আতকে করেছেন অতীব জরুরী এবং ওয়াজিব। (সূরায়ে নিসা: ১০৩, বাকারা:৪৩)

**২১। টাকা পয়সার অপব্যয়:** সিনেমা ও টিভি সকল মন্দ ও অশ্লীল কর্ম-কাণ্ড প্রশিক্ষণ দেয়ার এক ট্রেনিং স্কুল। অতএব তা দেখা অবৈধ ও হারাম। সুতরাং এ হারাম কাজে টাকা-পয়সা ব্যয় করা অপব্যয়। আর অপব্যয়কারীকে কুরআনে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। (সূরায়ে বনী ইসরাঈল:২৭)

**২২। সময়ের অপচয়:** এ অবৈধ এবং হারাম কাজে টাকা-পয়সা খরচ করা যেমন অপব্যয় তেমন তার জন্য মূল্যবান হায়াত থেকে মূল্যবান সময় দেয়া সময় অপচয় করারই নামান্তর। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন। (তিরমিযী হা: নং ২৪১৬)

**২৩। হারাম কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ:** সিনেমা এবং টিভি দেখলে পর্দাহীনতা, মহিলা-পুরুষের স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা, অবৈধ প্রেম ও ভালবাসা, ব্যভিচার, মদ্য পান, ফ্যাশন পূজা, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি হারাম ও অবৈধ কর্ম-কাণ্ডের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়। এজন্য বর্তমানে টিভির কারণে ঘরে ঘরে চোর-ডাকাত, হাইজ্যাকার, ছিনতাইকারী সৃষ্টি হচ্ছে এবং সরকারের সন্ত্রাস বিরোধী সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। (সাদ্দ মুহাম্মদ লিখিত সিনেমা টিভি দেখার ভয়াবহ পরিণতি: ৬১)

**২৪। বিপদ ও মুসীবতের কারণ:** সিনেমা টিভির কারণে বহু কবীরাহ গুনাহ ব্যাপক হয়। আর হাদীসে এসেছে: যখন গুনাহ ব্যাপক হয় তখন আল্লাহ তা‘আলার আযাব ও শাস্তিও ব্যাপকভাবে হয়। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ:৪/২৬৮)

**২৫। সর্বোপরি সিনেমা টিভি দেখার মধ্যে কমপক্ষে ২১টি হারাম কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং এতগুলো হারাম কাজ পাওয়া যাওয়ার পরেও সেটা দেখা মানে নিজের মূল্যবান হায়াতকে ধ্বংস করা ও আখিরাতকে বরবাদ করা।**

**সারকথা:** টিভি, ভিসিআর এবং সিনেমার দুনিয়াবী এবং আখিরাতী বহুবিধ ক্ষতি এবং অনেক হারামের সমষ্টি ও কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় সেখানে মন্দ ছাড়া ভাল কোন দিকই নেই। সেখান থেকে কোন ভাল ফলাফলের আশা করা মানে ম্যানহোল



থেকে স্বচ্ছ পানি তালাশ করা। সুতরাং সেখানে অনৈসলামিক প্রোগ্রাম করা এবং দেখা যেমন নাজায়িয তদ্রূপ ইসলামিক প্রোগ্রাম করা এবং দেখাও জায়িয এ কথা ঠিক নয়। বরং সে ক্ষেত্রে গুমরাহীর আশংকা আছে। বর্তমান সমাজে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। হকুনী উলামায়ে কেরাম এ ধরনের আলেমদের থেকে নিজের দীন, ঈমান রক্ষার খাতিরে দূরে থাকার উপদেশ দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে আমাদের ছেলে মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ও সকল মুসলমানকে চলমান এ ফিতনা থেকে বেঁচে থেকে সঠিক পন্থায় আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে সচেষ্ট হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

## পঞ্চবিংশ অধ্যায় আখলাখ

### তায়কিয়া ও আত্মশুদ্ধি বিষয়ক পরচা

**ভূমিকাঃ** অন্তরের ১০টি রোগের চিকিৎসা করে অন্তরের ১০টি গুণ হাসিল করার নাম তায়কিয়া বা আত্মশুদ্ধি। যা শরী‘আতের দৃষ্টিতে ফরযে আইন এবং এর জন্যে কোন ইজাযত প্রাপ্ত শাইখের সাথে ইসলামী সম্পর্ক করাও ফরযে আইন। বাইআত হওয়া ফরয বা ওয়াজিব নয় বরং এটা মুস্তাহাব, এর উপর আত্মশুদ্ধি নির্ভর করে না। আত্মশুদ্ধি অর্জন হলে সমস্ত জাহেরী গুনাহ বর্জন করা এবং জাহেরী ইবাদত-বন্দেগী করা সহজ হয়ে যায় এবং সেই বন্দেগীকে তাকওয়ার যিন্দেগী বা সুন্নতী যিন্দেগী বলে এবং সে ব্যক্তি তখন আল্লাহর ওলী হয় এবং তার হায়াতে তাইয়িবা তথা পবিত্র জীবন নসীব হয়। আল্লাহ তা‘আলা সকলকে এ দৌলত নসীব করেন, আমীন।

### অন্তরের ১০টি রোগের বর্ণনা

#### ১. বেশী খাওয়া এবং ভাল খানার প্রতি লোভী হওয়া

বেশী খাওয়া এবং উদর পূর্তি করে খাওয়া অসংখ্য গুনাহের মূল। এজন্য হাদীসে পাকে ক্ষুধার্ত থাকার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “মানুষের জন্য পূর্ণ করার ক্ষেত্রে পেটের থেকে খারাপ কোন পাত্র নেই।” (বুখারী হা: নং ৪৩৪৩)

#### খানা কম খাওয়ার উপকারসমূহ

১. অন্তরে স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়। ২. দিল নরম হয় এবং মুনাজাতে স্বাদ অনুভূত হয়। ৩. অবাধ্য নফস অপদস্থ ও পরাজিত হয়। ৪. নফসকে শাস্তি দেওয়া হয়। ৫. কুপ্রবৃত্তি দুর্বল হয়ে যায়। ৬. বেশী নিদ্রা আসে না এবং ইবাদত কষ্টকর হয় না।

৭. দুনিয়াবী চিন্তাভাবনা কমে আসে এবং জীবিকা নির্বাহের বোঝা হাল্কা হয়ে যায়।

উল্লেখ্য বর্তমান যামানার লোকেরা পূর্বের তুলনায় অনেক কমজোর হওয়ায় তাদের খানার মুজাহাদার ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. লিখেছেনঃ এ যমানায় খানার মুজাহাদার অর্থ হলো পেট পূর্ণ হতে ২/৪ লুকমা বাকী থাকা অবস্থায় খানা শেষ করা এবং নফস বা শরীর দিয়ে খুব কাজ নেয়া।

## ২. অধিক কথা বলা

যবান হল অন্তরের দূত, অন্তরের যাবতীয় নকশা ও কল্পনাকে যবানই প্রকাশ করে। এজন্য যবানের ক্রিয়া বড় মারাত্মক হয়।

এজন্যই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকটা কথাই সংরক্ষণ করা হয়। (সূরা কাফ-১৮)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছেঃ যে ব্যক্তি নিজের লজ্জাস্থান এবং জিহবাহর ব্যাপারে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবে আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব। (বুখারী হা: নং ৬৪৭৪)

## কথা বেশী বলার ক্ষতিসমূহ

১. মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়া। ২. গীবতে জড়িয়ে পড়া। ৩. অনর্থক ঝগড়া করা। ৪. অতিরিক্ত হাসাহাসি করা, যাদ্দরুন দিল মরে যায়। ৫. অন্যের অযাচিত প্রশংসা করা।

## চুপ থাকার উপকারিতা

১. মেহনতবিহীন ইবাদত। ২. সাম্রাজ্যবিহীন দাপট। ৩. দেওয়ালবিহীন দূর্গ। ৪. অস্ত্রবিহীন বিজয়। ৫. কিরামান কাতবীনের শান্তি। ৬. আল্লাহভীরুদের অভ্যাস। ৭. হেকমতের গুণ্ডধন। ৮. মূর্খদের উত্তর। ৯. দোষসমূহ আবৃতকারী। ১০. গুনাহসমূহ আচ্ছাদনকারী।

## ৩. অহেতুক গোঁস্বা করা

এটা অত্যন্ত খারাপ একটি আত্মিক ব্যাধি। রাগ দোষখের আগুনের একটি টুকরা এজন্য রাগান্বিত ব্যক্তির চেহারা লাল হয়ে যায়। এর কারণে মারামারি ঝগড়াঝাটি, গালাগালী, এমনকি খুনাখুনী পর্যন্ত সংঘটিত হয়।

এমনকি অনেকে বৃদ্ধি বয়সে এসে তুচ্ছ ঘটনায় বিবিকে তিন তালাক দিয়ে পস্তাতে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ঐ ব্যক্তি বাহাদুর নয় যে যুদ্ধের ময়দানে দুশমনকে নীচে ফেলে দেয় বরং ঐ ব্যক্তি বাহাদুর যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। (বুখারী হাদীস নং ৬১১৪)

## গোস্থার চিকিৎসা

দুইভাবে গোস্থার চিকিৎসা করা হয়। ১. ইলমী বা জ্ঞানগত পদ্ধতিতে ২. আমলী বা কার্যগত পদ্ধতিতে।

**ইলমী চিকিৎসা হলঃ** গোস্থার সময় চিন্তা করতে হবে গোস্থা কেন আসে? গোস্থা আসার কারণ তো এটাই যে, যে কাজটি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে সে কাজটি আমার মনের মোতাবেক কেন হয়নি? কেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হল? তার মানে আমি আল্লাহর ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছার অনুগত বানাতে চাই? নাউযুবিল্লাহ! এভাবে চিন্তা করলে গোস্থার বদ অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

## আর আমলী চিকিৎসা হলঃ

গোস্থা আসলে ১ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) পড়বে, ২. নিজ অবস্থা পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ, দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে। ৩. যার প্রতি গোস্থার উদ্রেক হয় তার সামনে থেকে সরে পড়বে। ৪. তারপরও গোস্থা ঠান্ডা না হলে উযু করবে, নিজ গালকে মাটিতে লাগিয়ে দিবে। এভাবে আমল করলে গোস্থা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

## ৪. হিংসা করা

হিংসার সংজ্ঞাঃ কোন ব্যক্তিকে আরাম আয়েশ বা প্রাচুর্যপূর্ণ অবস্থায় দেখে তার সে নেয়ামত দূরীভূত হয়ে নিজের জন্য হাসিল হওয়ার আকাংখা করা। হিংসা অত্যন্ত জঘন্য একটি ব্যাধি।

আল্লাহ তা‘আলা হাদীসে কুদসীতে বলেনঃ আমার বান্দার উপর নেয়ামত দেখে হিংসাকারী কেমন যেন আমার ঐ বন্টনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট যা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে করেছি। নাউযুবিল্লাহ। (এহয়াউ উলুমুদ্দীন-৩/২৯২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “হিংসা নেকী সমূহকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দেয় যেমন আগুন শুকনো লাকড়ীসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়”। অবশ্য অন্যের কোন নেয়ামত দেখে সেটা তার মধ্যে বহাল থেকে নিজের জন্য হাসিল হওয়ার আকাংখা করা যাকে “গিবতা” বা “ঈর্ষা” বলে সেটা জায়েয। (আবু দাউদ হাদীস নং-৪৯০৩)

## ৫. কৃপণতা ও সম্পদের মোহ

সম্পদের মোহই মূলতঃ কৃপণতার মূল আর সম্পদের মুহব্বাত মানুষকে দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে। যে কারণে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি মুহব্বাত দুর্বল হয়ে যায়।

এ কারণেই কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ যার ভাবার্থ হলঃ আল্লাহর দেয়া সম্পদে কৃপণতাকারীদের জন্য পরকালে ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে। (সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৮০)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছেঃ তোমরা লোভকে নিয়ন্ত্রণ কর কারণ এটা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-২৫৭৮)

বাস্তবিক পক্ষে সম্পদের মোহ মানুষকে আল্লাহ পাক থেকে উদাসীন করে দেয়। এই সম্পদ মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ এক ফেতনা।

অবশ্য শুধু সম্পদ কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। বিশেষতঃ যদি সে সম্পদ দীনী কাজে ব্যয় করা হয়। নতুবা জরুরত পরিমাণ সম্পদ থাকলে কোন অসুবিধা নেই, যাতে কারো নিকট ভিক্ষার হাত বাড়াতে না হয়। এবং আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা যায়।

## ৬. খ্যাতি ও পদের মোহ

খ্যাতি ও পদের মোহ অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি আত্মিক ব্যাধি। এর দ্বারা অন্তরে নিফাক সৃষ্টি হয়। এজন্য নিজেকে সব সময় লুকিয়ে রাখা চাই, খ্যাতির পিছনে পড়া অনুচিত। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। (সূরা কিসাস-৮৩)

হাদীসে পাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “যদি কোন বকরীর পালের মধ্যে দুটি নেকড়ে প্রবেশ করে তাহলেও সেটা এত ক্ষতি করে না যতটা সম্পদ ও পদের মুহাব্বত দীনদার মুসলমানদের দীনের ক্ষতি করে।” (তিরমিযী হাঃ নং ২৩৮১, মুঃ আহমাদ হাঃ ১৫৭৯০)

অবশ্য যদি কামনা-বাসনা ছাড়াই আল্লাহ তা‘আলা কাউকে সুখ্যাতি দান করেন হবে সেটা দোষণীয় নয়। যেমন নবীগণ আ. সাহাবীগণ রাযি. তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ রহ. তাঁদের প্রত্যেকেরই দুনিয়াতে খ্যাতি ছিল কিন্তু তাঁরা কেউ দুনিয়াতে খ্যাতি কামনা করেননি।

## ৭. দুনিয়াপ্ৰীতি

দুনিয়াপ্ৰীতি শুধু সম্পদ ও পদের মুহাব্বতকেই বলেনা বরং ইহজীবনে যে কোন অবৈধ কামনাকে পূর্ণ করার প্রচেষ্টা ও খাহেশকেই দুনিয়াপ্ৰীতি বলে। অবশ্য দীনী ইলম, মারিফাতে ইলাহী এবং সৎকর্ম যেগুলোর ফলাফল মৃত্যুর পর পাওয়া যাবে, সেগুলো যদিও দুনিয়াতেই সংঘটিত হয় কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এসবের মুহাব্বতকে দুনিয়ার মুহাব্বত বলে না বরং এগুলো হলো আখেরাতের মুহাব্বত।

দুনিয়ার জীবনের নিন্দাবাদ করে মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন “দুনিয়ার জীবনের সবকিছুই ধোঁকার সামান।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত- ১৮৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে যে, “দুনিয়ার সামানপত্র, রং তামাশা ও খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয়।” (সূরায়ে হাদীদ, আয়াত-২০)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ দুনিয়া হল একটি মরা জন্তু যারা এটাকে লক্ষবস্ত্র বানিয়েছে তারা হল কুকুরের দল। দুনিয়ার ভোগ বিলাসকে উদ্দেশ্য না করে দুনিয়াকে আখেরাতের প্রস্তুতির হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে কামিয়াব হওয়া যাবে।

## ৮. অহংকার করা

তাকাব্বুর বা অহংকার এর অর্থ হলঃ প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্যে নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, হক ও সত্যকে অস্বীকার করা। বলা বাহুল্য যে, যখন মানুষ নিজের ব্যাপারে এরূপ ধারণা পোষণ করে এবং আল্লাহর দেয়া গুণসমূহকে নিজের কৃতিত্ব মনে করে তখন তার নফস ফুলে উঠে, অতঃপর কাজকর্মে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে থাকে, উদাহরণস্বরূপঃ রাস্তায় চলার সময় সাথীদের আগে আগে চলা, মজলিসে সদরের মাকামে বা সম্মানিত স্থানে বসা। অন্যদেরকে তাচ্ছিল্যের সাথে দেখা বা আচরণ করা অথবা কেউ আগে সালাম না দিলে তার উপর গোস্বা হওয়া, কেউ সম্মান না করলে তার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া, কেউ সঠিক উপদেশ দিলেও নিজের মর্জির খেলাফ হওয়ায় সেটাকে অবজ্ঞা করা। হক কথা জানা সত্ত্বেও সেটাকে না মানা। সাধারণ মানুষকে এমন দৃষ্টিতে দেখা যেমন গাধাকে দেখা হয় ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেক আয়াতে ‘অহংকার’ এর নিন্দাবাদ করা হয়েছে, অহংকারের কারণেই ইবলীস বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অহংকারের কারণেই আবু জাহাল মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সত্য জেনেও অস্বীকার করেছে।

## ৯. আত্মতুষ্টি

আত্মতুষ্টি বা নিজেকে নিজে সঠিক মনে করা মূলতঃ এটা অহংকারেরই ভূমিকা বা প্রাথমিক রূপ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অহংকারের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় নিজের নফসকে বড় মনে করা হয় আর আত্মতুষ্টির মধ্যে অন্যদের সাথে তুলনা করা ছাড়াই স্থায়ী নফসকে নিজ খেলালে কামেল মনে করা হয়। এবং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহকে নিজের হক মনে করা হয়, অর্থাৎ, এটাকে আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ মনে করা হয় না এবং সেটা যে কোন মুহূর্তে হিনিয়ে নেয়া হতে পারে সে ব্যাপারে শংকাহীন হয়ে পড়া। এটাকেই তাসাওউফের পরিভাষায় “উজুব”

বা “খোদপছন্দী” বলে। এটার চিকিৎসা করা না হলে এটাই কিছু দিন পরে অহংকারে পরিণত হয়ে বান্দাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

### ১০. লোক দেখানো (রিয়া বা প্রদর্শনী)

রিয়া বলা হয় নিজ ইবাদত ও ভাল আমলের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে বড়ত্ব ও মর্যাদার আকাংখা করা।

এটা ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। কেননা ইবাদতের দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এখন যেহেতু এই আমলের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্য শরীকও চলে এসেছে, বিধায় একে “শিরিকে আসগার” বা ছোট শিরক বলা হয়।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করার হুকুম করা হয়েছে। (সূরায়ে বায়্যিনাহ আয়াত-৫)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছেঃ “কিয়ামতের দিন সবপ্রথম যে তিন শ্রেণীর ব্যক্তিকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তারা সবাই হবে রিয়াকার।” তারা সারা জীবন দীনের পথে থেকেও অন্তরের একটি রোগের কারণে সকলের পূর্বে জাহান্নামে যাবে। রিয়াকে “শিরিকে খফী” বা গোপন শিরকও বলা হয়।

### রিয়ার সূরতসমূহঃ

মোট ছয় ভাবে রিয়া হতে পারে। ১। শরীরের দ্বারা ২। অঙ্গভঙ্গির দ্বারা ৩। আকৃতি অবলম্বনের দ্বারা ৪। কথাবার্তার দ্বারা ৫। আমলের দ্বারা ৬। নিজ মুরীদ ও ভক্তের আধিক্য ও নিজের ইবাদত বন্দেগীর বর্ণনার দ্বারা।

### প্রশংনীয় দশটি গুণের বর্ণনা

#### ১. তাওবা

“তাওবা” শব্দের অর্থ হল ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, আর পরিভাষায় “তাওবা” বলা হয় অতীত গুনাহের উপর লজ্জিত হওয়া, বর্তমানে সে গুনাহ বর্জন করা এবং ভবিষ্যতেও না করার ব্যাপারে দৃঢ় ইরাদা করা। এবং উক্ত কাজের কোন কাযা বা কাফফারা থাকলে তা করে নেয়া। এ তিনটি বিষয়ের সমষ্টিকেই “তাওবায়ে নাসূহা” বা পরিপূর্ণ তাওবা বলে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা কর। আশা করা যায় তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হবে। (তাহরীম-৮)

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “গুনাহ থেকে তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায় যার কোন গুনাহ থাকে না।”

তাওবার ফযীলতে কুরআন শরীফের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে এবং অনেক হাদীসেও এর ফযীলত এসেছে যেমন, (সূরা নূর ৩১, সূরা হুদ ৩, সূরা তাহরীম ৮, বুখারী হা: ৬৩০৭, ৬৩০৯, মুসলিম হা: ২৭৪৭, ২৭০২)

## ২. আল্লাহর ভয়

“খাওফ” বা ভয়ের প্রকৃত অর্থ হলঃ আসন্ন কোন কষ্টের আশংকা করা, অন্তরে বিষন্নতা ও জ্বালা পোড়া সৃষ্টি হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার সিফাতে জালালীর পরিচয় অর্জিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ভয় অন্তরে সৃষ্টি হবে না। আর এ কথাটা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক ছোট-বড় বস্তুর উপর এমনভাবে ক্ষমতাবান যে, মুহূর্তের মধ্যেই তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে ফেলতে পারেন। কোন মাখলূকের কোন প্রকার আপত্তি করারও কোন অধিকার নেই। এভাবে চিন্তা-ফিকির করলে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে। ইনশাআল্লাহ।

## ৩. যুহুদ বা কুছুতা

“যুহুদ” এর হাকীকত হলঃ দুনিয়ার মাল-সামানের প্রতি ক্রক্ষেপ না করা এবং সেটা অর্জন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেদিকে মনোযোগ না দেয়া। কোটিপতিও যাহেদ হতে পারে যদি তার মাল দৌলতের প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে। আবার ফকিরও কোন কোন ক্ষেত্রে যাহেদ নাও হতে পারে।

“যুহুদ” এর মূল হল ঐ নূর এবং ইলম যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার অন্তরে ঢালা হয়। যদ্বন্ধন বান্দার সীনা খুলে যায় এবং একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত সাজ-সজ্জা মাছির পাখার (ডানার) চেয়েও মূল্যহীন। আর আখেরাতের জীবনই আসল জীবন। যখন এই নূর হাসিল হয় তখন আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার কোন মূল্যই থাকে না।

**যুহুদ এর ফলাফল হল:** প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়ার উপর তুষ্ট হওয়া। যে পরিমাণ পাথেয় মুসাফির ব্যক্তির সফরের সময় প্রয়োজন হয় তার চেয়ে বেশীর পিছনে না পড়া।

## ৪. সবর বা ধৈর্য

“সবর” এর আসল অর্থ হলঃ কুপ্রবৃত্তির মুকাবেলায় আল্লাহ পাকের নির্দেশের উপর দৃঢ়তার সাথে জমে থাকা।

## সবরের তিনটি স্তরঃ

১। উন্নয়ন পর্যায়ে সবার হাঃ মনের খারাপ কামনা-বাসনা এবং কুপ্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করে এর উপর স্থায়িত্ব নসীব হওয়া।

২। সবারের নিকৃষ্ট স্তর হাঃ কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য থাকে আর কলব শয়তানী বাহিনীর কাঁধে ন্যস্ত হয়ে পড়ে।

৩। মধ্যম পর্যায়ে সবার হাঃ আল্লাহর বাহিনী ও শয়তানী বাহিনীর মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। কখনো এদের পাল্লা ভারী হয় আবার কখনো তাদের পাল্লা। কারো একতরফা জয়-পরাজয় হয় না। কুরআনে কারীমের ৭০টিরও বেশী স্থানে সবার এর কথা বলা হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন “সবার ঈমানের অর্ধেক এবং জান্নাতের খাযানাসমূহের মধ্যে একটি খাযানা। যে ব্যক্তি এগুণে গুনাযিত হয় সে অনেক বড় সৌভাগ্যবান। রাত্রি জাগরণকারী এবং স্থায়ী রোযাদারের চেয়েও তার মর্যাদা বেশি।”

#### ৫. শোকর বা কৃতজ্ঞতা

শোকরের হাকীকত বুঝতে হলে প্রথমে সেটাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করতে হবে।

১। ইলম অর্থাৎ, নেয়ামত এবং নেয়ামত প্রদানকারী (আল্লাহ তা‘আলা) কে চেনা।

২। নেয়ামত প্রদানকারীর ঐ নেয়ামতের উপর এ জন্যে সম্ভূষ্ট হওয়া যে, এটা আল্লাহ তা‘আলার দান।

৩। এবং আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত নেয়ামতকে তার সম্ভূষ্টির কাজে ব্যবহার করা।

শোকরের ফযীলত বয়ান করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন: “যদি তোমরা (আমার নেয়ামতের) শোকর আদায় কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্যে নেয়ামত বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা নেয়ামত পেয়ে অকৃতজ্ঞ হও তাহলে (জেনে রেখ) আমার আযাব বড়ই কঠিন।” (সূরায়ে ইবরাহীম-৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: “খাদ্য ভক্ষণকারী কৃতজ্ঞ বান্দা ধৈর্যশীল রোযাদারের সমান।” (মুসনাদে আহমদ হাঃ ১৯০৩৮)

#### ৬. ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা

ইখলাসের অর্থ হল মুসলমান ব্যক্তির নিয়্যতের মধ্যে অন্য কিছুর মিশ্রণ না থাকা। ইখলাসের দুটি রুকন আছে। প্রথমতঃ নিয়্যত অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহকে রাযী খুশী করার জন্যে আমল করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম



ইরশাদ করেনঃ “সকল কাজের ভাল-মন্দ নিয়্যতের উপর নির্ভর করে।” (বুখারী হাদীস নং ১)

দ্বিতীয়তঃ সততা, আর এটাই ইখলাসের পূর্ণতা। আল্লাহ পাক বলেন তারাই প্রকৃত মুমিন বান্দা যারা তাদের অঙ্গীকারে সত্যবাদী। (সূরা আহযাব-২৩)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “যখন মানুষ সত্য কথা বলে এবং সত্যের অনুসন্ধানে থাকে তখন মহান আল্লাহর নিকট তার নাম সিদ্দীক লেখা হয়।” (বুখারী হাদীস নং ৬০৯৪)

## ৭. তাওয়াস্কুল বা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা

তাওয়াস্কুল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ বিশেষ হালত বা অবস্থা যা আল্লাহ তা‘আলাকে এককভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং সমস্ত গুণের মধ্যে স্বতন্ত্র ও লা-শরীক মনে করার দ্বারা সৃষ্টি হয়। এরপর এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর এমন কাজ করা যার দ্বারা আল্লাহর প্রতি আস্থা প্রকাশ পায়। অতএব তাওয়াস্কুলের মোট ৩টি অংশ হলঃ

১। মারেফাত বা পরিচয়

২। হালাত বা বিশেষ অবস্থা

৩। আমল বা বিশেষ কার্যকলাপ

তাওয়াস্কুলের ফযীলত বয়ান করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুমিন হও তাহলে এক আল্লাহর উপরই ভরসা করা। (সূরা মাইয়িদাহ-২৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যদি তোমরা আল্লাহ তা‘আলার উপর যথার্থ তাওয়াস্কুল কর তাহলে এমনভাবে রিযিক প্রদান করা হবে যেমন পাখীদেরকে পৌঁছানো হয়। সকালে খালী পেটে বের হয়। বিকালে ভরপেটে ফিরে আসে। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৩৪৯, মুসনাদে আহমদ-৩৭২)

## ৮. খোদাপ্রীতি

মুহব্বতের হাকীকত হল যেমন প্রতিটি সুস্বাদু জিনিস মানুষের প্রিয় হয়ে থাকে। আর প্রিয় হওয়ার অর্থ হলঃ মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়। মনের এ আকর্ষণ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে তখন তাকে “ইশক” বলে।

অতএব আল্লাহ তা‘আলার মুহব্বাত প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত। যেহেতু মুহব্বাত করা হয় তিনটি কারণেঃ ১। ‘জামাল’ (সৌন্দর্য) ২। কামাল (গুণ) ৩। নাওয়াল (দান)। আর বলাই বাহুল্য যে, এ তিনটি বিষয় আল্লাহর মধ্যেই পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ

আর যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান আনে তারা তো তাঁকেই সর্বাধিক পরিমাণে ভালবাসে। (বাকারাহঃ১৬৫)

অন্যত্র বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নেক বান্দাদেরকে ভালবাসেন আর তাঁর নেক বান্দারাও আল্লাহকে ভালবাসে। (সূরা মাইয়িদাহ আয়াত নং-৫৪)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহব্বাত সমস্ত জিনিস অপেক্ষা বেশী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-১৪)

### ৯. রেযা বিল কাযা বা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

মুসলমানদের শানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। (সূরায়ে বাইয়্যিনাহ আয়াত-৮)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে কোন মুসীবতে লিপ্ত করেন।” (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৪০১, মুসনাদে আহমদ-৫/২৩৬৯৭)

তখন যদি সে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে তবে তাকে নির্বাচিত করেন। এ মাকাম হাসিল হওয়ার পর বান্দার দুনিয়াবী কোন পেরেশানী থাকে না। এক হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ মুমিনের ব্যাপারটি বড় আশ্চর্যজনক কেননা তার সকল কাজই মঙ্গলময়। যদি কোন মুসীবতে নিপতিত হয় তাহলে ধৈর্য ধারণ করে যা তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হয় তাহলে সপ্রশংস শোকর আদায় করে। (মুসলিম হাদীস নং-২৯৯৯)

### ১০. মৃত্যু চিন্তা যা তার জন্য মঙ্গলজনক

মৃত্যু বড় ভয়ানক জিনিস। আর মৃত্যুর পরের ঘটনাবলী তার চেয়েও বেশী ভয়াবহ। এজন্য বেশী বেশী মৃত্যুর স্মরণ করা উচিত। কেননা এর দ্বারা দুনিয়ার মুহব্বাত বিদূরিত হয়। এবং আখেরাতের ফিকির ও মুহব্বাত বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। (আনকাবূতঃ ৫৭)

অন্যত্র বলেছেনঃ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু এসে তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি তোমরা যদি কোন মযবুত দূর্গেও থাক। (সেখানেও মৃত্যু এসে হাযির হবে) (নিসা-৭৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা সমস্ত স্বাদ নিঃশেষকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-২/৭৯৪৪, তিরমিযি শরীফ-২৩১২)

## ষষ্ঠবিংশ অধ্যায় অহংকার বর্জন ও বিনয় অর্জনের উপায়

নিম্নে লিখিত পদ্ধতিগুলো অবস্থা ও সুযোগ অনুযায়ী লৌকিকতাবশত হলেও অবলম্বন করবে।

১। চিকিৎসার প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যহ নির্ধারিত সময়ে আধাঘণ্টা বা তার কম সময় একাগ্রচিত্তে কোন নির্জন স্থানে বসে নিজের সৃষ্টি, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত এ তিন বিষয়ে চিন্তা করবে। অর্থাৎ, এভাবে চিন্তা করবে যে, আমার আসল অবস্থা হলঃ-

- নাপাক পানির ফোটা থেকে আমার সৃষ্টি।
- অতঃপর নাপাক রক্তের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়েছি।
- এবং বর্তমানেও সারা শরীর নাপাকীতে পরিপূর্ণ কারণ শরীরের মধ্যে রক্ত, পেশাব ও পায়খানা আছে।
- পেটের নাপাকী তো আরো দুর্গন্ধযুক্ত। সর্বদা এ নিয়েই তো বিচরণ করছি। এর থেকে সামান্য বায়ু বের হলে পার্শ্ববর্তী লোকদের তো কষ্ট ও ঘৃণা হয়ই নিজেরও কষ্ট ও লজ্জিত হতে হয়।

আল্লাহ তা‘আলা নিজ গুণে এগুলোকে গোপন রেখেছেন যে পেটের ঐ নাপাকী দৃষ্টিতেও আসে না এবং সর্বদা প্রকাশও হয় না।

- পেট পূর্ণ হওয়ার পর তা ময়লা আকারে সহজভাবে নির্জনস্থানে বের করার ব্যবস্থা করেছেন। যদি তা বন্ধ হয়ে যেত তাহলে কতইনা মুসীবত হতো।
- এমনিভাবে মৃত্যুর পর এ নাপাক শরীরকেও গোসল দিয়ে আতর খুশবু লাগিয়ে আল্লাহ তা‘আলা নিজ গুণে মাটিতে গোপন করার হুকুম দিয়েছেন।

অন্যথায় যদি এ মৃত শরীর দু তিন দিন মাটির উপর থাকত তাহলে দুর্গন্ধে মানুষকে ঘর বাড়ি ও এলাকা ছাড়তে হতো। সকলে পেরেশান হতো।

অতঃপর কবরের মধ্যে এ সুন্দর চেহারা-নাক কান চক্ষু গোস্ত পঁচে গলে পোকামাকড়ের খাদ্য হয়ে মাটির সাথে মিশে যায়, দুনিয়াবাসীর জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না, এগুলো আল্লাহ তা‘আলা নিজ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই না।

(২) শাসকবর্গ ও ধনাঢ্য লোকদের সাথে উঠাবসা এবং তাদের সাহচর্য ত্যাগ করবে। চাই এতে দীনের দাওয়াত এবং অভাবগ্রস্থ লোকদের সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদি কল্যাণজনক কাজ হাত ছাড়া হোক না কেন।

(৩) গরীবলোকদের সাথে থাকবে, তাদের দাওয়াত কবুল করবে। তাদের কাজ কর্ম করে দিবে। সাধারণ লোকদের খেদমত করবে।

(৪) চাকর, নওকর, সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও ঘরের কাজ কর্ম যেমনঃ বাজার সদাই, শাক সবজি আটা ময়দা ইত্যাদি নিজেই শক্তি অনুযায়ী বহন করতে চেষ্টা করবে। অপারগতা ছাড়া মজদুর তালাশ করবে না বরং যে পয়সা মজদুরকে দিতে সেটা গোপনে দান করে দিবে।

(৫) সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে কেউ হোক না কেন প্রথমে নিজে তাকে সালাম দিবে। কখনো অন্যের সালামের আশা বা অপেক্ষা করবে না। এটা অহংকারের আলামত।

এ ব্যাপারে বিনয়ী এবং সাধারণ লোকদের খেদমতই বেশী উপকারী। মাশায়েখে কিরামের খেদমত তো গর্ব ও বড়ত্বের জিনিস।

(৬) নিজের ব্যাপারে গীবত কুৎসা রটনা, অপবাদ ইত্যাদি শুনে প্রতিবাদ ও নিজের সাফাইয়ের ফিকির করবে না। বরং নিজের আত্মিক দোষ ত্রুটিতে সামনে রেখে শুকরিয়া আদায় করবে যে, আমার অসংখ্য দোষত্রুটির মধ্য থেকে অনেক অল্পই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর মধ্যে আমারই ফায়দা হয়েছে যে, গুনাহসমূহের কিছু কাফফারা হয়ে গেছে। এবং গীবতকারী তার নেকীগুলী আমাকে হাদিয়া দিয়েছে। সুতরাং তার উপর রাগ করা অনর্থক কাজ, কারণ নেকীর হাদিয়া তো আপনজনও দিবে না।

(৭) কখনো যদি গোস্বা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে ছোটদের থেকেও ক্ষমা চেয়ে নিবে। এ ব্যাপারে লজ্জা শরমকে প্রশ্রয় দিবে না। কারণ জুলুম হয়ে থাকলে হাশরের ময়দানের আযাব দুনিয়ার সামান্য লজ্জা থেকে অনেক কঠিন হবে।

(৮) কেউ যদি তোমার হক নষ্ট করে অথবা তোমার উপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে নিজ হক উসূল করার বৈধ চেষ্টাতে দোষ নেই। তবে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে না।

(৯) সকলের সহীহ ও সঠিক উপদেশ ও রায় মানার জন্য তৈরী থাকবে। তবে শর্ত হল এ নসীহত তবীয়তের খেলাপ হতে পারে। কিন্তু শরী'আতের খেলাপ না

হতে হবে। যদি কোন বিষয় একেবারে বুঝে না আসে তাহলে যোগ্য কারো সাথে মাশওয়ারা করে নিবে।

(১০) যদি সদকা, যাকাত ইত্যাদি গ্রহণের উপযুক্ত হও এবং গ্রহণও করো তাহলে গোপনে নেওয়ার পরিবর্তে প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে নিবে। সাধারণ সদকার তুলনায় যাকাত বেশি নিবে কেননা এতে বিনয় বেশি প্রকাশ পায়।

তারপর নিজের প্রয়োজন না হলে তা সদকা করে দিবে। কেননা দান সদকা করাও কিবিরের এক বড় চিকিৎসা।

(১১) মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে এবং যেখানেই সুযোগ হয় পূর্ণ চেষ্টা করে ইহতেমামের সাথে মৃতের দাফন কাফনের মধ্যে শরীক হবে। বিশেষ করে নিজ হাতে গোসল দিবে, কবরে রাখবে। যদি গোসল দেয়ার অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে কমপক্ষে মৃতের শরীরে পানি ঢেলে দিবে অথবা অন্য কোন খেদমত আঞ্জাম দিবে।

(১২) নির্জনে উপরোল্লিখিত বিষয়ের মোরাকাবা করবে। সাথে সাথে অহংকারী ও বিনয়ী লোকদের ঘটনাবলীও পড়তে থাকবে। এরজন্য ‘আকাবির কা তাকওয়া’ ‘আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ’ ইত্যাদি কিতাবসমূহ অনেক উপকারী।

অহংকারের চিকিৎসার ব্যাপারে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. এর অমূল্যবাণী তিনি বলেনঃ এক হাদীস শরীফে এসেছে-

تَمَعَّدُوا وَاحْشَوْشُنُوا وَأَمْسُوا حُفَاةً

অর্থাৎ, সাদাসিধা খাওয়া দাওয়া কর, মোটা কাপড় পরিধান কর, কখনো কখনো জুতা ছাড়া চলাফেরা কর। এছাড়া অহংকারের চিকিৎসা এটাও যে, জামা, পায়জামা সুন্নাত তরীকায় পায়ের গোছার মাঝামাঝি পর্যন্ত পরিধান করবে। জামা কাপড় তালি লাগানো ছাড়া পরিত্যক্ত করো না। কখনো কখনো সাধারণ খাবার যেমন : সিরকা, নিম্নমানের খেজুর ইত্যাদি খাও। কখনো কখনো সাধারণ বাহনেও যেমন রিকশায় আরোহন কর। এসব আমল অহংকারের চিকিৎসার নিয়তে কর।

(শাইখুল হাদীস কুতবুল আলম হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর রচিত উম্মুল আমরায কিতাব থেকে সংগৃহীত)

সপ্তবিংশ অধ্যায়  
হক্কানী উলামায়ে কেরামের নিদর্শন

১. হক্কানী উলামায়ে কিরাম আপন ইলম দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করেন না। আলেম হলে কমপক্ষে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা, উহার অপবিত্রতা ও হীনতার অনুভূতি থাকতে হবে। আর আখেরাতের আয়মত, উহার স্থায়িত্ব ও উহার নিয়ামতের পবিত্রতার অনুভূতি থাকতে হবে। এ কথা উপলব্ধি করে যে, দুনিয়া এবং আখেরাত দুটি বিপরীতমুখী বস্তু, দুই সতীনের সমতুল্য। একজনকে রাজী করলে অপরজন নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি এমন ইলম যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তা শুধু দুনিয়া পাওয়ার জন্য অর্জন করে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের স্রাণও পাবে না।’ (আবু দাউদ হাঃ নং-৩৬৬৪, মুস্তাদরাকে হাকেম-১/৮০)

উল্লেখ্য, এর দ্বারা মসজিদে ইমামতী বা মাদরাসায় শিক্ষকতা করে বিনিময় নিষেধ করা হয়নি বরং ইলম শিখেও ইলমী খেদমত সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নিরেট দুনিয়া উপার্জনে মশগুল হওয়া, যেমন বিদেশে গিয়ে টাকা উপার্জনে মশগুল হওয়া, অনুরূপ ইলমের দ্বারা আমীর উমারা বা ভ্রাতা ব্যক্তি বা দলের দালালীর বিনিময় গ্রহণ বুঝানো হয়েছে। (সংকলক)

২. তাঁদের কথা ও কাজে গরমিল না হওয়া অর্থাৎ, এমন না হওয়া যে অপরকে নছীহত করে অথচ নিজে আমল করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “কী গজবের কথা যে, অন্যকে উপদেশ দিচ্ছে আর নিজের খবর নিচ্ছে না! অথচ তোমরা আল্লাহর কিতাবও পাঠ করে থাকো। (সূরয়ে বাক্বারা, আয়াত-৪৪)

৩. তাঁরা এমন ইলমে মশগুল হবে যা পরকালে কাজে আসবে ও নেক কাজে আগ্রহী হবে। এমন ইলম হতে বেঁচে থাকবে যা দ্বারা পরকালে কোন ফায়দা হবে না। বা হলেও খুব কম। যে বিদ্যা দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করা হয়, আমরা মূর্খতা বশতঃ উহাকেও ইলম মনে করি, অথচ উহা ইলম নয়।

৪. তাঁরা উন্নতমানের খানাপিনা ও পোষাক-পরিচ্ছদের চাকচিক্যের দিকে মনোযোগী হবে না, বরং এসব ব্যাপারে মধ্যমপন্থা ও বুয়ুর্গানের তরীকা গ্রহণ করবে। এসব ব্যাপারে যত বেশী সাধারণ বস্তুর দিকে তার লক্ষ্য হবে তত বেশী আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে ও আখেরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলে, ‘তোমরা আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে যথাযথ ভাবে লজ্জাবোধ কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তো আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাবোধ করে থাকি। প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, বিষয়টা এমন নয়, বরং আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে যথাযথ লজ্জিত হওয়ার অর্থ হল, মাথাকে এবং মাথা যা কিছু সংরক্ষণ করে তাকে হিফায়ত করা, উদর ও উদরের চাতুরি থেকে বেঁচে থাকা, এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের জীবনকে স্মরণ করা, আর যে ব্যক্তি

পরকালের সফলতা চায় সে দুনিয়ার চাকচিক্য বর্জন করে, যে ব্যক্তি এরূপ করল সেই মূলত আল্লাহর ব্যাপারে যথাযথ লজ্জাবোধ করল।” (তিরমিযী শরীফ-পৃষ্ঠাঃ ৫৫৪, হাদীস নং-২৪৫৮, মুসনাদে আহমাদ-১/৩৮৮ হাদীস নং-৩৬৭১)

৫. তাঁরা বাদশাহ ও সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে দূরে থাকবে। দীনী প্রয়োজন ছাড়া তাদের নিকট মোটেই যাবে না, স্বয়ং তারা আসলে খুব কমই সাক্ষাত দিবে। কেননা তাদের সহিত মেলামেশায় অনেক ক্ষেত্রে তাদের মিথ্যা প্রশংসা করতে হয়, তাদের অন্যায় আচরণের প্রতি বাধা দেয়া জরুরী হওয়া সত্ত্বেও বাধা দেয়া মুশকিল হয়। আবার তাদের মালের প্রতিও লোভ জন্মে যা একেবারেই নাজায়েয। মূলকথা আমীরদের সংশ্রব হল অনেক অন্যায়ের চাবিকাঠি। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি মাঠে ময়দানে থাকে সে রুক্ষ মেজাযী হয়। যে শিকারের পিছনে লাগে সে যাবতীয় কাজ হতে গাফেল হয়ে যায়। আর যে রাজ দরবারে আনাগোনা শুরু করে সে ফেতনায় পড়ে যায়।” (আবু দাউদ শরীফ-৪৩৫ হাদীস নং ২৮৫৯, তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২২৫৬, নাসাঈ শরীফ হাদীস নং ৪৩০৯, মুসনাদে আহমাদ- ২/২৭৪ হাদীস নং ৮৮২২)

৬. তাঁরা ফাতাওয়া দেয়া বা মাসআলা বয়ান করার সময় খুব সতর্ক থাকে, বরং যথাসম্ভব কোন সমস্যার সমাধানপ্রার্থী আসলে তার চেয়ে আরও উপযুক্ত আলেমের নিকট তাকে সোপর্দ করে দেয়।

৭. তাঁরা বাতেনী ইলম অর্থাৎ, কলবের ইসলাহ-আত্মশুদ্ধি প্রতি বেশী যত্নবান হয়। এতে জাহেরী ইলম উন্নতি লাভ করে। (আর আমল তখনই নসীব হয় যখন বান্দা আত্মশুদ্ধি ব্যাপারে যত্নবান হয়।) (সংকলক)

৮. আল্লাহ তা‘আলার উপর তাঁদের ঈমান ও ইয়াক্বীন অধিক পরিমাণ হবে। (গায়রুল্লাহ তথা আসবাবের উপর তাঁদের ভরসা থাকে না।) (সংকলক)

৯. তাঁদের প্রতিটি কাজকর্মে আল্লাহর ভয় প্রকাশ পেতে থাকে। আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বের প্রভাব সেই ব্যক্তির পোষাক, অভ্যাস, কথা-বার্তা, চুপ থাকা ইত্যাদিতে প্রকাশ পাবে। তাদের সূরত দেখলে আল্লাহর স্মরণ তাজা হবে। নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়, সহনশীলতা তাঁদের অভ্যাসে পরিণত হবে। বেহুদা কথা ও ঠাট্টা-মস্কারী হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, এগুলো অহংকারের চিহ্ন ও আল্লাহর প্রতি নির্ভয়ের নিদর্শন।

১০. তাঁদের অধিক মনযোগ হল ঐসব মাসআলার প্রতি যা জায়েয-নাজায়েয বিষয়ক আমলের সহিত সম্পর্কযুক্ত। যেমন, অমুক জিনিস দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়। তারা মানতেক-ফালসাফা ইত্যাদি তর্কশাস্ত্রের পিছনে তেমন পড়ে না, যা দ্বারা লোকে তাঁদেরকে দার্শনিক বা যুক্তিবাদী মনে করে।

১১. তাঁরা কাউকে অন্ধভাবে অনুকরণ অনুসরণ করে না, বরং নিজেদের ইলম দ্বারা সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে শুধুমাত্র হযূরে পাক (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের) তাবেদারী করে, আর এটা হয় সাহাবীদের রাযি. অনুকরণের মাধ্যমে, কেননা তাঁরা প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

১২. তাঁরা কঠোরভাবে বিদ‘আত হতে আত্মরক্ষা করে। একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের আমল ও আদর্শ তালাশ করে তার উপর আমল করে। কারো নিকট লোকদের অতিমাত্রায় আনাগোনা দেখেই তাকে মকবূল বলে মনে করে না। (বিঃ দ্র: বিস্তারিত জানার জন্য ফাযায়েলে সাদাকাতে দ্বিতীয় খন্ড- ৩২০ পৃষ্ঠা থেকে ৩৩২ পৃষ্ঠা দেখুন)

## অষ্টবিংশ অধ্যায়

### ইসলাহী চিঠিপত্র লেখার নিয়ম

- ১। একদম উপরে বিস্মিহী তা‘আলা।
- ২। সালাম লিখার পর বিষয়বস্তু শুরু করবে।
- ৩। কাগজের মধ্যে লম্বা ভাবে মাঝখানে ভাজ করবে, তার পর ডান অর্ধেকে লিখবে এবং বাম অর্ধেকে জবাবের জন্য খালি রাখবে।
- ৪। ইসলাহী সম্পর্ক কায়ম এর এজাযত না নিয়ে ইসলাহী চিঠি লিখবে না।
- ৫। প্রত্যেক চিঠির উপরে বিস্মিহী তা‘আলার নীচে চিঠি নং..... লিখবে।
- ৬। চিঠি খামের ভিতরে দিবে, খামের উপর শুধু নিজের নাম ও ঠিকানা লিখবে (এটা হাতে হাতে নেয়ার ক্ষেত্রে)।
- ৭। প্রত্যেক চিঠির সাথে আগের চিঠির ফটোকপিও দিয়ে দিবে।
- ৮। এক চিঠিতে একটা সমস্যার বেশি উল্লেখ করবে না, এক পাতার ভিতরে শেষ করতে চেষ্টা করবে, একান্ত ঠেকার কথা ভিন্ন।
- ৯। পরামর্শ অনুযায়ী কতটুকু আমল করা হয়েছে? এবং ফলাফল কি? তা অবশ্যই উল্লেখ করবে।
- \* চিঠির শেষে নাম ঠিকানা ও তারিখ লিখবে।

## উনত্রিশতম অধ্যায়

বাংলাদেশে মুহিউস্‌সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক

[www.darsemansoor.com](http://www.darsemansoor.com)



## সাহেব রহ.-এর খুলাফায়ে কেরামের তালিকা

### জরুরী আরয,

হযরতওয়ালা হারদুঈ রহ. “ফিহরেস্তে মুজাযীনে বাই‘আত ও সোহবত” নামক কিতাবের ভূমিকায় বলেনঃ

১। এদের (খুলাফাদের) কারো সাথে ইসলামী সম্পর্ক কয়েম করতে হলে তার তখনকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিবে যে, সে শরী‘আতের উপর আছে কি না? শুধুমাত্র আমার এ অনুমতির উপর ভিত্তি করে তাঁর সাথে সম্পর্ক কয়েম করবে না।

২। আর তাদের কারো থেকে যদি শরী‘আত বিরোধী কোন কাজ অন্য কারো দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে প্রকৃত অবস্থা জেনে তাঁর সংশোধনের ফিকির করবে এবং আমাকেও অবগত করাবে।”

১। হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব রহ.

খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া

৭৬ নং ঢালকা নগর, ঢাকা।

২। হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবরহ.

মহাপরিচালক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা

মোবাইল: ০১৮১৯-২৫৮৪৪

৩। হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব রহ.

মুহাদ্দিস, জামি‘আ ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া

৩১২, দঃ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

৪। হযরত মাওলানা প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব (দা:বা:)

আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক,

রমনা হালকা, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৭১১-৬৯৮৯৫১, ফোন: ৮৯১৬৩৫৯

৫। হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব (দা:বা:)

মুহতামিম, জামি‘আ ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া

৩১২, দঃ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

মোবাইল : ০১৭১-৫২৪১৭৬, ফোন : ৭৫১৯২৬৫

৬। হযরত মাওলানা মুফতী শামসুদ্দীন সাহেব (দা:বা:)

মুহাদ্দিস, জামি‘আ ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮-৬৬৫১১৩, ফোন: ০৩১-৭২২৩৪৮

৭। হযরত মাওলানা শফীউল্লাহ সাহেব (দা:বা:)  
মুহাদ্দিস, গওহরডাংগা মাদরাসা, গোপালগঞ্জ,  
মোবাইল : ০১৭১-৭২২৪৪৪

৮। হযরত মাওলানা মুফতী মনসুরুল হক সাহেব (দা:বা:)  
শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী,  
জামি'আ রাহমানিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭,  
মোবাইল : ০১৭১২-৭৯৭১৮১, ফোন: ৮১৫০১৮৬

৯। হযরত মাওলানা প্রফেসর গিয়াসুদ্দীন সাহেব (দা:বা:)  
আমীর, দাওয়াতুল হক, লালবাগ হালকা, ঢাকা  
ফোন: ৯৬৬০৫৩৫

১০। হযরত মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহেব (দা:বা:)  
মুহাদ্দিস, জামি'আ ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ,  
ফোন: ০৯৪১-৫৫২০৭

১১। হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব (দা:বা:)  
মুহতামিম, জামি'আ রাহমানিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।  
মোবাইল : ০১১৯-৪২৮৩০৫, ফোন: ৮১৫০১৮৬

১২। জনাব, প্রিন্সিপাল মিজানুর রহমান সাহেব (দা:বা:)  
নাযিম, মাদ্রাসা দাওয়াতুল হক দেওনা, কাপাসিয়া, গাজীপুর,  
মোবাইল : ০১৭১-৫১৩৮৭৪, ফোন: ৭১২২৪৪৪

১৩। হযরত মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব (দা:বা:)  
ছাগলনাইয়া, ফেনী

১৪। হযরত মাওলানা মুহিবুল্লাহ সাহেব (দা:বা:)  
মুহতামিম, মাদরাসা আজীজুল উলূম বাবুনগর ফকীরহাট চট্টগ্রাম,  
মোবাইল : ০১৮১১-৩২৮০৬৭

১৫। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তৈয়েব সাহেব (দা:বা:)  
মুহতামিম, মাদরাসায়ে আরাবিয়া, জিরী, চট্টগ্রাম,  
মোবাইল : ০১৮১১-৩১৬৬৫৬

১৬। হযরত মাওলানা আরশাদ সাহেব (দা:বা:)  
মুহাদ্দিস, কাসেমুল উলূম মাদরাসা, বগুড়া।

মোবাইল : ০১৮-৪৬৯৬৬৭, ফোন : ৮৮২৫০৯১

১৭। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমাদ সাহেব (দা:বা:)   
মুহতামিম, ওলামা বাজার মাদরাসা, ফেনী   
মোবাইল : ০১৭১১-৩২৭৭৭১

১৮। হযরত মাওলানা মুফতী নূরুল হক সাহেব (দা:বা:)   
১৭৯ নং মুরাদপুর, জুরাইন, ঢাকা   
ফোন : ৭৪১৫০৪৮

১৯। হযরত মাওলানা আনওয়ারুল হক সাহেব (দা:বা:)   
নায়েবে মুহতামিম ও মুহাদ্দিস, জামি'আ ইসলামিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।   
ফোন : ৭৫১৯২৬৫/২১

২০। হযরত মাওলানা রফীক আহমাদ সাহেব (দা:বা:)   
মুহাদ্দিস, জামি'আ ইসলামিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।   
ফোন: ৭৫১১৯৪৪, ৭১৬৬১৬১

২১। হযরত মাওলানা মুফতী উবাইদুল্লাহ সাহেব (দা:বা:)   
মুহাদ্দিস, জামি'আ আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা,   
মোবাইল : ০১৭১-৩২১১১১, ফোন: ৭১২১৩৮২

২২। হযরত মাওলানা মুফতী সুহাইল সাহেব (দা:বা:)   
মারকাজে ফিকরে ইসলামী বসুন্ধরা, ঢাকা   
মোবাইল : ০১৮১১-২৫১৯৭৫

২৩। হযরত মাওলানা মুফতী মিজানুর রহমান সাহেব (দা:বা:)   
মারকাজে ফিকরে ইসলামী বসুন্ধরা, ঢাকা,   
মোবাইল : ১০৮-২৫১০৭০

২৪। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ সাহেব (দা:বা:)   
মুহতামিম, জামি'আ ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ,   
মোবাইল : ০১৭১১-১৪৪৬৩৭, ফোন: ০৯৪১-৫৫২০৭১

২৫। হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব (দা:বা:)   
মুহতামিম, ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা,   
মোবাইল: ০১৮১-২৪৯৩৩৮১, ফোন: ৭৪১০২৩৫, ৭৫১৪০০৩

২৬। জনাব হাজী মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ সাহেব (দা:বা:)   
৬৯/৮-এ ধানমন্ডি-, ঢাকা, ফোন: ৮১১১৫২৬, ৯১১১২০৯

২৭। আলহাজ্ব নাজিমুদ্দীন আহমাদ (মুজাযে সোহবত)  
নায়েবে আমীর, দাওয়াতুল হক উত্তরা হালকা, ঢাকা  
মোবাইল: ০১৯৩৪৯৫৫৯, ফোন: ৮৯১২৬২৫

### ত্রিশতম অধ্যায়

**হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ.  
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মজলিসে দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

প্রত্যেক এলাকায় মজলিসে দাওয়াতুল হকের একটি হালকা বা কমিটি থাকবে। যার মধ্যে একজন আমীর থাকবেন এবং এক বা একাধিক নায়েবে আমীর থাকবেন। বাকী সকলে সদস্য থাকবেন। আর একটি মসজিদকে মারকায হিসাবে নির্ধারিত করে নিবেন। জরুরী খরচ সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত দানের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। এর জন্য ব্যাপকভাবে কোন চাঁদা আদায় করা যাবে না। এবং উক্ত কমিটি নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবে।

১. মজলিসে দাওয়াতুল হকের বুনিয়াদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনে কারীমের সহীহ তা'লীমকে সর্বস্তরের মুসলমানদের মধ্যে চালু করা। যাতে ভুল ও মাজহুল পড়া বন্ধ হয়। এর জন্য মারকাযের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং বিশুদ্ধ সুন্নাহের তা'লীমকে ব্যাপক করে আমাদের আমলের ইসলামে করা। বিশেষ করে আমর বিল মারুফ এর সাথে নাই আনিল মুনকার-এর উপর গুরুত্বারোপ করা। এর জন্য প্রত্যেক মসজিদে মুসল্লিদের সামনে গুনাহে কবীরাসমূহ তুলে ধরা এবং তার দুনিয়াবী ক্ষতিও বর্ণনা করা।

২. মজলিসের আরাকীন তথা মজলিসে দাওয়াতুল হকের কমিটির সদস্যদের মাসে একবার বৈঠকের আয়োজন করা। সেখানে তারা সুন্নাহের মুযাকারা ও মশক করবেন। গত মাসের কারগুয়ারী শুনবেন এবং সামনের মাসের কাজের প্রোগাম বানাবেন।

৩. সর্ব সাধারণের মধ্যে সুন্নাহের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট দিনে যেমন ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার মাসিক ইজতিমার ব্যবস্থা করা। যেখানে সুন্নাহের আলোচনা এবং আমলী মশকের ব্যবস্থা থাকবে।

৪. মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, কারো বাড়ী বা অন্য যে স্থানে সম্ভব মারকাযের পক্ষ থেকে মাসে চারটি গাশতী মাহফিলের ইত্তিজাম করা। এবং সেখানে খানা-পিনা বা চা নাস্তার ব্যবস্থা করতে নিষেধ করা।

৫. এলাকার সকল মসজিদে এক মিনিটের মাদরাসা নামক কিতাব আর না পাওয়া পর্যন্ত কোন সুন্নাহের কিতাবের তা'লীম চালু করার ব্যবস্থা করা এবং সপ্তাহে একদিন কোন এক নামাযের পর ১৫/২০ মিনিট পর্যন্ত উযু, নামায, আযান ইকামাত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণের ইত্তিজাম করা।

৬. বছরে ২/৪ বার আইন্মায়ে মসজিদ এর সম্মেলনের আয়োজন করে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য তুলে ধরা ও বিভিন্ন বিষয়ে আমলী মশক করানো।

৭. যে সব এলাকায় মসজিদ বা মাদরাসা নেই সেসব এলাকায় মসজিদ ও ফুরকানিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা।

৮. রমায়ান মাসে বিনা পারিশ্রমিকে খতমে তারাবীহর নামায পড়ানোর জন্য মুখলিস হাফেয নিয়োগের ইত্তিজাম করা।

৯. মসজিদে সুন্নাহ তরীকায় গুনাহমুক্ত পরিবেশে বিবাহের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। এবং বিবাহের বদ রসম বুঝিয়ে বন্ধ করা।

১০. কারো ইত্তিকাল হয়ে গেলে সুন্নাহ তরীকায় কাফন-দাফন ও মায়িতের হুকুমের ব্যয়ানের ব্যবস্থা করা। কাফন-দাফন এবং বিশেষ করে সওয়াব রেসানীর গলদ পদ্ধতিগুলো জনসাধারণকে বুঝিয়ে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা।

১১. খেদমতে খালক তথা : দুঃস্থ মানবতার সেবা করা। যেমন : ইয়াতীম, গরীব এবং অসহায় ছেলে মেয়েদের দীনী তা'লীমের ব্যবস্থা করা। বিধবা বা নিঃস্ব ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান তথা আয়ের ব্যবস্থা করা। দুর্ভিক্ষ বা ঝড়-তুফানে আক্রান্ত লোকদের প্রয়োজনীয় খেদমত করা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি।

### সং কাজের আদেশ এবং অসং কাজের নিষেধের গুরুত্ব

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْتَدِرُونَ عَلَى أَنْ يَغْيِرُوا عَلَيْهِ فَلَا يَغْيِرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا » [سنن أبي داود ح: ٤٣٤١]

হযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : যদি কোন ব্যক্তি বা জাতীর মধ্যে কোন ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় এবং ঐ কওম বা জামা‘আতের মধ্যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে উক্ত গুনাহ হতে বাধা না দেয়, তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে যায়। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৩৩৯)

কুতুবুল আলম শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন : হে আমার মুখলিস বুয়ুর্গ এবং ইসলাম ও মুসলমানের উন্নতিকামী বন্ধুগণ ! ইহাই

হল মুসলমানদের ধ্বংস ও ক্রমবর্ধমান অবনতির কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরিচিত ও সমপর্যায় লোকদেরকে নয় বরং আপন পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি, অধীনস্থ ও ছোটদের প্রতি একটু লক্ষ্য করে দেখুন। তারা কি পরিমাণ প্রকাশ্য গুনাহের মধ্যে লিপ্ত আছে; আর আপনারা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা তাদেরকে বাধা প্রদান করছেন কিনা। বাধা দেওয়ার কথা বাদ দিন, বাধা দেওয়ার এরাদাই বা করেন কিনা। অথবা এই আশংকা আপনার মনে আসে কিনা যে, আমার প্রিয় পুত্র কি করছে। যদি সে সরকারের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় কাজ করে বা অপরাধও নয় শুধু সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক সভা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে, তবে আপনিও তাতে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে চিন্তিত হয়ে যান। তাকে শাসন করা হয় এবং নিজে নির্দোষ ও দায়মুক্ত থাকার জন্য বিভিন্ন রকম তাদবীর করা হয়। কিন্তু আহকামুল হাকেমীন আল্লাহর নাফরমানের সাথেও কি সেই আচরণ করা হয় যা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নগণ্য সরকারী অপরাধীর সাথে করা হয়।

আপনি ভাল করেই জানেন আপনার প্রিয় পুত্র দাবা খেলায় আসক্ত, তাসখেলায় (টি ভি, ভি সি আর এর মধ্যে) ডুবে থাকে, কয়েক ওয়াক্তের নামায ছেড়ে দেয়। কিন্তু আফসোস! কখনও আপনার মুখ হতে ভুলেও এই কথা বের হয় না যে, বেটা! কি করছ? এ তো মুসলমানের কাজ নয়। অথচ তার সাথে খানাপিনাও ছেড়ে দেওয়ার লুকুম ছিল।

এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে, যারা ছেলের উপর এই জন্য নারাজ যে, ছেলে অলস ও ঘরে বসে থাকে; চাকরির চেষ্টা করে না অথবা দোকানের কাজে মনোযোগ দেয়া না; কিন্তু এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাবে যারা ছেলের উপর এই জন্য নারাজ যে, সে জামাআ'তে নামায আদায় করে না কিংবা নামায কাযা করে দেয়।

বুয়ুর্গ ও বন্ধুগণ! দীনের প্রতি উদাসীনতা যদি শুধু আখেরাতের জন্যই ক্ষতিকর হতো তবুও ইহা হতে বহুদূরে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সর্বনাশ তো এই যে, যে দুনিয়াকে আমরা কার্যত আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি, সেই দুনিয়ার ধ্বংসও দীনের প্রতি এই উদাসীনতার কারণেই হচ্ছে। চিন্তা করুন- এই অন্ধত্বের কি কোন সীমা আছে?

{وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا} [الإسراء: ৭২]

অর্থাৎ, এই দুনিয়াতে (দীনের ব্যাপারে) যারা অন্ধ থাকবে তারা আখেরাতেও অন্ধ থাকবে। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৭২)

আসল কথা, যেন এই আয়াতের প্রতিচ্ছবি-

{خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة : ٧]  
অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর ও তাদের কানের উপর সিল-মোহর  
মেরে দিয়াছেন এবং তাদের চোখের উপর পর্দা পড়ে আছে। (সূরা বাকারা, আয়াত-৭)

وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال  
لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قالوا يا رسول  
الله وما الاستخفاف بحقها قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. رواه  
الأصبهاني أيضا. [الترغيب والترهيب ح: ٣٤٩٨]

(২) হযুর সাব্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: কালেমায়ে তাওহীদ  
লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) ইহার পাঠকারীকে সর্বদা উপকার  
করতে থাকে এবং তার উপর হতে আযাব ও বালা-মুসীবত দূর করতে থাকে  
যতক্ষণ পর্যন্ত উহার হক আদায়ের ব্যাপারে বেপরোয়াভাব ও অবহেলা না করা  
হয়। সাহাবীগণ রাযি. আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহার হক আদায়ের  
ব্যাপারে বেপরোয়াভাব ও অবহেলা না করার অর্থ কি? উত্তরে হযুর সাব্লাল্লাহু  
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন : প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করা  
হয়, আর উহাকে বন্ধ করার কোন চেষ্টা করা হয় না। (তারগীব : ইসবাহানী)

এখন আপনিই একটু ইনসারফ করে বলুন, বর্তমানে আল্লাহর নাফরমানীর কি  
কোন সীমারেখা আছে? এবং উহাকে বাধা দেওয়ার অথবা বন্ধ করার কিংবা  
কিছুটা কমিয়ে আনার কি কোন চেষ্টা চলছে? নিশ্চয়ই না। এরূপ ভয়াবহ  
অবস্থায় মুসলমান যে জগতের বুকে টিকে আছে তাই আল্লাহ তাআ‘আলার  
বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহমাত্র। নতুবা আমরা আমাদের ধ্বংসের জন্য কোন কাজটি  
করতে বাকী রেখেছি?

হযরত আয়েশা রাযি. নবী কারীম সাব্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা  
করেন, দুনিয়াবাসীর উপর যদি আল্লাহর আযাব নাযিল হয় এবং সেখানে কিছু  
দীনদার লোকও থাকেন, তবে তাদেরও কি কোন ক্ষতি হবে? হযুর সাব্লাল্লাহু  
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন: দুনিয়াতে তো সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।  
কিন্তু আখেরাতে তারা গুনাহগারদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। অতএব, ঐ সমস্ত  
লোক যারা নিজেদের ধর্ম-কর্মের উপর নিশ্চিত হয়ে লোক সমাজ হতে দূরে  
সরে নির্জনে বসে রয়েছেন, তারা যেন তা হতে বে-ফিকির না থাকেন। কেননা,  
খোদা না করুন, যদি পাপের ব্যাপকতার কারণে কোন আযাব এসে পড়ে তবে  
তাদেরকেও এর স্বাদ ভোগ করতে হবে। (শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. কৃত  
ফাযায়েলে তাবলীগ থেকে সংগৃহীত)

## একত্রিশতম অধ্যায়

হযরত খানভী রহ. এবং হযরত ইলিয়াস রহ.- এর অভিন্ন তা'লীম

হযরত হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী রহ. বর্ণনা করেছেনঃ

তাকওয়া বা পূর্ণ দীন সর্বমোট পাঁচটি বিষয় বস্তুর সমষ্টিকে বলা হয় । (১) ঈমান আকাইদ দুরস্ত রাখা অর্থাৎ ইসলামের মূল বিষয়গুলি যা ঈমানে মুফাসসালের মধ্যে উল্লেখ আছে তাতে অটল বিশ্বাস রাখা (২) ইবাদত বন্দেগী সুন্নাত মুতাবেক হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত এমন ভাবে করা দরকার যা তাঁর মনোনীত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে গেছেন। (৩) মু'আমালাত দুরস্ত রাখা অর্থাৎ বিজ্ঞ উলামাদের থেকে জেনে নিয়ে রিযিক পূর্ণ হালাল ও সহীহ রাখা। (৪) মু'আশারাত অর্থাৎ বান্দার হক তথা লোকদের সহিত আচার ব্যবহার ভাল করা, তাদের হক আদায় করা, যাতে কারো কষ্ট না হয়। (৫) তাসাওউফ বা তাকিয়ায়ে বাতেন অর্থাৎ দশটি রোগ সহ সমস্ত গুনাহ থেকে আত্মাকে পবিত্র করা এবং দশটি গুনের দ্বারা অন্তরকে সজ্জিত করা। (সূরা বাকারা : ১৭৭ , বুখারী শরীফ ১: ৬ বাবু উমুরিল ঈমান, আদাবুল মু'আশারাত : ১১, তালীমুদ্দীন)

উক্ত পাঁচটি জিনিস বাস্তবায়ন করতে হলে তিন লাইনে মেহনত করতে হবেঃ

(১) তাবলীগ তথা উভয় জগতে কামিয়াবীর একমাত্র রাস্তা দীনের উপর চলা, একথা বুঝিয়ে দীনের উপর চলতে উৎসাহিত করা। (২) তা'লীম তথা ইসলামের আদেশ নিষেধ মানুষকে শিক্ষা দান করা। (৩) তাকিয়া অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি করা, আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতে গিয়ে দিলের থেকে বদ খাছলাত দূর করে ভাল আখলাক অর্জন করা। এই তিনটি পদ্ধতির কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে চার জায়গায় উল্লেখ করেছেন। (সূরা বাকারা : ১২৯ ও ১৫১ (২) সূরা আল ইমরান: ১৬৪ (৩) সূরা জুম'আ: ২)

মুসলিহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. কর্তৃক তাবলীগের ছয়টি সিফাত নির্ধারিত করা হয়েছেঃ

(১) কালিমা (২) নামায (৩) ইলম ও যিকির (৪) ইকরামুল মুসলিমীন (৫) তাসহীহে নিয়্যাত (৬) তাবলীগ।

উক্ত ছয়টি সিফাতের মধ্যেই দীনের জরুরী পাঁচটি বিষয় রয়েছেঃ

(১) ঈমান আকাইদ দুরস্ত করা রয়েছে প্রথম সিফাত কালিমার মধ্যে (২) ইবাদত বন্দেগী সহীহ করা রয়েছে দ্বিতীয় সিফাত তথা নামাযের মধ্যে (৩) ও (৪) মু'আমালাত, মু'আশারাত সহীহ করার তা'লীম রয়েছে চতুর্থ সিফাত ইকরামুল মুসলিমীন এর মধ্যে। কারণ যাদের অন্তরে মুসলমান ভাইয়ের



আজমত ও মুহাব্বত থাকবে তাদের লেন-দেন ও বান্দার হক সহীহ ভাবে আদায় হবে। (৫) তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি রয়েছে তাসহীহে নিয়তের মধ্যে।

**উক্ত আমলগুলী বাস্তবায়নের তিনটি পদ্ধতিও ছয়টি ছিফাতের মধ্যে রয়েছেঃ**

(১) তাবলীগের গুরুত্ব যা ষষ্ঠ সিফাত, এর দ্বারা ঈমান মজবুত হয়। (২) তা'লীম তথা উলামায়ে কিরাম থেকে মূল ঈমান ও ঈমানের শাখা প্রশাখা সমূহ তথা ইবাদত মু'আমালাত ও মু'আশারাত তাযকিয়া শিখে নেয়া, উহা তৃতীয় সিফাত ইলমের মধ্যে আছে। (৩) তাযকিয়া আত্মশুদ্ধি করা ইহা তৃতীয় সিফাত যিকির এর মধ্যে রয়েছে।

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত খানবী রহ. এবং হযরত ইলিয়াস রহ. এর তা'লীম একই ছিল। সুতরাং আমাদের সকলেরই কর্তব্য পূর্ণ দীনদারী অর্জনের জন্য তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়ার মেহনতের সাথে জুড়ে থাকা। তিনটার কোন একটিকেও কম গুরুত্বপূর্ণ মনে না করা।

**মুসলিহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. ইরশাদ করেন**

(১) আমাদের মেহনতের আসল উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা শিক্ষা দেয়া। (অর্থাৎ ইসলামের সম্পূর্ণ ইলমী এবং আমলী রূপরেখার সাথে উম্মতকে পরিচিত করা।) এটাই হল আমাদের আসল উদ্দেশ্য। আর কাফেলা সমূহের (বিভিন্ন জামা'আতের) এ চলাফেরা এবং তাবলীগী গাশত ইত্যাদি এগুলো হল উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য প্রাথমিক মাধ্যম। আর কালিমা ও নামাযের তালকীন ও তা'লীম আমাদের সম্পূর্ণ নেসাবের 'আলিফ' 'বা' 'তা' এর মত। এটাও সুস্পষ্ট কথা যে, আমাদের এ কাফেলা (তাবলীগী জামা'আত) দীনের সকল প্রকার কাজ করতে সক্ষম নয়। তাদের দ্বারা তো শুধুমাত্র এতটুকু হতে পারে যে, বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে নিজেদের চেষ্টা কোশেষের মাধ্যমে ঐ এলাকায় এক জাগরণ সৃষ্টি করবে এবং গাফেলদের সচেতন করে তাদেরকে স্থানীয় আহলে ইলম এর সাথে সম্পৃক্ত করার এবং উলামা ও নেক লোকদেরকে সাধারণ মানুষের ইসলামের কাজে লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। সব জায়গায়ই দীনের আসল কাজ তো ঐ এলাকার আলেমে দীনই করতে সক্ষম হবেন। আর সাধারণ মানুষের বেশী লাভ হবে স্থানীয় আহলে দীনের থেকে ইলম হাসিল করার দ্বারা। (মালফুজাত নং : ২৪, পৃঃ ৩৯)

(২) দাওয়াত ও তাবলীগের সাথীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের এ সম্পূর্ণ চলাফেরা এবং চেষ্টা প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফলে যাবে যদি এর সাথে ইলমে দীন এবং যিকরুল্লাহর পুরো ইহতিমাম আপনারা না করেন। (এ ইলম এবং যিকির পাখির ডানার মত। দুটি ডানা ছাড়া পাখি আকাশে উড়তেই পারবেনা)

অন্যথায় প্রবল আশংকা রয়েছে যে, যদি এই দুটি বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা হয় তাহলে এই প্রচেষ্টা দ্বারা (আল্লাহ না করেন) ফিত্না এবং গোমরাহীর একটি নতুন দরওয়াজা খুলে যাবে। (মালফুজাত নং : ৩৫, পৃঃ ৪৭)

এ বর্ণনার দ্বারা হযরত ইলিয়াস রহ. উলামাদের থেকে ইলম হাসিল এবং আল্লাহ ওয়ালাদের থেকে আত্মশুদ্ধি অর্জন করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

(৩) আমি প্রাথমিক অবস্থায় এভাবে যিক্র এর তা'লীম দিয়ে থাকি, প্রতি নামাযের পর তাসবীহে ফাতেমী, সকাল সন্ধ্যায় তিন তাসবীহ, একশতবার কালেমায়ে সুওম, একশতবার দরুদ শরীফ ও একশতবার ইস্তিগফার এবং বিশুদ্ধভাবে কিরাআতের সাথে কুরআন তিলাওয়াত। আর নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদের তাকীদ এবং আহলে যিক্র তথা উলামায়ে কিরাম ও মাশাইখদের কাছে যাওয়া। (মালফুজাত নং ৪৯, পৃঃ ৬২)

(৪) ইলম এবং যিক্র এর কাজ এখনও আমাদের মুবাল্লিগীনদের নিয়ন্ত্রনে আসেনি; এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত চিন্তিত। এর তরীকা এটাই যে, ঐ সমস্ত লোকদেরকে আহলে ইলম এবং আহলে যিক্র এর নিকট পাঠানো হবে, যাতে তাদের তত্ত্বাবধানে তাবলীগও করবে এবং ইলম ও সুহবত থেকেও উপকৃত হবে। (মালফুজাত নং ৪৯, পৃঃ ৭০)

এ বর্ণনার দ্বারাও হযরত রহ. উলামাদের থেকে জরুরী ইলম ও মাশাইখদের থেকে আত্মশুদ্ধি করানোর উপর তাকীদ করেছেন।

(৫) তাবলীগ জামা'আত সমূহের নিসাব তা'লীমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তাজবীদ শিক্ষা করা। অর্থাৎ কুরআনে কারীমের সহীহ শুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা করা। (মালফুজাত নং ২০২ পৃঃ ২০১)

(৬) আমাদের সকল মসজিদ মূলত মসজিদে নববীর শাখা, এজন্য আমাদের মসজিদ গুলোতে ঐ সমস্ত কাজ হওয়া চাই যা হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদে হত, সেখানে নামায ছাড়াও তা'লীম এবং তাযকিয়ার কাজও হতো এবং দীনের দাওয়াত সংক্রান্ত সমস্ত কাজও মসজিদ থেকেই হতো। (মালফুজাত নং ২০৭, পৃঃ ২০৪)

এই বর্ণনাও হযরত ইলিয়াস রহ. তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়া এই তিন লাইনের মেহনতকে মসজিদ সমূহে জারী করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর এই তিন লাইনেই আশ্বিয়া 'আলাইহিমুস সালামগণ আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

## বত্রিশতম অধ্যায়

### ওয়াজ মাহফিল করার সঠিক তরীকা

১.যেহেতু ইলমে দীন শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং দীনী মাহফিলের দ্বারা আসল উদ্দেশ্য ইলমে দীন শিক্ষা করা। সুতরাং প্রত্যেক এলাকায় হক্কানী উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে বৎসরে একাধিক বার দীনী মাহফিল করা উচিত। (সূরায় তাওবা:১২২, ইবনে মাজা হাদীস নং ২২৪, বাইহাকী হাদীস নং ১৬৬৬)

২.হক্কানী আল্লাহওয়াল্লা উলামায়ে কিরামকে দাওয়াত দিবে। বিশেষ করে যারা ওয়াজের বিনিময় গ্রহণ করেন না এমন বক্তাকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে প্রাধান্য দিবে। কারণ ওয়াজ করা আখিয়ায়ে কেলাম আ.-এর কাজ। আর এ কাজ দ্বারা তখনই উম্মতের ফায়িদা হয় যখন তা নবীগণ আ.-এর তরীকায় করা হয়। আর কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আছে যে, নবীগণ আ. ওয়াজের বিনিময় গ্রহণ করতেন না। তাঁরা একমাত্র আল্লাহ থেকে বিনিময় পাওয়ার আশায় ওয়াজ করতেন। (সূরায় ইয়াসীন:২১ শু'আরা: ১২৭)

৩.যেহেতু লম্বা ওয়াজ সাধারণ মানুষ মনে রাখতে পারে না। এজন্য রাত ১০/১১টার মধ্যেই আলোচনা করে মাহফিল শেষ করবে। আজকাল অনেক স্থানে সারা রাত ওয়াজ করার নিয়ম চালু হয়ে গেছে। এটা বন্ধ করা উচিত। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ততক্ষণ ওয়াজ করতে বলেছেন যতক্ষণ লোকদের আগ্রহ থাকে। আর মানুষের কমজোরীর কারণে সারা রাত আগ্রহ থাকে না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৩৩৭)

৪.ওয়াজের মাঝে সময়মত ইশার নামায জামা'আত কায়েম করে পড়ে নিবে। যাতে মাহফিলের মাইকের দ্বারা পার্শ্ববর্তী এলাকার মসজিদের জামা'আতের কোন ধরনের সমস্যা না হয়, মুসল্লীগণ ইশার জামা'আতের ব্যাপারে পেরেশান না হয়। এবং ওয়াজ শেষ করে ইশার নামায মাকরুহ সময়ে পড়তে না হয়। (সূরায় নিসা: ১০৩, বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬২৪৫)

৫.মাহফিলের মধ্যে কোন হক্কানী পীর শ্রোতাদের যিকিরের মশক্ করাইতে চাইলে মাইক ছাড়াই করাবে। মাইকে যিকির করা শরী'আতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। এতে আশপাশের মসজিদে এবং লোকদের অনেক সমস্যা হয়। এবং এটা যিকিরে জলীর মধ্যেও পড়ে। তাছাড়া আজকাল হক্কানী পীর নয় এমন বক্তাও নিজের খেয়াল-খুশী মত যিকির করাতে আরম্ভ করে। এটাও ঠিক নয়। (সূরায় আ'রাফ: ২০৫, মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ১৯৪৯৫)

৬.মাহফিলের মধ্যে সুন্নাহের আলোচনা করবে এবং নামাযসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরং এটা মাহফিলের মূল উদ্দেশ্যও বটে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৭৭)

৭.বয়ানের মধ্যে তারগীবী কথার সাথে যে পাঁচটি বিষয় ফরযে আইন তথা: আক্লাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত (লেন-দেন), মু'আশারাত (সামাজিকতা) এবং আখলাক (আত্মশুদ্ধি) তার উপর আলোচনা রাখবে। এরজন্য ওয়ায়েজীনদের মধ্যে ওয়াজের বিষয় বস্তু বন্টন করে দেয়া ভাল। (সূরায় বাকারা:১৭৭, বুখারী শরীফ হাঃ নং ৫০, মুসলিম শরীফ হাঃ নং ৯)

৮.লোকদের ওয়াজ মাহফিলের দাওয়াত দিয়ে তাদের থেকে চাঁদা কালেকশন করবে না। কারণ প্রচারপত্রে ওয়াজ শুনানোর ঘোষণা বা ওয়াদা করা হয়।

চাঁদার প্রয়োজন হলে জনসাধারণদের ডেকে পরামর্শ সভা করবে। এবং সাহায্যের আবেদন করবে। (সূরায় বাকারা: ৪০)

৯.ওয়াজের মধ্যে ভিত্তিহীন কিসসা-কাহিনী বলে শ্রোতাদের হাসানো বা কাঁদানোর বদ রসম বন্ধ করে দিবে। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৫০৫)

১০. কোন জাহেলকে বক্তা বানাবে না। চাই সে যত সুন্দর বয়ানই করুক না কেন। কারণ এটা ক্বিয়ামতের আলামত। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫৯, ১০০)

১১.ছুক্তি করে ওয়াজের বিনিময় নেয়া বক্তাকে বা ফাসেদ আক্বীদাহ ও বে-আমল আলেম এবং টি ভি-এর কোন আলেমকে বক্তা বানাবে না। কারণ এধরণের বক্তার বয়ানের দ্বারা জনগণের মধ্যে দীনের পরিবর্তে বদ দীনী সৃষ্টি হয়। (সূরায় বাকারা: ৪৪, মুসলিম শরীফ ১/৮৪, শু'আবুল ঈমান-বাইহাকী হাঃ নং ৯০১৬, ৯০১৮)

১২.ওয়াজের শেষে আম দাওয়াত ও শিরনী তাবরকের নামে কোন কিছু বিতরণের ব্যবস্থা করবে না। এতে লোকদের তাওয়াজ্জুহ ওয়াজের দিকে না থেকে খানার দিকে থাকে। সেক্ষেত্রে বয়ানের দ্বারা কোন উপকার হয় না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ২৬৯৭, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৭১৮, রদুল মুহতার: ২/১৪০)

১৩.ওয়াজ মাহফিল জমানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা হবে না। কারণ এ কাজের জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। এর পরিবর্তে গজল ইত্যাদি পড়তে পারবে বা ছাত্রদের বিভিন্ন প্রদর্শনী পেশ করতে পারে। নিয়মিত বয়ান-ওয়াজ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে খায়ের ও বরকতের জন্য তিলাওয়াতের দ্বারা শুরু করবে। তিলাওয়াতের সময় সকলেই কুরআন তিলাওয়াতে মনযোগ দিবে ও তিলাওয়াতের আদবের দিকে লক্ষ রেখে শুনবে। (আলমগীরী:৫/৩১৫, রদুল মুহতার: ১/৫১৮)

১৪.মাহফিলের রাস্তার মধ্যে কোন গেইট বা তোরণ বানাবে না। বা রঙ বেরঙের পতাকা লাগাবে না। এ গুলি অমুসলিমদের অনুকরণ। তেমনি ভাবে ষ্টেজের মধ্যে কোন আলোক সজ্জা করবে না। প্রয়োজনীয় লাইটের অতিরিক্ত লাইট লাগাবে না। এগুলি অপচয়। মাহফিলের বাইরে দূরে দূরে মাইক লাগাবে না। কারণ এর দ্বারা লোকদেরকে অনর্থক বিরক্ত করা হয়। (সূরায়ে বনী ইসরাইল: ২৭, ইবনে মাজা হাদীস নং ৪২৫, যিকর ও ফিকর: ২৫)

১৫.প্রচারপত্রে দিন তারিখ ও স্থান উল্লেখ করবে। বক্তাদের নাম ঘোষণার প্রয়োজন নেই। মানুষদেরকে ব্যক্তির আকর্ষণে জমা করবে না। বরং দীনের আকর্ষণে জমা করবে। কারণ ব্যক্তি চিরকাল থাকে না। এমনকি আল্লাহ না করুক অনেক ব্যক্তি হকের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ হেদায়েত করেন। আমীন! (মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীস নং ১৯৩)

১৬.অনেক বক্তা চা পানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে লোকদেরকে মীলাদ-দুর্গদে লাগিয়ে সে সুযোগে চা পান করেন। এটা দৃষ্টিকটু কাজ। দীনী উদ্দেশ্যবিহীন এধরণের দরুদ পড়াও নিষেধ। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৩৩৭, ফাতহুল বারী: ১১/১৬৭)

১৭.চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে মাহফিল করবে না। এতে লোকদের কষ্ট দেয়া হয়, যা শরী‘আত বিরোধী কাজ। সুতরাং মসজিদ বা কোন মাঠ-ময়দানের মধ্যে মাহফিলের ব্যবস্থা করবে। (যিকর ও ফিকর: ১৪৩)

১৮. প্রকাশ্য ফাসেক বে-আমল কোন লোককে মাহফিলের সভাপতি বা পরিচালক কিংবা বিশেষ অতিথি ইত্যাদি বানাবে না। এতে খোদাদ্রোহীদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এতে আল্লাহর আরশ কম্পিত হয়। এটা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫৯)

১৯.মাহফিলের কোন ছবি তুলে রাখবে না এবং কোন প্রকার অডিও, ভিডিও এবং সিডি করে রাখবে না। এগুলো সব হারাম। এতে দীনী মাহফিলের লক্ষ-উদ্দেশ্য বরবাদ হয়ে যায়। এবং বদ দীনী ও গোমরাহী কায়েম হয়। (বুখারী শরীফ: ২/৮৮০, মুসলিম শরীফ: ২/২০০)

২০.কোন বক্তার আগমনে না‘রায়ে তাকবীর বা অন্য কোন শ্লোগান দিবে না। এটা সুন্নাহের খেলাফ। বিশেষ করে ওয়াজের মধ্যে কোন বক্তার আগমনে বক্তার বয়ান বন্ধ করে কোন কথার শ্লোগান দিবে না। কুরআন-সুন্নাহ এর আলোচনা অনেক উচ্চ কাজ। কারো আগমনে তা বন্ধ করার অবকাশ নাই। কোন বক্তার ব্যাপারে “প্রধান আকর্ষণ” “জলসার মধ্য মনি” ইত্যদি বলে অন্যান্য উলামাদের খাট করবে না। কারণ সকলেই হকুনী আলেম। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৩৩৭, ফাতহুল বারী: ১১/১৬৭)

## তেরিংশতম অধ্যায়

### মাদরাসা ছাত্র রাজনীতি হযরত খানভী রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. ও শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব দা. বা.-এর বক্তব্যের আলোকে উলামাদের হিফাযত

**আলেম উলামা ও ছাত্রগণ রাজনীতির মাঠে কেন আসেন না?**

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. ইরশাদ করেন যে, বর্তমানে অবস্থা আর চিন্তা ফিকির শুধু এটাই যে, (রাজনীতির) মাঠে নামা উচিৎ। অথচ এর পরিণাম এই হয় যে, মাদরাসা-খানকাহ হাত থেকে ছুটে যায়, আর মাঠও আয়ত্তে আসে না। তাছাড়া এ মানুষগুলোর রাজনীতির মাঠের জন্য না আছে কোন শর্তের বালাই, আর না আছে কোন বাধ্য বাধকতা। বরং সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় এই যে, আজ একথা পর্যন্ত বলা হচ্ছে যে, (এখন) মাসআলা মাসাইল শোনার সময় নেই, এখন কাজের সময়; কাজেই কাজ করা চাই। (নাউযুবিল্লাহ)

**প্রসঙ্গ : রাজনীতি ও আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ**

আমার মতামত হচ্ছে এই যে, যে কোন ধরনের আন্দোলনই হোক না কেন, তাতে তালিবে ইলম বা ছাত্রদের অংশগ্রহণের অনুমতি না হওয়া চাই। এতে পরবর্তী সময়ে ভীষণ ক্ষতি হয়, যা তাৎক্ষণিক ভাবে বুঝে আসে না।

পরিশেষে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, যখন পড়া ও পড়ানোর দায়িত্বে কেউ লিপ্ত থাকবে না তখন কাজ করনেওয়ালা উলামাদের জামা‘আত কোথা থেকে তৈরী হবে?

যারা আলেম, অনুসরণীয় ও নেতৃস্থানীয় রয়েছ, তাঁদেরই উচিৎ (জন সাধারণকে সাথে নিয়ে) সার্বিক দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া। কিন্তু ছাত্রদেরকে অবশ্যই তাদের পড়া লেখায় ব্যস্ত থাকতে দাও, যাতে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দীনে ইসলামের হুকুম আহকাম বাতলানে ওয়ালা একটি দলের ধারাবাহিকতা চালু থাকে।

তবে কি তোমাদের ধারণা এটাই যে, ভবিষ্যতে দীনের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না? যেমনটি আজ বলা হচ্ছে যে, ‘মাসাইলের সময় নেই এখন কাজের সময়!!’

ঐ সব আলেম নেতাদেরকে ডেকে বলা উচিৎ যে আপনারা এই যে আজ সর্দার ও নেতা হয়েছেন তা কি ঐ পড়ালেখার বদৌলতেই নয়? অথচ আজ আপনারা সে পড়ালেখারই গোড়া কাটছেন।

সারকথা এটাই যে, ছাত্রদের এ জাতীয় কমিটি ও সভা সমিতিতে অংশগ্রহণের অনুমতি একেবারেই দেয়া উচিত নয়। এর মারাত্মক ক্ষতি রয়েছে।

এ (রাজনীতির) কাজের জন্য কি তবে শুধু ছাত্রদেরই দায় ঠেকেছে? অন্যান্য সাধারণ মুসলমান কি নেই? তাদের থেকেও কাজ নাও।

দ্রষ্টব্যঃ “আল ইলমু ওয়াল উলামা” হাকীমুল উম্মাত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. পৃষ্ঠা ২৮০ এবং ২৮৪।

### প্রসঙ্গ : রাজনীতি

বিশ্বখ্যাত আলেম পাকিস্তানের শরী‘আ আদালতের সাবেক জাস্টিস শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী সাহেব (দাঃ বাঃ) বলেন যে, “আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান প্রকৃতিগত ভাবেই রাজনৈতিক মন মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন না। আর তিনি কখনো ‘রাজনীতি’কে স্থায়ী কর্মপন্থাও বানাননি।

অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ‘রাজনীতিও দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আর এটা অনস্বীকার্য যে, এ শাখায় মুসলমানদের জাতীয় ও সামগ্রিক সাফল্যের চিন্তা ভাবনা করা একজন আলেমেদীন ও হক্কের দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তি মাত্রেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

মূলতঃ এ কারণেই যখনই মুসলমানদের কোন অনিবার্য জাতীয় প্রয়োজন সামনে এসেছে তখনই তিনি সীমিত গন্ডির মধ্যে থেকেও এ শাখায় বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর পদ্ধতিই এমন ছিল যে, এ সব খেদমতগুলো প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো ‘রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব’ রূপে পরিচিত হননি।

১. সর্ব প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণ রাজনীতি মুক্ত রাখা হোক। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষকদের দেশের চলমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অবশ্যই সম্যক ধারণা রাখা চাই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বে। বরং তাদের এতে (সরাসরি) অংশগ্রহণ করা অনুচিত। হ্যাঁ, যদি এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত কোন আলেম মনে করেন যে, তার জন্য রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়া দরকার, সে ক্ষেত্রে তার জন্য মঙ্গল জনক পন্থা এই যে, তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে (ইস্তিফা) অবসর নিয়ে নিবেন এবং অতঃপর রাজনৈতিক খেদমত আঞ্জাম দিবেন।

আমার সম্মানিত পিতা রহ. ইরশাদ করতেন যে, উলামায়ে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের পদ্ধতি এটাই ছিল যে, তাঁরা দারুল উলূম দেওবন্দের



সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা অবস্থায় সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেননি। (যার উজ্জল দৃষ্টান্ত এই যে,) হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. যখন ভারত বর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপুল বিক্রমে অংশগ্রহণ শুরু করেন তখন তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ইস্তিফা নিয়ে নেন।

স্বয়ং আমার মুহতারাম পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এবং শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ শুরু করেন তখন তাঁরাও প্রথমে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ইস্তিফা নিয়ে নেন। পরে প্রত্যক্ষ কর্মতৎপরতা চালাতে থাকেন।

প্রথমতঃ যখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তখন ইলম ও জ্ঞানের ঐ একাগ্রতা দূরীভূত হয়ে যায় যা ইলম অর্জনের জন্য অত্যাাবশ্যক। শুধু তাই নয়, এর ফলে তা'লীম ও তারবিয়্যাত তথা শিক্ষাও দীক্ষার মানও কমে যায় এবং যোগ্যতা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এর কারণ এই যে, জ্ঞানের জন্য পূর্বশর্ত হল একাগ্রতা ও নিবিষ্ট চিন্তা। পক্ষান্তরে 'রাজনৈতিক বাস্তবতা' হল এটার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। এ কারণেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) দেখা যায় যে, যে সব ছেলে ছাত্র যমানায় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তাদের যোগ্যতা কম ও দুর্বল হয়।

দ্বিতীয়তঃ ইলম ও আমল এর সঠিক মানাসিকতা তৈরীর পূর্বেই যখন অপরিপক্ক মস্তিষ্কের ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আরম্ভ করে তখন তারা আর ঐ সীমারেখা মেনে চলতে পারে না যা ইসলাম রাজনীতির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আর এভাবে বারংবার সীমা লংঘনের দরুন এক পর্যায়ে ধর্মীয় গোষ্ঠীর রাজনীতিও বিধর্মী রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে নিপতিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

এতদভিন্ন যখন একজন মানুষ মজবুত দীক্ষা ছাড়াই রাজনীতির ন্যায় একটি জটিল ও স্পর্শকাতর ব্যাপারে তথা কন্ট্রাকারী পথে পা রাখে তখন তার জন্য অহংকার, যশ ও খ্যাতি, আরো বিভিন্ন আত্মিক অসুস্থতা থেকে বেঁচে থাকা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ দীনের বিভিন্ন কর্ম বণ্টনের চাহিদা ও আবেদনও এটাই যে, সমস্ত আলেমদের একযোগে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া অনুচিত। বরং কিছু লোককে অবশ্যই শিক্ষা, দীক্ষা, তা'লীম ও তারবিয়্যাত এবং দাওয়াত ও তাযকিয়াহ (আত্মশুদ্ধি) এর কাজে ব্যাপ্ত ও সম্পৃক্ত থাকতে হবে। যাতে করে দীনী



প্রয়োজনের সমস্ত কাজই সঠিকভাবে, সুচারু রূপে পরিচালিত হতে পারে এবং দীনের কোন শাখাতেই শূন্যতা সৃষ্টি না হয়।

চতুর্থতঃ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মঙ্গল ও উন্নতির পথ এটাই যে, তারা কখনো প্রশাসনের এত নিকটেও ঘেষবে না যদ্বন্ধন তাদেরকে প্রশাসনের তল্পীবাহক হতে হয়, আবার তারা প্রশাসনের সাথে এমন বৈরী আচরণও করবে না যদ্বন্ধন তাদের কাজে বাঁধা বিপত্তি আসে। এর অন্তর্নিহিত রহস্য এই যে, হুকুমাত বা প্রশাসনের নিত্য পরিবর্তনশীল অথচ এসব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

কাজেই প্রশাসনের নৈকট্য কিংবা দূরত্বের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান গুলোর উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়তে দেয়া উচিত হবে না। বরং তাদেরকে সর্ববস্থায় নিজেদের সুদূর প্রসারী মহান গঠনমূলক কাজেই মশগুল থাকা চাই। অথচ এর বিপরীতে যদি এ সব প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তাদের এ মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই হুমকীর সম্মুখীন হবে।

২. এছাড়া যে সব উলামায়ে কিরাম কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে (প্রত্যক্ষ ভাবে) জড়িত নন সে সব উলামাদের ‘রাজনীতি’ তে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমার মুহতারাম ওয়ালিদ সাহেব রহ. এর আন্তরিক অভিলাষ এটাই ছিল যে, তাঁরাও যেন শক্ত জরুরত বা অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে নির্বাচনে অংশ না নেন।

হযরত মাওলানা শাকীর আহমাদ উসমানী রহ. একদা পার্লামেন্টে ভাষণ প্রদানের সময় বলেছিলেন “প্রশাসনের দায়িত্বশীল ও পরিচালকবৃন্দ এ ভুল ধারণাকে মন থেকে বের করে দিন যে, ‘মোল্লারা’ ক্ষমতা চায়। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিতে চাই যে, আমরা মোটেও ক্ষমতা দখল করতে চাই না, তবে ক্ষমতাসীনদেরকে কিছুটা মোল্লা (দীনদার) বানাতে চাই”।

দ্রষ্টব্য : “মেরে ওয়ালিদ মেরে শাইখ” জাষ্টিস মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ পৃষ্ঠা ১৫৫-১১৯)

## চৌত্রিশতম অধ্যায়

### অমুসলিমদের ব্যাপারে একটি বিশেষ আবেদন

মুহতারাম,

প্রিয় পাঠক!

এ মুহূর্তে আমি ভিন্ন একটি দীনী খেদমতের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি, যা আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম পক্ষ থেকে আরোপিত বিশেষ জিম্মাদারী। অথচ সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ বে-ফিকির আছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তর সর্বক্ষণ ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত থাকত এ চিন্তায় যে, তাঁর সকল উম্মতকে কিভাবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচানো যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন কাফেরকে সত্তুর বারেরও বেশী ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। (মিরকাত-১১৯৭)

এ ব্যাপারে তিনি এত বেশী পেরেশান ও অস্থির থাকতেন যে, আল্লাহ তা‘আলা একথা বলে তাঁকে সান্তনা দিয়েছেন- “তারা যদি ঈমান না আনে তাহলে তাদের চিন্তায় কি আপনি নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন?” (সূরা শু‘আরা-৩, কাহাফ-৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত হিসাবে আমাদের দিলের মধ্যে এ ধরনের দরদ, চিন্তা-ফিকির উদ্যম থাকা জরুরী। কারণ আমাদেরকে তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরায়েনিসা-৯)

অতএব তাঁর দিলের সব চেয়ে বড় ব্যাথা ও দরদ যদি আমাদের দিলে মোটেও না থাকে তাহলে কিভাবে অনুসরণ ও অনুকরণের হুক আদায় করছি বলে দাবী করতে পারি? সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল প্রথমতঃ আমরা ঈমান-আমল সহীহ করার ফিকির ও প্রচেষ্টা চালাব। তারপর নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী পুত্র, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের ঈমান-আমল সহীহ করার জন্য শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াত দিব এবং প্রচেষ্টা চালাব। (সূরায়ে আসর: ২-৩, তাহরীম : ৬ ও শু‘আরা-২১৪)

এরই পাশাপাশি অমুসলিম ভাইদেরকেও শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিব। (সূরায়ে আলে ইমরান-৬৪)

তাদের নিকট ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরব এবং একমাত্র ইসলাম ধর্মই যে মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারে-একথা বুঝাব। একাজের জন্য নিজের এলাকা, দেশ ও সারা বিশ্বের অমুসলিমদেরকে আমাদের কাজের কর্মক্ষেত্র মনে করব। (সূরায়ে আরাফ-১৫৮)

এবং নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন হেকমতের মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাব। (সূরায়ে নাহল-১২৫)

আমাদের দ্বারা যদি একজন অমুসলিমও ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সমগ্র দুনিয়া থেকে বড় দৌলত হাসিল হয়ে যাবে এবং এটা আমাদের নাজাতের সবচেয়ে বড় উসীলা হতে পারে। (বুখারী শরীফ হাঃ নং ৪২১০, ৬৪১৫)

এ কাজের অবহেলার দরুণ হাশরের ময়দানে আমাদের মুসীবতের সম্মুখীন হতে হবে এবং অমুসলিমগণ বিশেষ করে যারা বিভিন্ন লেন-দেন ও উঠা-বসায় আমাদের সাথে সম্পর্কিত বা যে কোনভাবে পরিচিত তারা আমাদেরকে দায়ী করবে। আমাদের একটু ফিকির ও চিন্তা-ভাবনা অনেক লোকের জাহান্নাম থেকে নাজাতের উসীলা হতে পারে এবং এক্ষেত্রে আমাদের অবহেলা হাজার হাজার লোকের জাহান্নামের কারণ হতে পারে এবং আমাদের নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে পারে। সুতরাং আমাদের সকলের সচেতন হওয়া জরুরী এবং আরোপিত দায়িত্ব পালন করার জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তা‘আলা তাওফীক দান করুন।

বি. দ্র.: এ ব্যাপারে “বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম” বইটি সহায়ক হবে বলে আশা করি।

### পয়ত্রিশতম অধ্যায়

**রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী মুসলিম মহিলাদের জন্য**

১। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন: মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: নারী যদি সময় মত পাঁচ ওয়াত্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে (কিয়ামতের দিন) সে জান্নাতের (আট দরজার) যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান- হাদীস নং ৪১৩৯)

২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, তোমরা বেশী বেশী দান খায়রাত করো। যদিও তোমাদের অলংকারাদি থেকে হয়। কারণ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাই বেশী হবে। একথা শুনে জনৈকা মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাদের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ কী? জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারণ (কথায় কথায়) তোমরা অভিশাপ দাও এবং স্বামীর অবাধ্য হও। (মুসনাদে আহমদ হাঃ নং ৪০৩৬)

৩। হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, একবার তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জানি জিহাদ সর্ব শ্রেষ্ঠ আমল, তবুও কেন আমাদেরকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না?

জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের জন্য তার চেয়েও উত্তম জিহাদ হল মাকবুল হজ্জ। (অর্থাৎ, যে হজ্জ সব ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ও গুনাহ থেকে মুক্ত।) (বুখারী শরীফ হাঃ নং ২৭৪৩)

৪। হুমাইজা বিনতে ইয়াছির রাযি. তাঁর দাদী থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা এই তাসবীহ গুলো বেশী বেশী পড়া **سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (মিরকাত ৫/২২৬)

এবং তা আঙ্গুলে গণনা করে পড়, কেননা কিয়ামতের দিন এগুলো জিজ্ঞাসিত হবে। আর আল্লাহর যিকির থেকে কখনো গাফেল থাকবে না, অন্যথায় তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। (আবু দাউদ হাঃ নং ১৫০১, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৮৩)

৫। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক মহিলা সম্পর্কে বলা হল, অমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে আর সারা রাত ইবাদত-বন্দেগী করে, কিন্তু সে কটু কথা বলে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন লাভ নেই, সে জাহান্নামে যাবে। আর এক মহিলা সম্পর্কে বলা হল যে, সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে রমযান মাসে রোযা রাখে, এবং সে যথাসাধ্য দান-সদকা করে, কিন্তু কাউকে কষ্ট দেয় না, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসতাদরাকে হাকেম হাঃ নং ৭৩০২)

৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈকা আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তুমি আমাদের সাথে হজ্জ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছ না কেন? জবাবে মহিলা বললেন, আমাদের মাত্র দুটি উট, তন্মধ্যে থেকে একটি আমার স্বামী ও তার ছেলে হজ্জ করার জন্য নিয়ে গেছে। আর অপরটি দিয়ে আমাদের ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করি। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সাবুনা দিয়ে বললেন, আগামী রমযান মাসে উমরা করে নিও। কেননা রমযান মাসে উমরার সওয়াব হজ্জের সমতুল্য। অন্য রিওয়ায়েতে আছে আমার সাথে হজ্জ করার সমতুল্য। (বুখারী শরীফ হাঃ নং ১৭৮২)

৭। উম্মে সালামাহ রাযি. বলেন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন (মুমিনা) নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী শরীফ হাঃ নং ১১৬১)

৮। হযরত হুসাইন ইবনে মিহসান রাযি. থেকে বর্ণিত, একবার তার ফুফু কোন এক প্রয়োজনে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে আসেন। প্রয়োজন পূরণ হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সম্বোধন

করে বললেন, তোমার স্বামী কি জীবিত আছে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুনরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তার সাথে কেমন ব্যবহার কর? জবাবে তিনি বললেন, সাধ্যানুযায়ী তাঁর খেদমত করে থাকি। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (সাবধান করে) বললেন, ভাল করে চিন্তা কর, তুমি তার কতটুকু খেদমত করে যাচ্ছ। কেননা সেই তোমার জাম্নাত, আবার সেই তোমার জাহান্নাম। (অর্থাৎ তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে জাম্নাত লাভ করবে, অন্যথায় জাহান্নাম)। (মুসনাদে আহমদ হাঃ নং ১৯০২৭)

৯। হযরত ইবনে আবী আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল রাযি. একবার শাম থেকে আসার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মু‘আয! তুমি একি করছ? জবাবে মু‘আয রাযি. বললেন, আমি শাম থেকে এসেছি, সেখানের অধিবাসীরা তাদের সেনাপতি ও ধর্মযাজকদেরকে এভাবে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। তাই আমিও আপনাকে সেভাবে সম্মান প্রদর্শন করলাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এরকম কাজ করতে নিষেধ করে বললেন, আমি যদি কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে শুধু নারী জাতিকেই আদেশ দিতাম যে, তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে সম্মান করার লক্ষ্যে সিজদা কর। ঐ সত্তার কসম যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, কোনো নারী তাঁর প্রতিপালকের হক্ক আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক্ক পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে। (স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ক এত বেশী যে) সফরের প্রাক্কালে সওয়ারীর পিঠে থাকা অবস্থায়ও যদি স্বামী স্ত্রীকে আহ্বান করে তাহলেও সে নিষেধ করতে পারবে না। (সহীহ ইবনে হিব্বান হাঃ নং ৪১৭১)

১০। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা‘আলা ঐ মহিলার উপর রহম করুন, যে মহিলা শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে। এবং স্বামীকেও (তাহাজ্জুদের জন্য) জাগিয়ে দেয়। (স্বামী) ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে মুখে পানি ছিটিয়ে দিয়ে হলেও উঠানোর চেষ্টা করে। অন্য হাদীসে উক্ত গুণ সম্পন্ন স্বামীর জন্যও মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু‘আ করেছেন। (মুসনাদে আহমদ হাঃ নং ৭৪১০)

১১। হযরত আবু হুমাইদ আস সায়েদী রাযি.-এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ একবার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাথে জামা‘আতে নামায পড়তে আমার ভাল লাগে। এ কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা আমি জানি। তবে শোন, তোমার জন্য

তোমার ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া বারান্দার কামরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আবার বারান্দার কামরায় নামায পড়া তোমার জন্য তোমার ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। এবং তোমার ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়া তোমার জন্য তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম, একইভাবে তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া তোমার জন্য আমার মসজিদে এসে আমার সাথে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, একথা শোনার পর তিনি পরিবারের লোকদেরকে ঘরের ভিতরে নামাযের স্থান বানাতে বলেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তা নির্মাণ করা হল। এরপর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই নামায পড়তে থাকেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান হাঃ নং ২২১৭)

১২। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইত্তিকালের পর মহিলাদের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন এসেছে সেটা যদি তিনি দেখতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করতেন। যেভাবে নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৮৬৯)

১৩। হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন নারী যখন পারিবারিক তহবিল থেকে স্বামীর অনুমতিক্রমে সংসারের ক্ষতি না করে দান করে তখন এই খরচ করার কারণে তার আমল নামায সওয়াব লেখা হয়। আর স্বামীর আমল নামাযও সওয়াব লেখা হয় তার উপার্জনের কারণে। এবং কোষাধ্যক্ষের আমল নামাযও লেখা হয়। (কারণ সে ক্যাশ সংরক্ষণ করে)। তবে কারো সওয়াব থেকে সামান্যতমও কমনো হবে না। (বুখারী শরীফ হাঃ নং ২০৬৫)

১৪। হযরত আবু হুরাইয়া রাযি. বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমান রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হলে, বা দুর্দশা ও বিপদগ্রস্ত হলে অথবা দুশ্চিন্তা বা পেরেশানীতে পড়লে, এমনকি শরীরের কোথাও কাঁটা বিধলে এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর (সগীরা) গোনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী শরীফ হাঃ নং ৬৫৪১)

মুসলিম বোনেরা! উপরোক্ত হাদীসগুলো গভীরভাবে পড়ুন। এবং উপদেশ গ্রহণ করুন। আর ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিভিন্ন ধরনের ক্লেশ-যাতনা যেমন : গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, বাচ্চাদের দুধ পান করানো ও লালন পালন করা, হয়েয নেফাস ইত্যাদি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয়ে পেরেশান হবেন না। এ সব কিছুই আপনার নেক আমলনামা ভারী করবে। সগীরা গুনাহসমূহের কাফফারা হবে। সর্বোপরি জান্নাতে আপনার দরজা বুলন্দ করবে। তাই সাধ্যমত স্বামীর সেবা যত্ন করন

এবং নিজের অন্দরমহলে নামায আদায় করুন। কারণ ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মহিলাদের মসজিদে গমনকে কাজ সাব্যস্ত করেছেন। (দুরের মুখতার ১ : ৮৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৮৯)

## ছয়ত্রিশতম অধ্যায়

### মহিলাদের দায়িত্ব-কর্তব্য

**আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:** (তরজমা) নারী পুরুষের যে কেউ ঈমান অবস্থায় নেক আমল করবে আমি অবশ্যই তাকে শান্তিময় জীবন দান করব, এবং আখেরাতে তার কৃতকর্মের উত্তম প্রতিদান দিবো। (সূরা নাহল-৯৭)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার উত্তম জীবন এবং পরকালের উত্তম প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে যেমন পুরুষদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তদ্রূপ মহিলাদের সাথেও অঙ্গীকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের কোন পার্থক্য করেননি। তবে শর্ত হল, প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে যত্নবান হতে হবে। সুতরাং মহিলারাও যদি ঈমানকে পরিশুদ্ধ করে নেককাজ তথা ইবাদাত-বন্দেগী, স্বামীর খেদমত ও তার আমানতের হেফাযত এবং সন্তান লালন-পালন করে তাহলে একদিকে যেমন তারা দুনিয়াতে উত্তম জীবন প্রাপ্ত হবে, সুখময় দাম্পত্য জীবনের অধিকারী হবে এবং আত্মার প্রশান্তি লাভ করবে, অপরদিকে আখেরাতেও তারা উত্তম প্রতিদান পাবে, চির সুখ-শান্তিসমৃদ্ধ জান্নাত লাভ করবে এবং অভাবনীয়, অকল্পনীয় ও অপূর্ব নেয়ামত ভোগ করবে।

কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার সয়লাবে ভেসে যাওয়া সমাজ এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে সহশিক্ষা এবং চাকুরির লোভ দেখিয়ে নারীদেরকে রাস্তায় নামিয়ে তাদেরকে কামাতুর পুরুষের লোলুপতার শিকার বানাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে বাজারী বানিয়ে প্রকাশ্যে বেইজ্জত করছে। নারী স্বাধীনতার নামে মাতৃজাতির সরলতা, অনাড়ম্বরতা, সতীত্ব, হায়া-শরম ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফলে প্রতিটি ঘর আজ ফেতনা-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব, ছেলে-মেয়েতে দ্বন্দ্ব, ভাই-ভাইয়ে মনমালিন্য। কোথাও ছেলে মেয়ে পিতা-মাতার অবাধ্য, কোথাও পিতা-মাতা সন্তানের হক আদায় থেকে উদাসীন, সামান্য সামান্য কারণে তালকের ঘটনা ঘটে সুখের সংসার দোষখে পরিণত হচ্ছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে এর কারণ হল মহিলাদের দীনী তা‘লীমের অভাব এবং দায়িত্ব বহির্ভূত অঙ্গনে বিচরণ। নিম্নে মহিলাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে প্রত্যেক মুসলিম মহিলা তা আদায় করে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবির পথ খুঁজে পায় এবং বর্তমানে সৃষ্ট বিভিন্ন ফেতনা-ফাসাদ থেকে হেফাযতে থাকতে পারে।



## নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

### ১. ঈমান-আক্বীদা পরিশুদ্ধ করা:

ঈমান শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করা, আর আক্বীদার অর্থ হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস। কুরআন হাদীসে যে সব বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, সেগুলোকে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করার নামই ঈমান। আর আমল-ইবাদত হচ্ছে ঈমানের পূর্ণতা। যার ঈমান নেই তার কোন আমল আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। রুহ ছাড়া যেমন শরীরের কোন মূল্য নেই, তদ্রূপ ঈমান ছাড়া আমলের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) 'যারা কাফের তথা যাদের ঈমান নেই তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত।' (সূরা নূর : ৩৯)

সুতরাং ঈমান দুরন্ত করা সকলের বুনিয়াদী ফরয। আর যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হয়, তন্মধ্যে ছয়টি হল রুকন বা মূল। যা ঈমানের মুফাসসালের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে :

أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ: আমি ঈমান আনলাম বা বিশ্বাস করলাম আল্লাহ তা‘আলাকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর প্রেরিত সকল আসমানী কিতাবকে, তাঁর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলকে, ক্বিয়ামত দিবসকে, তাক্বদীরকে অর্থাৎ, জগতে ভাল-মন্দ যা কিছুই হয় সবই আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি, তাঁরই পক্ষ হতে নির্ধারিত এবং মৃত্যুর পর ক্বিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হওয়াকে।

এছাড়াও ঈমানের আরো ৭৭টি শাখা রয়েছে যেগুলোর উপর ঈমান আনাও জরুরী। সহীহ ঈমানের এ ছয়টি আরকান এবং তার শাখা-প্রশাখাগুলোকে যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে এবং এগুলোর দাবী অনুযায়ী নেক আমল করবে- সে পরিপূর্ণ মুমিন হবে। আর যে এগুলোকে অবিশ্বাস করবে অথবা এগুলো থেকে মাত্র কোন একটি বিষয়কে অবিশ্বাস করবে কিংবা তাতে সন্দেহ পোষণ করবে অথবা তুচ্ছ তাম্বিল ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে কিংবা এগুলোর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি বের করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আগে মুমিন থাকলে মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং পিছনের সকল নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার-৩/১৯৩)

মনে রাখা উচিত মহিলারা অনেক সময় এমন এমন কথা বলে বা এমন এমন মন্তব্য করে, যার দ্বারা ঈমান চলে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। যেমন, বিপদে পড়ে বলে যে, ‘আল্লাহ আর কাউকে চোখে দেখলে না, যত সব বিপদ আমার উপরই’! ইত্যাদি। এজন্য এ বিষয়ে সচেতন থাকা একান্ত জরুরী। আল্লাহ না



করুন কেউ বেঈমান হয়ে গেলে তার জন্য নতুন ভাবে কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়া এবং বিবাহ দোহরায়ে নেয়া জরুরী।

বি: দ্র: এ ব্যাপারে হযরতওয়ালা শাইখুল হাদীস মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক (দাঃবাঃ) এর “কিতাবুল ঈমান” নামক গ্রন্থের তালীম করা যেতে পারে।

## ২. ইবাদত বন্দেগী করা:

প্রত্যেক বালেকা মহিলার উপর ফরয যে পাঁচ ওয়াস্ত নামায পড়া, কুরআন সহীহ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা, রমায়ান মাসে রোযা রাখা, ধন-সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করা এবং হজ্ব করা। এসব বিষয়ের মাসআলা-মাসাইল উপযুক্ত ব্যক্তি বা সহীহ কিতাব থেকে শিখে নিবে। এগুলো অস্বীকার করলে ঈমান চলে যায়। আর এগুলো বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আমল না করলে কাফের তো হয় না, তবে ফাসেক সাব্যস্ত হয়। সেক্ষেত্রে তাওবা করা জরুরী। এবং নামায রোযার উমরী কাযা করে নিতে হবে। যাকাত আদায় বাকী থাকলে তাও আদায় করে দিতে হবে। নতুবা আখেরাতে এর দরুন নির্ধারিত সময়ের জন্য জাহান্নামী সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য যে মহিলাদের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে বা ঈদগাহে যাওয়া নাজায়েয। কতিপয় বিদ্বান্ত আলেম জায়েয বলছে বটে, তাদের কথায় কর্নপাত করবে না।

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. [صحيح البخارى ح: ১৬৭]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর মহিলাদের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন এসেছে সেটা যদি তিনি দেখতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। যেভাবে নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৮৬৯)

## ৩. স্বামীর খেদমত করা:

মহান আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে স্বামীকে স্ত্রীর উপর বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রতি বিরাট হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। স্বামীকে সম্ভষ্ট রাখা, তার মনরঞ্জে সচেষ্ট থাকা অনেক সওয়াবের কাজ। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল :

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে যায়। (তিরমিযী হাঃ নং-১১৬১)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ দিতাম যে যেন স্বামীকে সিজদা করে। (তিরমিযী হাঃ নং-১১৫৯)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে ডাকে তখন তার ডাকে সাড়া দেয়া তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও সে চুলার উপর থাকে। অর্থাৎ, স্ত্রীর যত কাজই থাকুক না কেন, স্বামীর ডাকা মাত্র সবকিছু পরিত্যাগ করে তার ডাকে সাড়া দেয়া একান্তভাবে জরুরী। (তিরমিযী হাঃ নং-১১৬০)

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি স্বামী স্ত্রীকে তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও সে তার আহ্বানে সাড়া না দেয় এবং এ অবস্থায় স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে রাত অতিবাহিত করে তাহলে এ স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতাগণ ভোর পর্যন্ত লা‘নত করতে থাকেন। (বুখারী হাঃ নং ৩২৩৭)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন স্ত্রী যখন পৃথিবীতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখন জান্নাতে এ স্বামীর জন্য নির্ধারিত হুরগণ বলতে থাকে: আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, তুমি তাকে কষ্ট দিও না। সে তো তোমার কাছে অস্থায়ী মেহমান মাত্র। অচিরেই সে তোমাকে পরিত্যাগ করে আমার সান্নিধ্যে চলে আসবে। (তিরমিযী হাঃ নং-১১৭৪)

উল্লেখ্য: স্ত্রীদেরও স্বামীর নিকট হক পাওনা আছে। সেগুলো আদায় করা পুরুষদের দায়িত্ব।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম নারীর জন্য অন্তরে স্বামীর প্রতি মুহব্বত রাখা, তার খেদমত করা, তার হকসমূহ আদায় করা একান্ত অপরিহার্য। বলা বাহুল্য: স্ত্রীর জন্য অফিস-আদালতে চাকুরী করা, গার্মেন্টসে শ্রম দেয়া ইত্যাদি ঘরের বাইরের কাজে আত্মনিয়োগ করা স্বামী ও সন্তানদের হক বিনষ্ট করারই নামান্তর। উপরন্তু তাতে নানাবিধ ফিতনা-ফাসাদের আশংকা তো আছেই। এজন্য সামান্য পয়সার লোভে না পড়ে এ বিষয়ে একটু সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে দেখা উচিত। রিযিকদাতা তো একমাত্র আল্লাহ। তিনি স্বামী বা সন্তানের মাধ্যমে সংসারের সকলের রিযিক দিতে সক্ষম। তাহলে কেন রিযিকের জন্য আল্লাহর নাফরমানী করবে? তবে যাদের স্বামী বা খোরপোষ দেওয়ার মত কেউ নেই এবং অভাবের কারণে জীবন ও মান বাচানো কষ্টকর হয়ে যায় তারা ঘরোয়া

পরিবেশে থেকে বৈধ উপার্জনের কোন পন্থা যেমন সেলাইয়ের কাজ, বাচ্চাদের পড়ানো ইত্যাদি অবলম্বন করবে।

#### ৪. নিজের সতীত্ব ও স্বামীর মালের হেফাযত করা:

স্ত্রীর নিজের ইজ্জত এবং স্বামীর মাল তার নিকট আমানত হিসাবে থাকে। নিজের সতীত্বের হেফাযতের লক্ষ্যে নিজেকে পর্দায় রাখা ফরয। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। (সূরা আহযাব: ৩৩)

সুতরাং দেবর-ভাণ্ডর, চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালু, নিজ শ্বশুর ছাড়া বিভিন্ন রকম শ্বশুর, উকিল বাপ, ধর্ম যাপ, ধর্ম ভাই ইত্যাদি থেকে পর্দা করা ফরয। বেপর্দা হওয়া হারাম। একান্ত প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কর্কষ ভাষায় কথা বলা জায়েয। শরী‘আতে এ আমানতের অপব্যবহার তথা পরপুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত, কথা-বার্তা বা অন্য কোন অবৈধ আচরণ করলে কিংবা তার অনুমতি ছাড়া স্বামীর মাল খরচ করলে তা খিয়ানত বলে গণ্য হবে। আর আমানতের খিয়ানত করা কবীরাহ গুনাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী পাঁচ ওয়াস্ত নামায পড়বে, রমায়ানের রোযা আদায় করবে, নিজের ইযযত তথা পর্দা পালন করবে এবং স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য করবে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া হাদীস নং-৬/৩০৮)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, মুমিন বান্দা খোদা ভীতির পরে নেক বিবি অপেক্ষা উত্তম কোন জিনিষ পেতে পারে না, যে নেক বিবিকে স্বামী কোন কাজের আদেশ করলে সে সাথে সাথে তা পালন করে, তার দিকে তাকালে সে তাকে খুশী করে, স্বামী কোন কাজ করার অঙ্গীকার করলে সে তাকে তা পুরণে সাহায্য করে, এবং স্বামী অনুপস্থিত থাকলে সে নিজের ইজ্জত এবং স্বামীর মালের হিফাযত করে। (ইবনে মাজা হাদীস নং-১৮৫৭)

তদ্রূপ অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত গুনাবলীর অধিকারী নারীকে সবচেয়ে উত্তম বলে অবিহিত করেছেন। (নাসায়ী হাদীস নং-৩২৩১)

উল্লেখ্য যে বেগানা পুরুষের সাথে পর্দার ক্ষেত্রে মহিলাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা শরীর পর্দার অন্তর্ভুক্ত, বিশেষ ঠেকা ছাড়া চেহারা হাত বা পা ইত্যাদি খোলা রাখা জায়েয নেই। (সূরায়ে আহযাব আয়াত নং-৫৯)

#### ৫. সন্তান লালন-পালন ও তার শিক্ষা-দীক্ষা:

একজন আদর্শ মা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত। অপর দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: প্রতিটি শিশুই ফিতরাতে ইসলামের উপর

জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী খৃষ্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।  
(তিরমিযী হাঃ নং-২১৪৩)

অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শিশুই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তার মাঝে সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শিশুর মাতা-পিতা যদি এ ব্যাপারে যত্নবান হয় এবং তাকে গড়ার জন্য শরী‘আত কর্তৃক বর্ণিত পন্থায় যথাযথ মেহনত করে তাহলে তার মাঝে উত্তম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। অন্যথায় তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

সুতরাং প্রত্যেক পিতা-মাতার জন্য নিজের সন্তানকে আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা একান্ত জরুরী। পিতা যেহেতু অধিকাংশ সময় বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকে। অপর দিকে সন্তান ৮/১০ বছর পর্যন্ত মায়ের আঁচলের নীচেই প্রতিপালিত হয় এজন্য সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তাকে বেশী যত্নশীল হতে হয়। এজন্য ইসলাম মাতা-পিতাকে কতগুলো দায়িত্ব দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) তোমরা নিজের পরিবারবর্গ তথা সন্তান-সন্ততিকে নামাযের আদেশ দিতে থাক এবং নিজেও নামাযের পাবন্দী করতে থাক। (সূরা ত্ব-হা-১৩২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন পিতা-মাতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচারের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কোন উপহার দিতে পারে না।  
(তিরমিযী শরীফ হাদীস নং-১৯৫৭)

তাছাড়া পিতা-মাতার সাথে সন্তানের রক্তের সম্পর্কের কারণে পিতা-মাতার নসীহত তারা সহজে এবং তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে। পিতা-মাতার কথা-বার্তা, নিয়ম-নীতি, জীবন পদ্ধতি সন্তানের জন্য পাথের হয়।

সুতরাং পিতা-মাতা তার সন্তানকে আচার-আচরণে, জীবন চলার পদে পদে ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। প্রতিদিন যদি একটি করে সুন্নাতও শিখায় তাহলে দেখা যাবে কিছু দিনের মধ্যেই তার গুরুত্বপূর্ণ সব সুন্নাত শেখা হয়ে গেছে।

মনে রাখা দরকার! মনোবিজ্ঞানের আলোকে দেখা গেছে ছোট ছোট শিশুরা সোহবত বা সংশ্রব দ্বারা বড়ই প্রভাবিত এবং তাদের মাঝে-দেখে দেখে ছবছ নকল করার যোগ্যতা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং তারা যদি নেক লোকদের নিকট থেকে নেক কাজ দেখতে থাকে তাহলে সেও ছোট থেকেই নেককার হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যদি তারা বদকারদের নিকট থেকে শুধু মন্দ কাজ দেখতে থাকে তাহলে সে ছোট থেকেই চরিত্রহীন এবং বখাটে হয়ে উঠে এবং বড় হয়ে মাস্তানের আকার ধারণ করে।

বর্তমান সমাজে ছেলে-মেয়েরা যে, চরিত্রহীন, বখাটে, এবং মাস্তান হচ্ছে, পিতা-মাতার অবাধ্য হচ্ছে, তাদেরকে অবজ্ঞা করছে ফলে তারা মাতা-পিতার অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মা নিজ সন্তানদের শান্তির জন্য পয়সা রোজগার করছে। অপরদিকে তার সন্তান দীনী শিক্ষার অভাবে নেশাখোর ও চরিত্রহীন হয়ে নেশার জন্য টাকা না পেয়ে মাকে যবাই করছে। কী আজব দুনিয়া! বর্তমান যে আমাদের সন্তানগণ নেশায় ডুবে দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় পিতা-মাতা থেকে আরম্ভ করে সমাজ, গ্রাম বরং পুরো দেশটা আতংকিত হয়ে পড়ছে-তার মূল কারণ হল পিতা-মাতার গাফলতী, পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রে শিকার হয়ে মা চাকুরির নামে অফিস-আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ কলিজার টুকরা, আদরের ঢুলাল নিজ সন্তানকে দীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে এবং তাদেরকে কাজের বুয়ার হাতে রেখে আসছে। তারা মায়ের তা'লীম ও মমতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং কাজের বুয়া ও বখাটে ছেলেদের সাহচর্য পেয়ে বড় হচ্ছে। ফলে তাদের স্বভাব সে সন্তানদের মাঝেও বিস্তার লাভ করছে। এটা একটা ভেবে দেখার বিষয় যে আমাদের ভবিষ্যত কি? সকলেই জানেন যে, আমাদের সন্তানগণ আমাদের নিজেদের এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তারাই ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করবে। আজ যদি তারা নিজেরাই ধ্বংসের পথে চলে যায় তাহলে এ জাতির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার। এ নিশ্চিত ধ্বংস থেকে বেঁচে ভবিষ্যৎকে সুন্দর করতে হলে এখনই আমাদের আল্লাহর বিধান ফিরে আসতে হবে এবং আমাদের সন্তানকে দীনী শিক্ষা তথা আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষায় সুশিক্ষিত করতে হবে। দীনী শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যদি আমরা এভাবে মেহনত করে আমাদের সন্তানদেরকে গড়তে পারি তাহলে ক্রমান্বয়ে পরিবার, সমাজ, এবং গোটা দেশ সন্তোষ-দুর্নীতিমুক্ত আদর্শবান হয়ে উঠবে। ফিরে আসবে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা। আর এ পদ্ধতি পরিহার করে যতই মেহনত করা হোক না কেন কোন দিন শান্তি ফিরে আসতে পারে না। কারণ দেশের সুন্দর, সন্তোষ ও দুর্নীতিমুক্ত আদর্শবান হওয়া ব্যক্তি-পরিবার সংশোধনের উপর নির্ভরশীল।

**বিঃ দ্রঃ স্বামীর খেদমত ও সন্তানের হকের জন্য হযরতওয়ালা শাইখুল হাদীস মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক (দাঃবাঃ) এর “ইসলামী বিবাহ” নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।**

#### **৬. মহিলাদের মধ্যে দীনী দাওয়াত ও তা'লীম:**

শরী'আত পিতা-মাতাকে দায়িত্ব দিয়েছে যে তারা তাদের মেয়েকে দীনী তা'লীম দিয়ে এমন চরিত্রবতী করে গড়ে তুলবে যে, বিবাহের পর তার স্বামী যেন মনে করে যে আমার বিবি আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। (মুসনাদে আহমাদ : হা: নং-১৯৬২)

অপর দিকে প্রত্যেক মহিলাকে শরী‘আত কর্তৃক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা নিজ সন্তান এবং মহল্লার অশিক্ষিতা বালিকাদেরকে নিয়মিত দীনের তা‘লীম দিবেন। সহীহ শুদ্ধ করে কুরআন শিখাবেন। এ ছাড়া যেসব মহিলা কোন কাজে বা দেখা সাক্ষাত করতে তাদের নিকট যাতায়াত করবে তাদেরকেও দীনী দাওয়াত ও তা‘লীম দিতে থাকবেন। তাদের দীনদারির খোঁজ-খবর নিবেন। তাদের ঈমান-আকীদা নামায রোযা সম্পর্কে জানবেন। কোন ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টি গোচর হলে তা সংশোধন করে দিবেন। এমনকি তাদের বাচ্চাদের দীনী তা‘লীমের খোঁজ-খবরও নিবেন। এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীদের দীনী হালাত জেনে নিয়ে সে বিষয়ে তাদের সং পরামর্শ দিবেন। তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরকে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সোহবতে এবং দাওয়াত তাবলীগের মেহনতে অংশ গ্রহণ করার নসীহত করবেন। এবং বুঝাবেন, এটাই দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর একমাত্র রাস্তা। এমন কি অনেক মহিলারা স্বামী, সন্তান, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কর্তৃক অনেক নির্যাতিত হয়ে থাকে। তার থেকে বাঁচারও এটা একটা রাস্তা। (সূরা তওবা-৭১, মুসনাদে আহমাদ : হাঃ নং-৬৪৯৩)

আফসোস! আজ যদি মহিলাদের আসল দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তা পালনের উপকারিতা জানা থাকত তাহলে তারা চাকুরির নামে অফিস-আদালতে ঘুরে বেড়াতো না এবং সৃষ্ট ফিতনা ফাসাদে নিপতিত হতো না।

আল্লাহ তা‘আলা সকল মুসলিম মহিলাকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

## সাইত্রিশতম অধ্যায়

### উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। মসজিদ বা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, বিরোধিতা বা সমালোচনা না করা। প্রয়োজনে গোপনে পরামর্শ দেয়া।

২। সর্বদা (কোন হকুনী শাইখের মাধ্যমে) নিজের আত্মশুদ্ধির ফিকির করা। জরুরী সকল বিষয় তাঁর সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে করা। সকল কাজে সুন্নাহের অনুসরণ করা।

৩। ছাত্রদেরকে তাহক্বীকের সাথে পড়ানো এবং তাদের তা'লীমের সাথে সাথে তারবিয়াত তথা আমলের ইসলাহ ও আমলী মশকের ব্যবস্থা করা। নিজেকে ছাত্রদের সামনে আলমী নমূনা হিসাবে পেশ করা।

৪। দাড়িবিহীন ছাত্রদের থেকে কোন অবস্থায় শারীরিক খিদমত না নেয়া। তাদের থেকে কোন করজ বা হাদিয়া গ্রহণ না করা। ছাত্রদেরকে বিশেষ করে নাবালেগ ছাত্রদের লাঠি/বেত ইত্যাদি দ্বারা না মারা। কারণ এ ধরনের শাস্তি পিতার জন্যও বৈধ নয়।

৫। কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে সকল ভাইদের দীনদার বানানোর লক্ষ্যে দাওয়াত, তাবলীগ, নূরানী তা'লীমুল কুরআন ও দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে দীনের খেদমত করা।

বিঃ দ্রঃ এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য সংকলকের নামায শিক্ষা ও ইমামগণের জিম্মাদারী পুস্তিকাটি পাঠ করার জন্য উলামায়ে কেরামের খেদমতে অনুরোধ জানানো হল।

### আটত্রিশতম অধ্যায়

#### দীনের দায়ী ও খাদেমদের পরস্পর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

দীন ইসলাম সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, মুসলমানদের অন্তরে ভাল কাজের আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার মনোভাব সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা প্রচেষ্টা চলছে, চাই তা যে সহীহ পদ্ধতিতেই হোক না কেন এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যেমন সন্দেহহীন তেমনই সেগুলোর গুরুত্বও সর্বজন স্বীকৃত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাদের প্রত্যেকের যে শুধু নিয়ত ও কর্মপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন তাই নয় বরং চিন্তাধারা, কর্মকৌশল, নিয়ম-কানুন ইত্যাদির বিচারেও একে অপর থেকে পৃথক। এমতাবস্থায় দীনী মারকাজ ও মাহফিল, আন্দোলন ও সংগঠন এবং মাদরাসা সমূহ ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক; সর্বোপরি দীনের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত দা'ঈদের পারস্পরিক আচরণ ও উচ্চারণ কেমন হওয়া উচিত তা জেনে নেয়া দরকার।

**আমাদের অবস্থান :** দীন ইসলাম হল একটি দূর্গ, শান্তি-সুখের রাজপ্রাসাদ। যে ব্যক্তি এর মধ্যে প্রবেশ করবে সে ঝড়-তুফান, ঘূর্ণিঝড় এবং অগ্নিঝরের চাইতে



মারাত্মক বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভ করে জাম্মাতের চির সুখ-শান্তি আর নিরাপত্তার অধিকারী হবে। সুতরাং সাধারণ দূর্গ বা রাজপ্রাসাদ যেমন কারো একক প্রচেষ্টায় অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। বরং ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী এবং যোগালী সহ সকল কর্মচারীর যৌথ প্রচেষ্টা জরুরী। তদ্রূপ দীনের এ দূর্গ বা রাজপ্রাসাদও শুধু যে কোন এক দলের প্রচেষ্টা বা মেহনতে পরিপূর্ণভাবে ওজুদে আসতে পারে না। বরং তার জন্য জরুরী হল দীনের সাথে সম্পৃক্ত সব দলের যৌথ তৎপরতা এবং প্রচেষ্টা।

### তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়া মৌলিক বিষয়

এ বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের মৌলিক যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: (তরজমা) “তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের অন্তরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কুরআন ও সুন্নাহ।” (সূরা জুম'আ, আয়াত নং-২)

উক্ত কাজগুলোর কোন একটির ব্যাপারেও নির্দিষ্ট করে একথা বলা যাবে না যে, মূল হচ্ছে একাজ; আর অন্যগুলো গৌণ; মর্যাদা ও গুরুত্বের বিচারে এটা অগ্রগণ্য আর বাকিগুলো তেমন নয়।

### শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ও তার মর্যাদা

মুহিউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ. এ কথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন। তিনি বলেন : “অভিন্ন জাত ও অভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর মধ্যেই শুধু তুলনা চলে। পরস্পর বিপরীত দুই বস্তুর মধ্যে তা হয় না। সুতরাং কেউ যদি প্রশ্ন করে চোখ বেশী জরুরী নাকি কান বেশী জরুরী? তাহলে বলা হবে স্ব-স্ব স্থানে উভয়টিই জরুরী। এক্ষেত্রে তুলনা করাই ভুল। তবে, এটা বলা যেতে পারে যে, উভয় চোখের মধ্যে যে চোখে ভাল দেখা যায় সে চোখ বেশী ভাল। আর উভয় কানের মধ্যে যে কানে ভালো শোনা যায় সে কান বেশী ভাল।

উপরোক্ত উদাহরণের আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কেউ যদি প্রশ্ন করে “তা'লীম তাযকিয়া ও তাবলীগের মধ্যে কোনটা বেশী জরুরী?” তাহলে তার এই প্রশ্ন ঠিক হবে না। কেননা এগুলোর প্রতিটি পৃথক পৃথক বিষয়। আর ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর মধ্যে তুলনা চলে না। সুতরাং উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ই জরুরী। অর্থাৎ, স্ব-স্ব স্থানে তা'লীম যেমন জরুরী তেমনি তাবলীগও জরুরী। অনুরূপভাবে তাযকিয়াও জরুরী। বরং তাবলীগ ও তা'লীম কবুল হওয়ার জন্য তাযকিয়া অপরিহার্য। (মাজালিসে আবরার: ২৯৪)



## শাখাত্ৰয়ে পরস্পর সম্পর্ক এবং তার উপকারিতা

মুহিউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ.-এর একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : ‘মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ পৃথক পৃথক কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ নিজের শরীরের কোন অঙ্গকে তুচ্ছ মনে করে না। অঙ্গসূহের পৃথক পৃথক কাজের কোনো তুলনাও করে না। এমন কি এক অঙ্গকে অপর অঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না। এমনি ভাবে দীন ইসলামও একটি দেহ সদৃশ। তার বিভিন্ন অংশ আছে। কেউ মাদরাসায় তা‘লীম তারবিয়াতের কাজ করছে, কেউ তাবলীগ করছে, আবার কেউ খানকাতে তায়কিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজ করছে। এমতাবস্থায় দীনের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে অপরকে তুচ্ছ বা হয়ে জ্ঞান করে কিভাবে? তাছাড়া পরস্পরে কাজের তুলনা করা বা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা মনে করার সুযোগ কোথায়! এ কারণেই দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী আওলিয়ায়ে কিরাম দীনের সবধরনের খাদেমদের ইকরাম ও তা‘যীম তথা শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন।

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة : ২]

অর্থাৎ, ভালো কাজের পরস্পর সহযোগিতা করার নির্দেশ দিতেন। সুতরাং একে অপরকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে। ‘আমাদের’ ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে; ‘আমাদের’ মাদরাসা চলছে, ‘আমাদের’ দল আগে বাড়ুক; এসব কি ধরনের কথা! ? দীনকে সামনে রাখুন। নিজেকে পেশ করবেন না। কারোর বয়ান দ্বারা যদি সমাজের ব্যাপাক উপকার হয় বা কোন মাদরাসা দ্বারা যদি দীনের উপকার হয় তাহলে হিংসা বা আত্মপীড়নের কী আছে?’ (মাজালিসে আবরার, পৃ: ৮৪)

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের শক্তিশালী মুখপাত্র ও নির্ভীক সৈনিক আল্লামা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ. বলেন : ‘এ কাজ (দাওয়াত ও তাবলীগ) ছাড়াও দীনের আরো অনেক কাজ ও শাখা আছে। যেমন-মক্তব মাদরাসা ও দীনি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। অন্তর থেকেই সেগুলোকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা চাই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য আমাদের অন্তরে হামদদী ও সহানুভূতি থাকা উচিত। আল্লাহ তা‘আলার যেসব বান্দা ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে এসব বিষয়ে নিজেদের শ্রম ও কুরবানী পেশ করে যাচ্ছেন সেসব বান্দাদেরকে যথাযথ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ না করুন! আমাদের কাজকেই যদি দীনের একমাত্র কাজ মনে করি আর দীনের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টি হয় তাহলে এটা হবে আমাদের গোমরাহী ও বদনসীবী। বরং দীনের দাবীতে বদদীনী হবে। নিজেরদেকে বিশেষ করে হক্কানী-রব্বানী উলামায়ে কেরাম ও আহলুল্লাহদের খাদেম ও অনুগত ভৃত্য মনে করবে। তাদের থেকে উপকৃত হবার জন্য সময়ে

সময়ে তাদের খেদমতে হাজির হবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখাকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় প্রয়োজন মনে করবে।’ (আল ফুরকান, পৃ: ৭, ভলিয়ম-১৯)

ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন : ‘আমাদের এই আন্দোলনের (দাওয়াত ও তাবলীগ) সমসাময়িক অন্যান্য আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ‘বাণীনির্ভর’ বিষয়গুলোকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে ইখলাসের সাথে কাজ করে তাহলে আমাদের উচিত তাদের সাথে ইখতিলাফ না করা। বরং তাদের কাজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করা ও স্বীকৃতি দেয়া উচিত। সাথে সাথে তাদের জন্য দু‘আ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা।’ (মাসিক আল ফুরকান: পৃ: ৩-৫, ভলিয়ম: ২০)

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) বলেন: ‘উম্মতে মুসলিমাকে আজ চতুর্মুখী ফিতনা ঘিরে রেখেছে। ফিতনার যেন ঝড়-তুফান চলছে। কিংবা মুশলধারে বর্ষণ চলছে। এই চতুর্মুখী ঝড়-তুফানের মোকাবিলা করা কোনো এক জামাতের পক্ষে সম্ভব নয়। একেকটি জামা‘আতকে এখন একেকটি ফিতনার মোকাবেলায় শক্তভাবে দাঁড়ানো উচিত। এবং জ্ঞান, মাল, চিন্তা ভাবনা ও শক্তি-সাধনা সেই কাজেই পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা উচিত। কাজের পথ ও পছা ভিন্ন হতে পারে এবং ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তবে অন্যান্য দীনী মেহনতের প্রতিও হামদদী ও সহানুভূতি থাকতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক জামা‘আত যদি আচরণে ও উচ্চারণে একথা বুঝায় যে, এটাই একমাত্র কাজ এবং একমাত্র কর্মপন্থা; সুতরাং এটাই সবার করা উচিত তাহলে এটা হবে গুরুতর ভুল। কেননা আসল উদ্দেশ্য দীনের খেদমত। আর কোন মানুষ যদি ইখলাসের সাথে দীনের কোন খেদমতে নিয়োজিত থাকে তাহলে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বরং দু‘আ ও সাধ্যমতো তাকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু উদার মানসিকতা ও সহমর্মিতা আমাদের মাঝে এখন একেবারেই অনুপস্থিত। এটা অনেক রকম সমস্যা সৃষ্টি করে এবং দীনের বড় ধরনের ক্ষতি করে। এতে উম্মতের বিভিন্ন তবকার মাঝে অযথা ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি করে। (১৪২১ হিজরীতে ঢাকার বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে তিনি এ বয়ানটি করে ছিলেন।)

### বর্তমান পরিস্থিতি

আল্লামা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ. বলেন: ‘দীনের অপরাপর আন্দোলনের ও প্রতিষ্ঠানের খেদমত ও অবদান স্বীকার না করা, সেগুলোকে যথার্থ মূল্যায়ন না করা এবং সামান্য ইখতেলাফ ও মতানৈক্যের কারণে সমালোচনা মুখর হওয়া যামানার এক মহামারি ব্যাধি হয়ে দেখা দিয়েছে। আর শয়তানও এ কাজে বিরাট সফলতা পেয়ে গেছে। বিভিন্ন দল ও সংগঠনের এরকম মনোভাব সৃষ্টি করে উম্মতের দায়িত্বশীল লোকদেরকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। ফলে

প্রত্যেকেই একে অপরের দোষ চর্চায় মেতে উঠেছে। কিন্তু তার গুণ ও অবদানের কোন আলোচনাই নেই। (মাসিক আল ফুরকান, পৃ: ৩, ৪, ও ৫, ভলিয়ম: ২০)

আজ বাতিল যেখানে বিভিন্ন আকৃতি ও অবয়বে যে গুণু আত্মপ্রকাশ করছে তা-ই নয় বরং সমস্ত কুফরি শক্তি এক প্লাটফর্মে জমা হয়ে ইসলামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। **কুরআনের ভাষায়:**

{وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ} [الأنبياء : ৭৬]

অর্থাৎ, ‘প্রত্যেক উঁচু ভূমি হতে তারা দ্রুত ছুটে আসছে।’ এমন নায়কতম পরিস্থিতিতে আহলে হকের ঝান্ডাবাহী কর্মীদের এ অবস্থা বিদ্যমান থাকা খুবই পরিতাপের বিষয়। উচিত ছিল আপোসে মুহক্বাত ও ভালোবাসার আবহ গড়ে তোলা; যাতে পরস্পর সম্পর্ক ভালো থাকে।

### পরিস্থিতির দাবী

এ নায়ক পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেরই উচিত সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী পছন্দমতো যে কোন দীনী কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যিনি যে শাখাতেই কাজ করুন না কেন তিনি মূলত : দীনেরই কাজ করছেন। দীনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে অপরের সহকর্মী ও সহযোগী।

দুঃখ-দুর্দশায় শরিক হওয়া সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করা চাই। সর্বোপরি একে অপরের খেদমত সমূহের প্রশংসা করা এবং তার কাজের তারাক্বি ও অগ্রগামিতায় আনন্দ প্রকাশ করা। এজন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা।

১. ইহতিমামের সাথে একে অপরের জন্য দু‘আ করা। এবং পরস্পর একে অপরের নিকট দু‘আ দরখাস্ত করা। এতে লাভ এই হবে যে, প্রত্যেকেই অপরকে নিজের জন্য দু‘আ করনেওয়ালা মনে করবে। এভাবেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কারো কোনো ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেলে আপোসে বা বৈঠকে আলোচনা-সমালোচনা না করা বরং হামদদী ও সহানুভূতির সাথে তা সংশোধনের চেষ্টা করা। অথবা যাদের দ্বারা এর সংশোধন সম্ভব তাদেরকে অবহিত করা।

২. সময়-সুযোগ মত পরস্পর মিলিত হয়ে একে অপরের কাজের খোঁজ নেয়া। কাজের তরক্বী ও অগ্রগামিতায় আনন্দ প্রকাশ করা। কোন সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করা এবং সুপারমর্শ দেয়া।

৩. নিজের মহল্লার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা। যেখানে যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেয় সে কাজের যোগ্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এবং নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য করা।

৪. নিজেদের কাজের পরিচিত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা এবং তাতে অংশ গ্রহণের জন্য এমনভাবে উৎসাহ দেয়া যাতে দীনের অন্যান্য কাজের সাথে তুলনাও না হয় আবার তুচ্ছজ্ঞান করাও না হয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিবে যেন উদার মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে। (মাওলানা ইফজালুর রহমান কৃত ‘বা হামী রবত কেয়ছা হো?’)

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

### উনচল্লিশতম অধ্যায়

**মুহিউস্‌সুন্নাহ, মুজাদ্দিদে দীন হযরত মাওলানা শাহ আববারুল হক সাহেব রহ.-  
এর সংক্ষিপ্ত জীবনী**

মুহিউস্‌ সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আববারুল হক সাহেব রহ. ৮ রবীউস সানী ১৩৩৯ হিজরী মৃতাবেক ২০ ডিসেম্বর ১৯২০ ঈসাব্দী সনে ভারতের উত্তর প্রদেশের হারদুয়ী শহরের এক ধর্মনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এশিয়ার হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বংশধর। তাঁর পিতা জনাব মাহমুদুল হক রহ. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর স্নেহধন্য মুজাযে সোহবত ছিলেন।

#### শিক্ষা-দীক্ষা

হারদুয়ী শহরে স্বীয় পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া মাদরাসায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন এবং মাত্র ৮ বছর বয়সে পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফয সম্পন্ন করেন। ১৩৪৯ হিজরীতে উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র সাহারানপুর মাজাহিরুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৩৫৬ হিজরী সনে কৃতিত্বের সাথে ১ম স্থান অধিকার করে দাওরায়ে হাদীস তথা সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। [উল্লেখ্য হযরতজী ইউসুফ রহ. ও হযরতজী ইনু‘আমুল হাসান রহ. তাঁর দাওরায়ে হাদীসের সাথী ছিলেন।] ঠিক একই নিয়মে ১৩৫৮ হিজরী সনে কৃতিত্বের সাথে ১ম স্থান অধিকার করে “তাকমীলে ফুনুন” তথা উচ্চতর শাস্ত্রীয় গবেষণাও সম্পন্ন করেন।

#### কর্ম জীবন

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর শিক্ষকবৃন্দের ইচ্ছায় সাহারানপুর মুজাহিরুল উলূম মাদরাসায়ই তিনি শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এখানে কিছু দিন শিক্ষকতা

করার পর স্বীয় শাইখ হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর নির্দেশে তিনি মাদরাসা জামিউল উলূমে চলে যান। সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁর ইলমী গভীরতা ও অসাধারণ যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে “শাইখুল হাদীস” হিসাবে পদোন্নতি দান করেন। এরপর হযরত থানভী রহ.-এর দ্বিতীয় বারের মাশওয়ারায় তিনি ফতেহপুর ইসলামিয়া মাদরাসায় চলে যান এবং সেখানে সুনামের সাথে শিক্ষকতা করতে থাকেন।

### ‘আশরাফুল মাদারিস’ এর প্রতিষ্ঠা

অতঃপর যুগের চাহিদা পূরণে দীনের চতুর্মুখী কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ১৩৬২ হিজরীতে শাইখের হুকুমে নিজ এলাকায় চলে যান এবং জাতির আকাজ্জা পুরনে যুগান্তকারী মাইল ফলক হিসাবে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মাদরাসায়ে আশরাফুল মাদারিস প্রতিষ্ঠা করেন। এবং অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষা এবং আত্ম উৎসর্গের মাধ্যমে সেটাকে এমন সুবিন্যস্ত করে ঢেলে সাজান; যা পরবর্তীতে অন্যান্য সকল মাদরাসার জন্য আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হয়। মাদরাসায়ে আশরাফুল মাদারিস নিছক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম নয় বরং শিক্ষা-দীক্ষা, আত্মশুদ্ধি, দাওয়াত ও তাবলীগসহ দীনের যাবতীয় খেদমত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে আঞ্জাম দেয়ার এক বৃহৎ একটি প্রতিষ্ঠান। যার ফুয়ূয ও বারাকাত শুধু এশিয়ায় নয় বরং সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের উলামায়ে কেরাম তাঁর ফয়েয পেয়ে ধন্য হয়েছে।

### আধ্যাত্মিক জীবন

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর সাথে ইসলামী সম্পর্ক গড়ে তুলেন। মাজাহিরুল উলূম মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি হযরত থানভী রহ. এর হাতে আত্মশুদ্ধির বাইআত গ্রহণ করেন এবং প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্ম নিয়োগ করতে থাকেন। অধ্যয়ন থেকে ফারেগ হওয়ার পর ফতেহপুর মাদরাসায় অধ্যাপনা কালে মাত্র ২১ বছর বয়সে হযরত থানভী রহ. কর্তৃক খেলাফত লাভ করেন। চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা এমনকি মন-মানসিকতা আধ্যাত্মিক সাধনা, নিয়মানুবর্তীতা ইত্যাদিসহ সকল গুণাবলীর বিচারে হযরত থানভী রহ.-এর প্রতিচ্ছবি তাঁর ব্যক্তিত্বে ফুটে উঠায় সমাজের লোকেরা তাঁকে দ্বিতীয় থানভী বলে আখ্যায়িত করে। থানভী চিন্তা চেতনায় উদ্ভাসিত এ মহান ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিক সাধনায় এমন উৎকর্ষ সাধন করেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, জাতির কান্ডারী অসংখ্য অগণিত উলামায়ে কেরাম তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন এবং নিজেদের আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটান। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকায় রয়েছে তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরীদ।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পীর-মাশায়েখ এবং শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামও তাঁরই স্নেহধন্য মুরীদ ও খলীফা। বাংলাদেশে তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে রয়েছে বিশিষ্ট ২৮ জন খলীফা।

### মজলিসে দাওয়াতুল হকের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন

হযরত থানভী রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মজলিসে দাওয়াতুল হককে তার লক্ষ্য পানে পৌঁছাতে তিনি তাঁর পুরো জীবনটা ওয়াকফ করে দেন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, দীনী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসার, মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষকদের বিশেষ তারবিয়ত, ইসলামী মাজালিস, খাঁটি মুসলমান তৈরীর জন্য দেশ-বিদেশে সফর, শর'ঈ বিধান মুতাবিক মসজিদ পরিচালনা, বিনা পারিশ্রমিকে দীনী খেদমত, দুঃস্থ মানবতার সেবা এবং অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোসহ মজলিসে দাওয়াতুল হকের যাবতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নে আমৃত্যু কঠিন সাধনা চালিয়ে যান তিনি। ছুটে যান এশিয়া-আফ্রিকা ও ইউরোপ-আমেরিকার আনাচে কানাচে। লক্ষ লক্ষ পথহারা মানুষের হৃদয়ে জ্বালান হেদায়াতের অগ্নি মশাল। প্রতিষ্ঠা করেন দেশ-বিদেশে শত শত দীনী প্রতিষ্ঠান।

### ইহইয়ায়ে সুন্নাত

তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল: তিনি প্রতিটি কাজ সুন্নাত মুতাবিক সম্পাদন করতেন এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরীদদের জীবনেও তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতেন। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি বিশ্বের যেখানেই গমণ করতেন সেখানেই লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে হাত দিয়ে আদর্শ জীবনের দীক্ষা লাভ করে ধন্য হত। আমরা আগে অনেক কিতাব পড়ছি পড়িয়েছি এবং কম-বেশী আমলও করেছি। কিন্তু আমলকে কিতাবের সাথে মিলিয়ে তা সুন্নাত মুতাবিক করতে হবে তা আমাদের কল্পনায়ও আসতো না। কিন্তু যখন এ মহান বুয়ুর্গের সান্নিধ্য এবং সংশ্রবের সৌভাগ্য নসীব হল তখন আমাদের অধিকাংশ আমলই ভুল প্রমাণিত হল। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উযু, নামায, আযান, ইকামত, কাফন-দাফন ইত্যাদি আমলের ভুলসমূহ শুধরে দিলেন।

### কালামে পাকের মুহব্বাত ও তাসহীহ করার জযবা

কুরআনে কারীম আহকামুল হাকিমীনের কালাম, কুরআনের মুহব্বাত আল্লাহর মুহব্বাতেরই নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে বান্দা কুরআনে কারীমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার যত নৈকট্য লাভ করতে পারে অন্য কোন বস্তু দ্বারা তা কখনই সম্ভব নয়। তাই খোদাপ্রেমিক এ মহান বুয়ুর্গ একদিকে যেমন তাজবীদ সহকারে বিশুদ্ধ উচ্চারণে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী হন। অপরদিকে অন্যকেও সহীহ-শুদ্ধভাবে তা শিখানোর ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন। এ জন্য তিনি

ভারতে অন্তত ৩০০ নূরানী মাদরাসা কায়াম করেন, যেগুলো হযরত ওয়ালার নির্দেশে পরিচালিত হত এবং সেগুলোর শিক্ষক হারদুয়ী থেকে পাঠান হত তাদের পরীক্ষা হযরত কর্তৃক নির্ধারিত লোকেরা নিতেন। এজন্য যেখানেই তিনি সফর করতেন সেখানেই কুরআনের আয়মত, মুহক্বাত এবং সহীহ-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে বয়ান করতেন এবং মশক করাতেন। এমনকি হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণের পর প্রধান কর্মসূচীই হত “তাসহীহে কালামে পাক”।

এটা চির সত্য যে, যে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দেশ যত বেশী কুরআনে কারীমকে আপন করে তার যথার্থ হক আদায় করবে সে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দেশ তত বেশী সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ সকল দিক দিয়ে শান্তি-সুখ এবং নিরাপদে থাকবে। এটা হযরতের জীবনী থেকে আমাদের জন্য অন্যতম শিক্ষা। এজন্য তার খানকায় পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে যত বড় আলেমই আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য হাজির হতেন তিনি অবশ্যই নূরানী কায়দা নিয়ে মকতবে বসার পরামর্শ দিতেন। এটাই তাঁর সুলূকের পথ পাড়ি দেয়ার মূল বিষয় বস্তু ছিল। আর বাস্তবেও কুরআনে কারীমে ‘কুরআন শরীফকে জাহেরী ও বাতেনী সকল রোগের শিফা’ বলা হয়েছে।

### বাংলাদেশে হযরত ওয়ালার মুবারক সফর

দীনের বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তিনি সফর করেন। সেই ধারায় ১৯৮১ ঈসাব্দী সনে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর দাওয়াতে সর্বপ্রথম তিনি বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ বড় বড় মাদরাসায় সফর করে তাদের সুন্নাতের প্রতি আরো তৎপর হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং ঢাকা মহানগরীতে মজলিসে দাওয়াতুল হকের কাজকে গতিশীল করার জন্য প্রত্যেক থাণাভিত্তিক হালকা বা কমিটি করে দেন এবং হালকার আমীর ও নায়েবে আমীর মাসে দুবার ধানমন্ডি ইজতিমায় জমা হয়ে কাজের লিখিত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেন। যে ধারা এখনও চালু আছে। পরে তিনি বহুবার বাংলাদেশে তাসরীফ আনেন এবং বিভিন্ন শহরে ও মাদরাসাগুলোতে তাসরীফ নেন। সর্বশেষ ২০ ডিসেম্বর ২০০৪ ঈসাব্দী তারিখে মজলিসে দাওয়াতুল হকের ১১তম বার্ষিক ইজতিমা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগমণ করেন এবং এক সপ্তাহ অবস্থান করে এদেশের বহু ইসলামী জলসায় গুরুত্বপূর্ণ বয়ান রাখেন, প্রচলিত বিদ‘আত ও কুসংস্কার দূর করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধকদেরকে সুলূকের সহজ সরল রাস্তা বাতলে দেন।



## মনীষীদের উক্তি

\* পাকিস্তানের মুফতীয়ে আ‘যম হযরত থানভী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলেন: ‘হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব দা. বা. চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, তা‘লীম-তারবিয়ত ও তাদরীসের খেদমত অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিচ্ছেন। ফলে তাঁর ফুয়ূয ও বারাকাত সমগ্র হিন্দুস্তানের সর্বস্তরের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর বয়ানে ঐ সমস্ত দুর্লভ কথা-বার্তা শোনা যায় যা আমরা থানাভবনে শুনেছি।

\* উপমহাদেশের মহান শিক্ষাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন : ‘হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব দা. বা. আযীমতের অধিকারী এক মহান শাইখ ও নির্ভীক দায়ী ইলাল্লাহ।’

\* হযরত থানভী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা আরিফ বিল্লাহ ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলেন : ‘আল্লাহ পাক হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেবকে জাহেরী বাতেনী সর্ব গুণে গুণান্বিত করেছেন। তাঁর ওয়াজ নসীহতে হযরত থানভী রহ.-এর চিন্তাধারা ও স্বভাব ফুটে উঠে। তিনি অন্তর থেকে দরদ নিয়ে কথা বলেন। তাই তাঁর বয়ান শ্রোতাদের মনে বিস্ময়কর প্রভাব সৃষ্টি করে।

\* তাবলীগ জামা‘আতের বিশ্বআমীর হযরত ওয়ালার দরসের সাথী হযরত মাওলানা ইন‘আমূল হাসান হযরতজী রহ. বলেন: ‘হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব হচ্ছেন এক অসাধারণ মুসলিহুল উলামা। উলামায়ে কেরামের সংশোধনের মত দূরহ কাজ কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব।’

\* বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. বলেন: ‘আখেরী যুগে হযরতের অস্তিত্ব উম্মতের জন্য বিশাল এক পূজিভান্ডার। আলহামদুলিল্লাহ তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা এবং হেদায়াতের ফুয়ূয ও বারাকাত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।’

## মৃত্যু বা আখেরাতের সফর

উপমহাদেশের এ মহান ধর্মীয় সংস্কারক, সুন্নাত নববীর উজ্জল নক্ষত্র, যুগশ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল, হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর সর্বশেষ খলীফা ১৭ মে ২০০৫ ঈসাব্দী মঙ্গলবার সারা দিন কর্ম ব্যস্ত থেকে রাত আট ঘটিকায় ভারতের উত্তর প্রদেশের হারদুয়ী জেলায় নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। (আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম নসীব করুন! আমীন।) মৃত্যু কালে তাঁর বয়স ছিল ৮৮ বছর। মৃত্যুর পর তার ওসীয়ত মুতাবিক নিজস্ব খাস গোরস্থান থাকা সত্ত্বেও হারদুয়ী জেলা শহরের আম কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য : তার ওফাতের পর বাংলাদেশ থেকে যারাই তাঁর কবর যিয়ারতে হাজির হচ্ছেন সকলেই হযরতের হায়াতে তাঁর সোহবতে যে ধরনের নূর এবং



ফুযুয ও বারাকাত অনুভব করতেন হযরতের কবরের কাছে হুবুহু সে ধরণের ফুযুয ও বারাকাত অনুভব করে ধন্য হচ্ছেন এবং তার রেখে যাওয়া মসজিদ মাদরাসা খানকা ও মেহমানখানা ইত্যাদিকে হযরতওয়ালা হায়াতের নমুনায় পরিচালিত পেয়েছেন এর জন্য হযরতের জানিশীন হাকীম কালিমুল্লাহ সাহেবকে আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করুন। আল্লাহ তা‘আলা হযরতওয়ালার রেখে যাওয়া সকল দীনী কাজকে খায়ের ও বরকতের সাথে হেফাজত করেন এবং আমাদেরকে তাঁর কাজের সাথে জুড়ে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূত্র : হায়াতে আবরার, নুকুশে আবরার, সাওয়ানেহে আবরারুল হক হকী।

## চল্লিশতম অধ্যায়

### বিবিধ দীনী বিষয়

নায়েবে রাসূল ও তালিবে ইলমের গুণাবলী ও দীন কায়েমের কুরআনী তরীকা

সাইয়েদুনা হযরত ইবরাহীম খলীল আ. মানবজাতীর কল্যাণার্থে মহান আল্লাহ তা‘আলার দরবারে হযরত ইসমাইল আ. এর বংশে বিশেষ গুণাবলী সম্পন্ন একজন রাসূল প্রেরণের আবেদন জানিয়েছিলেন। কুরআনের ভাষা:

{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ} [البقرة: ১২৯]

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্যে (হযরত ইসমাইল আ. এর খান্দানে) এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরই মধ্য হতে হবেন এবং যিনি (১) তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন। (২) তাদেরকে কিতাব ও (৩) হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং (৪) তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। (সূরা বাকারা-১২৯)

মহান আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম আ. এর এই আবেদন কবুল করে সাইয়েদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আখেরী নবী ও সর্বশেষ রাসূল হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [آل عمران: ১৬৪]

অর্থ : আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের প্রতি অতি বড় অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্যে হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি (১) তাদের সামনে আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন (২) তাদের পরিশুদ্ধ

করেন এবং (৩) তাদেরকে কিতাব ও (৪) হিকমত শিক্ষা দেন। (সূরা আলে ইমরান-১৬৪)

লক্ষ্য করুন, হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহ তা‘আলার কাছে যে চার গুণ বিশিষ্ট রাসূলের আবেদন করেছিলেন, হুবহু সেই চার গুণ বিশিষ্ট রাসূলেরই সুসংবাদ এই আয়াতে দেয়া হল। তবে এখানে গুণাবলীর ধারাবাহিকতায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। আবেদনের ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধ করণের গুণটিকে বলা হয়েছে চার নাম্বারে আর সুসংবাদের ক্ষেত্রে সেটিকে আনা হয়েছে দুই নাম্বারে। আহলে দিল উলামায়ে কেরাম এর দু’টি হিকমত বর্ণনা করেছেন, (১) আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব সঠিকভাবে তুলে ধরতে এটা করা হয়েছে। (২) একথা বুঝানোর জন্য যে, নববী যিম্মাদারীর ধারাক্রম অনুযায়ী এটি চতুর্থ স্থানে হলেও কার্য ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সবার উপরে। বরং এটি দীনী সকল কাজের দিল এবং পূর্ব শর্ত। এটা ছাড়া দীনের খেদমত অর্থহীন। বরং ক্ষেত্র বিশেষে নিজের জন্য ও দীনের জন্য ক্ষতির কারণও বটে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল নবী রাসূলের আ. দীন কায়েমের তরীকা ছিল এক ও অভিন্ন। সেটা হল দীনের জরুরী পাঁচটি বিষয় (ঈমানিয়াত, ইবাদাত, মু‘আমালাত, মু‘আশারাত ও তাযকিয়া) বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে উল্লেখিত চার তরীকায় মেহনত করা। মেহনতের এ বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কারীমের চার স্থানে বর্ণনা করেছেন। যথা সূরা বাকারা, আয়াত নং ১২৯, সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৫১, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৬৪, সূরা জুমু‘আ, আয়াত নং-২।

সুতরাং এখন যারা নাযেবে রাসূল হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়ারিছ হিসেবে দীন কায়েমের মেহনত করতে চায় তাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে পাঁচটি বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। (১) ঈমান সহীহ ও শিরক মুক্ত হতে হবে। (২) ইবাদতসমূহ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী করতে হবে। (৩) রিয়িক হালাল রাখতে হবে। (৪) সতর্কতার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে বান্দার হক আদায় করতে হবে। (৫) আত্মশুদ্ধি (অন্তরের দশটি রোগের চিকিৎসা) করে সকল গুনাহ বর্জন করতে হবে এবং দশটি ভাল গুণ অর্জন করতে হবে। (বাকারা-১৭৭)

আর এগুলো আল্লাহর যমিনে বাস্তবায়ন করার জন্য চার লাইনে মেহনত করতে হবে।

এক  $يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ$  অর্থাৎ তাদের সামনে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করবে। এর প্রস্তুতির জন্য তিনটি কাজ করতে হবে।

(ক) কুরআন তেলাওয়াত সহীহ শুদ্ধ করতে হবে।

(খ) মু‘আল্লিম ট্রেনিং নিতে হবে, যাতে অল্প সময়ে অন্যকে কুরআন শিখানো যায়।

(গ) দাওয়াত ও তাবলীগে সময় দিয়ে দাওয়াত দেওয়ার তরীকা শিখতে হবে। যাতে দাওয়াতের মাধ্যমে জনসাধারণকে একত্রিত করে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শুনানো যায়।

দুই. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. অর্থ: তাদেরকে কিতাব তথা কুরআনের আহকাম শিক্ষা দিবে। এর জন্য তিনটি কাজ করতে হবে।

(ক) মুতালা‘আ (দরস পূর্ব অধ্যয়ন) করতে হবে।

(খ) নিয়মিত দরসে উপস্থিত থেকে উস্তাদ এর কথাগুলি আয়ত্ব করতে হবে।

(গ) তাকরার (পুনঃ পাঠ) করে তা ইয়াদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

তিন. وَالْحِكْمَةَ. অর্থ: হিকমত (নবীজীর সুন্নাত ও আদর্শ) শিক্ষা দিতে হবে। এর জন্যও তিনটি কাজ করতে হবে।

(ক) সকল কাজের সুন্নাত তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা মুখস্থ করতে হবে। উল্লেখ্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা কথাটি ব্যাপক। এর মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, ফিকহী সুন্নাত, মুস্তাহাব সবই দাখিল।

(খ) আমলী মশকের (ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ) মাধ্যমে তা সঠিকভাবে নিজের মধ্যে আমলে আনতে হবে।

(গ) পুরোপুরি আমলে আছে কি না মুরুব্বীদের পক্ষ থেকে তার নেগরানী হতে হবে।

চার. وَيُزَكِّيهِ. অর্থ: আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। এর জন্যও তিনটি কাজ করতে হবে।

(ক) কোন হক্কানী শাইখের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক গড়তে হবে।

(খ) শাইখকে নিজের অন্তরের ভাল মন্দ অবস্থা জানিয়ে ব্যবস্থাপনা নিতে হবে।

(গ) সে অনুযায়ী মেহনত মুজাহাদা করে তঁকে অবস্থা জানাতে হবে।

ইনশাআল্লাহ! উপরোক্ত নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী মেহনত করতে থাকলে নায়েবে রাসূলের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন সহজ হবে, সমাজে দীনী পরিবেশ

কায়েম হবে, কুফর-শিরক বিদ‘আত ও আল্লাহ তা‘আলার নাফরমানী বন্ধ হবে এবং দুনিয়াতে মুসলমানদের ইয্যত, শান্তি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

### পাঠদানের কতিপয় উসূল

১. মুদাররিসের জন্য তার ফনের ব্যাপারে ও পড়ানোর পদ্ধতির ব্যাপারে মুজতাহিদ হতে হবে। অর্থাৎ, যে ফন পড়াবে সে ফন ছাত্রদের মধ্যে কিভাবে আসবে সে ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে এবং চিন্তা-ফিকির করতে হবে। এরজন্য তাকে দুটি কাজ করতে হবে :

ক. প্রথম দিন পরীক্ষা নিয়ে মনে মনে ছাত্রদের দরজা নির্ধারণ কনে নিতে হবে; কে আ‘লা, কে মুতাওয়াসসিত, কে আদনা। তারপর প্রতিদিন নতুন সবক ঐ তারতীব মত শুনবে। কিন্তু পুরাতন সবক আদনা থেকে শুরু করবে।

খ. মুদাররিস মুতালা‘আ ব্যতীত দরসে যাবে না এবং মুতালা‘আর পরে কথাগুলো ফিকিরের মাধ্যমে তারতীব দিতে হবে। যাতে সর্বস্তরের ছাত্ররা সহজে বুঝতে সক্ষম হয়।

২. কঠিন বিষয়গুলো মুদাররিস নিজের কাছে নিবে। ছাত্রদের কাছে দিবে না। অর্থাৎ, নকশা করে বুঝিয়ে তাদের থেকে তারতীব মত শ্রবণ করে তারপর মতনের সরল অর্থ করবে।

৩. নিচের জামা‘আতের কিতাবগুলোতে অতিরিক্ত কথা বলবে না। একান্ত জরুরিতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলতে হবে। অতিরিক্ত কথা সংখ্যাসহ তারতীবওয়ার বলবে। উল্লেখ্য, উস্তাদের মা‘লুমাত অধিকা থাকতে হবে। যাতে ছাত্রদের প্রশ্নের সময় লাজওয়াব না হতে হয়।

৪. নিচের জামা‘আতের ছাত্রদের সামনে উপরের জামা‘আতের তাকরীর করবে না। যেমন: মীযানুস সরফ ঘন্টায় শরহে জামীর তাকরীর না করা। (তুহফাতুল উলামা: ১/৪৭০)

৫. সবকের সময়টা ভাগ করে নিবে। যেমন ৫মিনিট গতকালের সবক শুনা, ৫মিনিট মুতালা‘আ শুনা, ১০ মিনিট নকশা করে বুঝানো, ৫ মিনিট নতুন সবক শুনা, ৫ মিনিট মতনের তরজমা করা। ৫ মিনিট অতিরিক্ত অথচ জরুরী কথা বলা।

৬. কাফিয়া পর্যন্ত সকল জামা‘আতের নিয়ম হল প্রতি দিনের সবক ক্লাশেই ইয়াদ করিয়ে দিতে হবে। যাতে গলদ বুঝে তাকরার না করায় বা গলদ ইয়াদ না করে।

৭. ছাত্রদেরকে মুতালা‘আ, সবকে উপস্থিত ও তাকরারের উপর খুবই গুরুত্ব প্রদান করবে। মুতালা‘আর মধ্যে কতটুকু বুঝল, কতটুকু না বুঝল তার পার্থক্য করতে হবে। সবকে অনুপস্থিত নাজায়েয মনে করবে। ছোট ছোট গ্রুপ করে প্রত্যেকের তাকরারের ব্যবস্থা করবে।

৮. মুতালা‘আ, সবক মুখস্ত করা এবং পিছনের পড়া নেগরানী করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিবে। এসবের পাবন্দি না করলে সতর্ক করবে। আর পদ্ধতি বাতলানো ছাড়াই তাদেরকে মারাটা জুলুম। (মাজালিসে আবরার: ২৩৩)

৯. ছাত্ররা মুতালা‘আ না করলে সবক পড়াবে না। আর মুতালা‘আর পরীক্ষা নিবে। যেমন জিজ্ঞেস করবে, আজ কোন পর্যন্ত পড়াবে? যদি এমন কোন স্থানের কথা বলে যেখানে কথা অসম্পূর্ণ, অথবা কোন মাসআলার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যেটা মাসআলার পরে উল্লেখ রয়েছে। যদি কিছু বলতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে মুতালা‘আ দেখেনি অথবা মনযোগ দিয়ে দেখেনি। (মাজালিসে আবরার)

১০. পড়াবে অল্প কিন্তু মুতালা‘আ করাবে বেশী। এমন খেয়াল রাখবে না যে, বেশী বেশী পড়িয়ে দ্রুত কিতাব শেষ করতে হবে। কেননা কিতাব খতম করে কি হবে যদি বুঝেই না আসে অথবা মনে না থাকে। (মাজালিসে আবরার)

১১. প্রথমে মেছাল সামনে পেশ করতে হবে, তারপর কায়েদাকে তার সাথে ফিট করে দিতে হবে। অর্থাৎ, ইলমুস সরফের তরয অনুযায়ী পড়াবে। মীযান-মুনশাইব-এর তরযে নয়।

১২. কিতাবে আলোচ্য মাসআলার যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে সেটার উপর ক্ষান্ত করবে না। বরং আরো অনেক শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উদাহরণ বানিয়ে ছাত্রদেরকে দেখাবে। আর শুদ্ধ-অশুদ্ধের পার্থক্য তাদের মাধ্যমে করাবে। (মাজালিসে আবরার)

১৩. বদ আখলাক ও নেক আখলাকের উদাহরণসমূহ কুরআন-হাদীসের ছোট ছোট বাক্য থেকে বের করে মু‘রাব, মাবনী, আমেল, মা‘মুল ইত্যাদির মশক করাবে। যাতে নিয়মাবলীরও মশক হয়ে যায়, শিষ্টাচারও হাসিল হয় এবং মনের মধ্যে হাদীসগুলো ভালভাবে বদ্ধমূল হয়। (মাজালিসে আবরার)

১৪. সরফ শাস্ত্রের যে সব ফেয়ে'ল সহীহ, মাহমূয, মু'তাল ইত্যাদি হিসেবে ১১ প্রকার আছে প্রত্যেকটির সরফে সগীর এবং সরফে কাবীর মুখস্ত করিয়ে দিবে এবং সেগুলোর তা'লীলও প্রচুর পরিমাণে মশক করাবে। (মাজালিসে আবরার)

১৫. আরবী আদব পড়ানেওয়ালার জিম্মাদারী হল যে, সে আদব পড়ানোর সময়ও নাহব ও সরফের ইজরা করাবে। ১৬ কিসিম পড়ানোর পর হালাতে এ'রাব কি ও কেন? তরীকে এ'রাব কি ও কেন? এগুলো জিজ্ঞাসা করবে। তারকীব জিজ্ঞাসা করবে।

১৬. যদি উস্তাদ মনে করে যে, একবার তাকরীর করার দ্বারা ছাত্ররা তা ভাল করে বুঝতে পারবে না। তাহলে উক্ত বিষয়টি দ্বিতীয় বার আলোচনা করবে। (তুহফাতুল উলামা-১/৪৬০)

১৭. ছাত্ররা বুঝার উদ্দেশ্যে উস্তাদকে প্রশ্ন করতে থাকলে উস্তাদের বিরক্ত না হওয়া। বরং ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করে জওয়াব উপকারী মনে হলে তাৎক্ষণিক বা পরবর্তীতে তার উত্তর প্রদান করবে। (তুহফাতুল উলামা: ১/৪৬০)

১৮. ছাত্রদের জানা বিষয় হলে তা সহজে বলে দিবে না। বরং জানা বিষয়গুলো তাদের থেকেই উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে পিছনের কিতাবের নাম বলবে। তারপরে না পারলে ঐ বহসের নাম বলবে। সারকথা তাদের ব্রেনকে কাজে লাগাবে। কারণ যে অঙ্গকে কাজে লাগানো হয় তার শক্তি বেড়ে যায়। অন্যথায় তা বেকার হয়ে যায়।

১৯. তাকরীর শেষ করার পর যদি উস্তাদ বুঝতে পারেন যে, তার তাকরীর ভুল হয়েছে, তাহলে সাথে সাথে তা থেকে রুজু করে নিবে। কেননা স্বীয় ভুল স্বীকার না করে তার উপর অটল থাকলে কয়েকটি ক্ষতি হয়ে থাকে। যথা:

ক. গুনাহে জর্জরিত হতে হয়।

খ. যদি ছাত্ররা জানতে পারে যে, উস্তাদ ভুল তাকরীর করেছেন, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই উক্ত উস্তাদের প্রতি তাদের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে।

গ. উস্তাদের অধিকাংশ আখলাকের প্রতিফলন ছাত্রদের মধ্যে ঘটে। সুতরাং যদি খোদা নাখাস্তা উক্ত উস্তাদের এ খারাপ গুণটি ছাত্রদের মধ্যে এসে যায় তাহলে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসের মিসদাক হবেন : (তুহফাতুল উলামা: ১/৪৬৮)

- وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا وَوَزُرْ مَنْ عَمِلَ بِهَا [النسائي - ২০০৫: ৮]

২০. যদি ছাত্র কোন কথা বলে আর সেটাই হক হয় তাহলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মেনে নিবে। টাল-বাহানা করবে না। (মাজালিসে আবরার)

২১. পড়ানোর সময় অন্যদের সাথে কথা বলে ছাত্রদের ক্ষতি করবে না এবং তাদেরকে কিতাবের সাথে সম্পর্কহীন কথা-বার্তা বলে বিচলিত করবে না। (মাজালিসে আবরার)

২২. পুরাতন পাঠের খুব নেগরানী করবে। (মাজালিসে আবরার)

২৩. ছাত্রদের সামনে কোন সবক সম্পর্কে “কঠিন” শব্দ উল্লেখ করা যাবে না। এতে ছাত্ররা ওটা ইয়াকীন করে হিম্মত হারিয়ে আর বুঝতে পারে না। হ্যাঁ! তবে সবক শেষ করে ভালভাবে বুঝিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, এই সবকটি অনেকেই কঠিন বলে ধারণা করে, যা একদম ভুল। তোমরা দেখতে পেলে এ সবক সহজ।

২৪. বাচ্চাদের সামনে তাওয়াযু (বিনয়) করা যাবে না। অর্থাৎ, এমন বলা যাবে না যে, আমি কিছুই নই, আমি হাকীর, ফকীর ইত্যাদি। কারণ ছোট ছাত্ররা এটাকেই বিশ্বাস করে নেয়। এতে উস্তাদের প্রতি ছাত্রদের ধারণা খারাপ হয়ে যায়। তবে যদি একান্ত সমস্যা হয় বা আটকে যায় তাহলে হেকমতের সাথে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ, জানা নেই তাও বলবে না। গলদ ব্যাখ্যাও করবে না। বরং সকলকে হল করে আসার জন্য বলবে। তারপর তারা না পারলে বলে দিবে।

২৫. উস্তাদ সকল ছাত্রকে এক নজরে দেখবেন। যাতে কোন ছাত্র না ভাবতে পারে যে, উস্তাদ আমার প্রতি বেশী লক্ষ রাখেন না। কারণ এতে পড়ার প্রতি উক্ত ছাত্রের আগ্রহ কমে যাবে। (মাজালিসে আবরার)

২৬. কোন ছাত্র সবক না পারলে তাকে গরু, ছাগল, গাধা ইত্যাদি বলা যাবে না। কারণ উস্তাদ মা-বাবার মত। আর তাদের দু’আও মা-বাবার দু’আর মত কবুল হয়। তাই কোন কথা দু’আ হিসাবে আর কোনটা বদ দু’আ হিসাবে কবুল হয় তা বলা যাবে না। ছাত্রদের বেত্রাঘাতও করবেনা।

### শিক্ষকের দায়িত্ব

১. শিক্ষক হওয়ার পূর্বে কোন শাইখে কামেলের নিকট সংশোধিত হওয়ার চেষ্টা করবে। (কসদুস সাবীল: ৪৯ (বাংলা))

২. ছাত্রদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কেননা তারা নিজেদেরকে আপনার নিকট সোপর্দ করেছে, যেন আপনি আপনার শস্য ক্ষেতে খুব আগ্রহের সাথে কাজ করতে পারেন।

৩. সব কাজ থেকে ফারোগ হয়ে কিছু সময় নির্জনে স্বীয় নফসের হিসাব-কিতাব করবে। যথা: আমি আল্লাহ তা’আলার হুকুমসমূহ কী কী পূর্ণ করেছি? কোন কোন নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন করেছি? শিক্ষা-দীক্ষায় আমার কী কী ত্রুটি প্রকাশ

পেয়েছে? আল্লাহ তা‘আলার পছন্দনীয় কাজ করতে সক্ষম হলে অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। আর গুনাহে লিপ্ত হলে অন্তর থেকে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে।

৪. দাড়া-গোফ বিহীন সুশ্রী বালকের সাথে নির্জনতা অবলম্বন থেকে খুব সতর্ক থাকবে। আর প্রকাশ্যেও প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা-বার্তা বলবে না। তাদের দিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে দৃষ্টিপাত করবে না। এবং তাদের কথা নফসের তাকাযার সাথে শুনবে না। কেননা সুশ্রীবালক পূজার ব্যাধি এভাবেই সৃষ্টি হয়। প্রথমে একদম খবর থাকে না। আর যখন শিকড় মজবুত হয়ে যায় তখন তাদের থেকে পৃথক হওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

৫. যদি ছাত্রদের কোনো কথা বা কাজ তরবিয়তের বিপরীতে হয় এবং বিরক্তির উদ্বেক করে তাহলে এটা চিন্তা করবে যে, তাদের দ্বারা আমার দীনের অনেক উপকার হচ্ছে, মাফ করে দিবে। মাফ করার দ্বারা আল্লাহ পাকের আরে বেশী নৈকট্য নসীব হবে।

যদি কোন ছাত্র মাদরাসা থেকে চলে যায় তাহলে মন খারাপ করবে না, পেরেশান হবে না যে, আমার সুনাম চলে গেল!! এখন আমার দিন কিভাবে কাটবে? আর ঐ ছাত্র বা তার অভিভাবকদের কখনো খোশামদ করবে না। আল্লাহ উপর ভরসা রাখবে। (মাজালিসে আবরার-২২৬)

### তারবিয়াত

১. নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। যাতে ছাত্রদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর দ্বারা লৌকিকতা বা বানোয়াটী উদ্দেশ্য নয়।

২. যে ব্যাপারে আপনি ছাত্রদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ফেলতে চান ঐ ব্যাপারে আপনি নিজে প্রথমে আমলকারী বনে যাবেন।

৩. সব সময় দু‘আ করবেন : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তা‘লীম-তারবিয়াত ও সংশোধনের পদ্ধতি শিখিয়ে দিন। এবং এতে বরকত নসীব করুন। কবুল করুন। সংশ্লিষ্ট সকলকে ইলম ও আমল দান করুন। এবং তাদের ভিতর-বাহিরকে পরিশুদ্ধ করে দিন।

৪. সর্ব বিষয়ে দীনের পাবন্দীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

৫. ছাত্রদের মধ্যে এমন মানসিকতা গড়ে তুলবে যেন তারা হক কথা মেনে নেয়, হঠকারিতা না করে। (মাজালিসে আবরার: ২২৩)

বাচ্চাদের শাসন করার শর‘ঈ পদ্ধতি



চারাগাছটিকে যেমন সার-পানি, আলো-বাতাস দিয়ে পুষ্টি যোগাতে হয়। মানব শিশুকেও তেমন আদব-কায়দা, শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে সভ্যতার উপাদান সরবরাহ করতে হয়। আগাছা তুলে না দিলে, বাড়তি ডালপালা ছেঁটে না দিলে চারাটি যেমন বৃক্ষ পরিণত হতে পারে না। তেমনি আদর-সোহাগের পাশাপাশি অনুশাসনের ছড়িটি না থাকলে মানব-শিশুটিও “মানুষ” হয়ে উঠতে পারে না। তবে সার-পানি, আর ডাল ছাঁটার কথাই বলি, কিংবা শিক্ষা-দীক্ষা আর অনুশাসনের কথাই ধরি- প্রয়োগ করতে হয় সুক্ষ্ম কৌশলে ও সযত্ন প্রয়াসে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে পরিচর্যাকারীকে হতে হয় একই সঙ্গে কুশলী ও সদা-সতর্ক। কারণ, চারাগছ ও শিশুর পরিচর্যা এমনই নায়ক যে, সামান্য অবজ্ঞা ও অবহেলায় এবং সামান্য অমনোযোগিতা ও অসতর্কতায় উভয়ের জীবনে নেমে আসে চরম সর্বনাশ।

অনেকে বাচ্চাদের বদ অভ্যাসের প্রেক্ষিতে রাগ বা শাসন করতে নারাজ। তাদের কথা হল, এখন কিছুই বলার দরকার নেই, বড় হলে সব এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। এটা মারাত্মক ভুল। হাকীমুল উম্মত হযরত খানভী রহ. বলেছেন, বাচ্চাদের স্বভাব-চরিত্র যা গড়ার পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে গঠন হয়ে যায়। এর পর ভাল-মন্দ যেটাই হল তা মজবুত ও পাকাপোক্ত হতে থাকে, যা পরবর্তীতে সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং বাচ্চা বুঝুক আর না বুঝুক ছোটবেলা থেকেই বুঝাতে থাকবে। এক সময় সে বুঝবে এবং উত্তম চরিত্র নিয়ে বড় হবে। (ইসলাহে খাওয়াতীন ২৫১-২৫২, তুহফাতুল উলামা-১/৪৮৩)

আজকাল বাসা-বাড়িতে, স্কুল-কলেজে, এমনকি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও (যারা শাসনের পক্ষে তাদের থেকে) বাচ্চাদের উপর শাসন নামের নির্যাতন চোখে পড়ে। সে শাসনের না আছে কোন মাত্রা, আর না আছে শাসিতের প্রতি হিতকামনা। এতে একদিকে শাসনকারী নিজেকে আল্লাহ তা‘আলার ধর-পাকড়ের সম্মুখীন করছে। অপরদিকে জুলুমের শিকার শিশু বা ছাত্র রাগে-ক্ষোভে হয়তো পড়া-লেখাই ছেড়ে দিচ্ছে বা আরো ঘোরতর অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, বাচ্চাদের শাসন করার ক্ষেত্রে শরী‘আত নির্দেশিত পন্থা ও সীমা উপেক্ষা করা। (তুহফাতুল উলামা-১/৪৯৩)

চলমান পরচায় পিতা-মাতা ও শিক্ষক কর্তৃক সন্তান ও ছাত্রদের শাসন করার সহীহ পদ্ধতি বাতলে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(১) কোন শিশু বা ছাত্র তার সাথীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তা শোনামাত্রই মেজাজ বিগড়ানো যাবে না। কেননা, শরী‘আতে এক পক্ষের অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা নেই। কাজেই উভয় পক্ষের কথা না শুনে কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া

বা একজনকে শাস্তি দেয়া যাবে না। অন্যথায় খোদ ফায়সালাকারীই জালেম সাব্যস্ত হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী, বৈরুত সংস্করণ-৩/৩০৯)

(২) সবার কথা শোনার পর যখন ফায়সালা করার ইচ্ছা করবে, মনের মধ্যে কোনরূপ রাগ বা গোস্বা স্থান দেয়া যাবে না। কারণ, রাগের সময় বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। ফলে অধিকাংশ সময়ই রাগের মাথায় ফায়সালা ভুল প্রমাণিত হয়। এ কারণেই রাগান্বিত অবস্থায় ফায়সালা দেয়া বা শাস্তি প্রদান করা শরী‘আতে নিষেধ। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭১৫৮, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৭১৭, তুহফাতুল উলামা-১/৪৮৬, ৪৯৮)

সুতরাং (ক) একেবারে ঠান্ডা মাথায়। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭১৫৮, তুহফাতুল উলামা-১/৪৯০)

(খ) আল্লাহ তা‘আলাকে হাজির জেনে। (সূরা তাওবা, আয়াত-১০৫)

(গ) হাশরের ময়দানে জবাবদিহিতার কথা স্মরণে রেখে। (সূরা যিলযাল, আয়াত : ৮, বুখারী শরীফ হাদীস নং-৫১৮৮)

(ঘ) স্থান-কাল পাত্র বিবেচনা করে। (ফাতওয়া শামী-৪/৬০-৬১, কিতাবুল ফিকহ আলল মাজহাবিল আরবা‘আ-৫/৩৫২, তুহফাতুল উলামা-১/৪৮৫) যেমন পৃথক স্বভাবের কারণে কারো দুই থাপ্পড় আবার কারো জন্য দুই ধমক

(ঙ) অপরাধীর সংশোধনের নিয়তে। (সূরা হুদ, আয়াত-৮৮)

(চ) শরী‘আতের সীমার মধ্যে থেকে। যে শাস্তি সংগত মনে হয়-নির্ধারণ করবে। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৯০)

(৩) শরী‘আতে নাবালেগ বাচ্চাকে বেত বা লাঠি দ্বারা প্রহার করার কোনো অবকাশ নেই। প্রয়োজনে ধমকি-ধামকি দিয়ে, কান ধরে উঠ-বস করিয়ে, এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বা বিকেলে খেলা বন্ধ রেখে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। একান্ত অপরাগতায় হাত দিয়ে প্রহার করার অনুমতি আছে (লাঠি বা বেত দিয়ে নয়)। কিন্তু কোনো ক্রমেই (ক) তার সংখ্যা যেন তিনের অধিক না হয়। (ফাতাওয়া শামী-১/৩৫২)

(খ) চেহারা ও নায়ুক অঙ্গে যেমন মাথায় পেটে ইত্যাদিতে আঘাত করা হয়। (আদ দুররুল মুখতার-৪/১৩)

(গ) যখম হয়ে যায় বা কালো দাগ পড়ে যায় এমন জোরে না হয়। (ফাতাওয়া শামী-৪/৭৯) কারণ, নাবালেগ বাচ্চাকে এই অপরাধে তিনের অধিক প্রহার করা এবং (বালেগ, নাবালেগ সবার ক্ষেত্রেই) মুখমন্ডল ও নায়ুক অঙ্গে আঘাত করা হারাম। আর বালেগ ছাত্রকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তার অপরাধের ধরণ অনুযায়ী শরী‘আতের দন্ডবিধির আওতায় এনে (যা ২নং এ বর্ণিত হয়েছে) বেত ইত্যাদি

দ্বারা সীমিত সংখ্যায় (সর্বোচ্চ ১০ (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৬৮৪৮, ৬৮৪৯, ৬৮৫০, কিতাবুল ফিকহ আলাল মাজহাবিল আরবা‘আ-৫/৩৫২)) প্রহার করা জাযিয় আছে। উল্লেখ্য, বেত হতে হবে গিঁটহীন, সরল ও মাঝারী ধরনের মোটা, যা ব্যাথা পৌঁছাবে কিন্তু দাগ ফেলবে না। (ফাতাওয়া শামী-৪/১৩)

(৪) কোনো ধরনের অমানবিক শাস্তি দেয়া-যেমন, হাত-পা বেঁধে পিটানো, পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখা, সিলিংয়ে ঝোলানো, কপালে পয়সা দিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে রাখা ইত্যাদি বিলকুল হারাম ও নাজাযিয়। (সূরা বাকারা আয়াত: ১৯০, বুখারী শরীফ, হাদীস নং-২৪৪৭, তুহফাতুল উলামা-১/৪৯২)

(৫) ধমকি বা কড়া কথার মাধ্যমে হোক আর শরী‘আত অনুমোদিত প্রহারের মাধ্যমেই হোক- সতর্ক করার উত্তম তরীকা হল- সবার সামনে মজলিসে শাস্তি বিধান করা। যাতে অন্যদের জন্যও তা উপদেশ হয়ে যায়। (সূরা নূর, আয়াত-২)

এ ক্ষেত্রে যাকে শাস্তি দেয়া হবে, প্রথমে তাকে শাস্তি গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেয়া। তাকে একথা বুঝানো যে, মানতে কষ্ট হলেও শাস্তির এই ব্যবস্থা মূলত তার কল্যাণের জন্য। এর দ্বারা শয়তান তার থেকে দূর হবে। তার দুষ্টামীর চিকিৎসা হবে। আর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হলে এ শাস্তি দ্বারা তার পিতা-মাতা যে মহান উদ্দেশ্যে তাকে উস্তাদের হাতে সোপর্দ করেছেন- তা পূর্ণ হবে এবং শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। ঠিক যেমন রোগীর কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তাররা তার অপারেশন করে থাকে। এতে কিন্তু রোগী অসন্তুষ্ট হয় না বরং ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাকে “ফি” ও দিয়ে থাকে।

(৬) এরপর শাস্তি প্রদানকারী পিতা-মাতা বা উস্তাদ শাস্তি প্রদানের পূর্বে নিম্নোক্ত দু‘আটি অবশ্যই পড়ে নিবেন

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَذِيْتَهُ أَوْ شَتَمْتَهُ أَوْ لَعَنْتَهُ أَوْ جَلَدْتَهُ فَاجْعَلْهُ لِي زَكَاةً وَصَلَاةً وَقُرْبَةً تَقْرِبُهُ بِيَّهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . [مسند أحمد: ١٥]

[৭৮.০২: ৪৭৮ /

[অর্থ:- হে আল্লাহ, আমি তোমার তরফ থেকে অবশ্য পূরণীয় একটি ওয়াদা কামনা করছি, (ওয়াদাটা হল) আমি একজন মানুষ হিসেবে (ভুলবশত) কোন মুমিন বান্দাকে কষ্ট দিলে, গালি দিলে, বদ দু‘আ দিলে, প্রহার করলে তুমি সেটাকে তার জন্য পবিত্রতা, নেয়ামত ও নৈকট্যের ওসীলা করে দিও এবং কিয়ামতের দিন এর দ্বারা তাকে তোমার নৈকট্য দান করো। (মুসনাদে আহমদ- ২/৪৪৯, হাদীস নং-৯৮১৬)]

এবং উস্তাদ মনে মনে এই খেয়াল করবে, “এই তালিবে ইলম নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-২৬৫০, ২৬৫৬)

সুতরাং এ হল শাহাজাদা, আর আমি তার শাস্তি বিধানকারী জল্লাদ মাত্র। আমাকে তার সংশোধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলেই তাকে প্রহার করছি। আল্লাহ তা‘আলার কাছে তার মর্যাদা তো আমার চেয়ে বেশী ও হতে পারে। (তারপর পূর্ব নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করবে)।

(৭) শাস্তি প্রয়োগের সময় রাগান্বিত অবস্থায় শাস্তি প্রয়োগ করবে না। তবে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করতে পারবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭১৫৮, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৭১৭)

(৮) কোন বাচ্চার দ্বারা অন্য বাচ্চাকে বা এক ছাত্রের দ্বারা অপর ছাত্রকে শাস্তি দিবে না। এটা শাস্তি প্রদানের ভুল পন্থা। এতে বাচ্চাদের মধ্যে পরস্পরে দুশমনী সৃষ্টি হয়। (তুহফাতুল উলামা-১/৪৯২)

(৯) শাস্তি প্রদান শেষে অন্যান্য ছাত্রদের বলে দিবে, “এ ব্যাপারে এর সঙ্গে কেউ ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে তাকেও কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। তা ছাড়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করা অনেক বড় গুনাহ এবং পরবর্তিতে বিদ্রূপকারী নিজেও ঐ বিপদে পড়ে যায়। সুতরাং তোমরা তার জন্য এবং নিজেদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করতে থাকবে।” (সূরা হুজুরাত, আয়াত-১১, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-২৫০৫)

(১০) বাচ্চাদের দায়িত্ব হল, শাস্তিদাতা পিতা-মাতা বা শিক্ষকের শুকরিয়া আদায় করা এবং তার জন্য আল্লাহর দরবারে মঙ্গলের দু‘আ করা। কারণ, তিনি কল্যাণ কামনা করেই শাস্তি দেয়ার কষ্ট বরদাশত করেছেন। সুতরাং কোন অবস্থায়ই সেই মুকুব্বীদের উপর মন খারাপ করবে না ও তার সমালোচনা করবে না। (সূরা আর রাহমান, আয়াত-৬০, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১৯৫৯, ১৯৬০)

(১১) শাস্তির পরিমাণ বেশী হয়ে গেছে আশংকা করলে পরবর্তীতে শাস্তিপ্ৰাপ্তকে ডেকে আদর করবে এবং ২/৫ টাকা বা অন্য কিছু হাদিয়া দিয়ে অন্য কোন উপায়ে খুশি করে দিবে। যাতে উস্তাদের প্রতি তার সু ধারণা বজায় থাকে, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না হয় এবং আখেরাতে এর জন্য কোন দাবী না রাখে। (তুহফাতুল উলামা-১/৪৯৭)

(১২) প্রতিষ্ঠান-প্রধানের কর্তব্য, হল, সকল শিক্ষককে দৃষ্ট ছাত্রদের ব্যাপারে রিপোর্ট দিতে বলবেন, কিন্তু সকলকে প্রহারের শাস্তির অনুমতি দিবেন না। কারণ, সকল শিক্ষক এ কাজের যোগ্য না। অনেকে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। সুতরাং রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে

সক্ষম এমন দু'একজনকে এ দায়িত্ব দিবেন। যেমন অপারেশনের দায়িত্ব শুধু সার্জারী বিভাগের ডাক্তারকে দেয়া হয়। যে কোন ডাক্তার তা পারেন না। তবে ৩নং বর্ণিত হালকা শাস্তি যে কোন শিক্ষক দিতে পারেন। (মুহিউস সুন্নাহ আবরারুল হক রহ.)

## ঈদের সুন্নাতসমূহ ও জরুরী মাসআলা-মাসাইল

### দুই ঈদের রাত্রে ফযীলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে তার অন্তর সেই দিনও মৃত্যু বরণ করবে না যে দিন সকলের অন্তর মৃতপ্রায় হয়ে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং-১৭৮২)

### তাকবীরে তাশরীফ

যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ ফজরের ফরয নামাযের পর হতে ১৩ তারিখ আসরের ফরযের পর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সকল সাবালক পুরুষ, মহিলার যিম্মায় উক্ত তাকবীর একবার বলা ওয়াজিব। তিনবার বলা ওয়াজিব নয়। পুরুষগণ উচ্চস্বরে আর মহিলাগণ নিম্নস্বরে পড়বে। তাকবীরে তাশরীফ এই- **اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ** -এই-

### ঈদের সুন্নাতসমূহ

১. অন্য দিনের তুলনায় সকালে ঘুম থেকে উঠা। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৫৯, বাইহাকী হাদীস নং-৬১২৬)
২. মিসওয়াক করা। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৯)
৩. গোসল করা। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নাম্বার-১৩১৫)
৪. শরী‘আত সম্মত সাজ-সজ্জা করা। (সহীহ বুখারী শরীফ হাদীস নাম্বার-৯৪৮)
৫. সামর্থ অনুযায়ী উত্তম পোষাক পরিধান করা। উল্লেখ্য, সুন্নাত আদায়ের জন্য নতুন পোষাক জরুরী নয়। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৯)
৬. সুগন্ধি ব্যবহার করা। (আদুররুল মুখতার-২/১৬৮)
৭. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টি জাতীয় জিনিস, যেমন খেজুর ইত্যাদি খাওয়া। তবে ঈদুল আযহাতে কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং ঈদের নামাযের পর নিজের কুরবানীর গোশত দ্বারা আহার করা উত্তম। (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৯৫৩, আদুররুল মুখতার-২/১৬৮)
৮. সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া। (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নাম্বার-১১৫৭)

৯. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা। (আব্দুররুফ মুখতার-২/১৬৮)

১০. ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা সুন্নাত। বিনা উযরে মসজিদে আদায় করা উচিত নয়। (সহীহ বুখারী হাদীস নাম্বার-৯৫৬)

১১. যে রাস্তায় ঈদগাহে যাবে সম্ভব হলে ফেরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরা। (সহীহ বুখারী হাদীস নাম্বার-৯৮৬)

১২. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৯০)

১৩. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে এই তাকবীর বলতে থাকা (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ)

তবে ঈদুল আযহাতে যাওয়ার সময় এই তাকবীর উচ্চস্বরে পড়তে থাকবে। (বাইহাকী হাদীস নং-৬১৩০)

### ঈদের মুস্তাহাবসমূহ

১. সাধ্যানুযায়ী অধিক পরিমাণে দান খয়রাত করা। (আব্দুররুফ মুখতার-২/১৬৯)

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈদ মনে করে আনন্দ এবং খুশি প্রকাশ করা। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৯)

৩. নিজ মহল্লার মসজিদে ফজরের নামায আদায় করা। ফজরের নামায জামা‘আতের সাথে সর্বদা আদায় করা অত্যন্ত জরুরী এবং ওয়াজিব। তবে দুই ঈদের ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে জামা‘আতের সাথে আদায় করা অতি উত্তম। (তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-২৮৯-২৯০)

### ঈদের নামাযের তরীকা

প্রথমে কান বরাবর উভয় হাত তুলবে। তারপর এই ভাবে নিয়ত করবে যে “আমি ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দুই রাকা‘আত ওয়াজিব নামায এই ইমামের পিছনে পড়ছি।” অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত নাভির নিচে বাঁধবে এবং ছানা “সুবহানাকা...” পুরা পড়বে। তারপর আরো তিন বার তাকবীর বলবে। প্রথম দুইবার হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহ্ আকবার বলে হাত ছেড়ে দিবে। এরপর তৃতীয় বার হাত কান পর্যন্ত তুলে আল্লাহ্ আকবার বলে হাত বেঁধে চুপ করে ইমামের কিরাআত শ্রবণ করবে। এভাবে প্রথম রাকা‘আত আদায়ের পর দ্বিতীয় রাকা‘আতের কিরাআতের পর তিন বার হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে প্রত্যেকবার আল্লাহ্ আকবার বলে হাত ছেড়ে দিবে। এরপর চতুর্থ বার হাত না তুলে আল্লাহ্ আকবার বলে রুকুতে যাবে এবং অবশিষ্ট নামায অন্যান্য নামাযের ন্যায় সম্পন্ন করবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১/১৭২)

## ঈদের মাসআলা-মাসাইল

১. মসজিদের বিছানা, চাটাই, শামিয়ানা ইত্যাদি ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া দুরুস্ত। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/৩৫৯)

২. যে ব্যক্তি দাড়ি মুন্ডায় অথবা একমুঠির কম রেখে কর্তন করে তাকে ইমাম বানানো জায়েয নেই। ঈদ এবং অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে একই হুকুম। ইমামতের বেলায় উত্তরাধিকারীর দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং শরী‘আতের দৃষ্টিতে ইমামতীর যোগ্য হওয়া জরুরী। (আদুররুল মুখতার-২/৫৫৯)

৩. ঈদের নামাযের পূর্বে নিজ ঘরে বা ঈদগাহে ইশরাক ইত্যাদি নফল পড়া নিষিদ্ধ। ঈদের জামা‘আতের পরেও ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরুহ। হ্যাঁ, ঘরে ফিরে ইশরাক, চাশত নফল পড়তে কোন অসুবিধা নেই। (আদুররুল মুখতার-২/১৬৯)

৪. ঈদের নামাযের সালাম ফিরানোর পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব। ঈদের খুতবার পরে মুনাজাত করা মুস্তাহাব নয়। (মুসনাদে আহমদ হাদীস-২২১৮)

৫. শর‘ঈ ওয়র ব্যতীত ঈদের নামায মসজিদে আদায় করা সুন্নাতের খেলাফ। (আদুররুল মুখতার)২/১৬৯)

৬. যদি ইমাম অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ ভুল বশতঃ না বলে, আর ঈদের জামা‘আত অনেক বড় হয়, তাহলে ফেতনা ফাসাদের আশংকায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। সুতরাং সিজদায়ে সাহু করবে না। আর যদি এমন হয় যে উপস্থিত সকলেই সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে অবগত হতে পারে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (আদুররুল মুখতার-২/৯২)

৭. ঈদের দ্বিতীয় রাকা‘আতের রুকুর তাকবীর ওয়াজিব। যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকা‘আতের রুকুতে শরীক হয় তাহলে সে প্রথমে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় হাত তুলে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে। এরপর রুকুর তাকবীর বলে রুকুতে शामिल হবে। (আদুররুল মুখতার-২/১৭৪)

৮. যদি কেউ প্রথম রাকা‘আতে রুকুর পূর্বে জামা‘আতে শরীক হয় এবং তাকবীরে তাহরীমার পর দাঁড়ানো অবস্থায় হাত তুলে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার সুযোগ না পায় তাহলে রুকুতে গিয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে। তবে সে ক্ষেত্রে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না। (আদুররুল মুখতার-১/২৭৪)

৯. যদি প্রথম রাকা‘আত ছুটে যায় তাহলে ইমামের সালামের পর দাঁড়িয়ে প্রথমে, সূরা, কিরাআত পড়বে। অতঃপর রুকুর পূর্বে তিন বার হাত তুলে তিন



তাকবীর দিবে। তারপর রুকুর তাকবীর বলে রুকু সিজদা করে যথা নিয়মে নামায সম্পন্ন করবে। (রুদ্দুল মুহতার-২/১৭৪)

১০. ঈদের ময়দানে জানাযার নামায পড়া জায়েয। প্রথম ঈদের নামায অতঃপর জানাযার নামায এরপর খুতবা হবে। (রুদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৬)

১১. বর্তমানে খতীব সাহেবগণ ঈদের খুতবার শুরুতে ও মাঝে মাঝে যে তাকবীরে তাশরীফ বলে থাকেন নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা হলো, প্রথম খুতবার শুরুতে নয় বার, দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাত বার এবং দ্বিতীয় খুতবার শেষে মিস্বার থেকে নামার পূর্বে চৌদ্দ বার শুধু “আল্লাহু আকবার” বলবে। এটাই মুস্তাহাব। খুতবার সময় বা খুতবার মাঝে তাকবীরে তাশরীক বলবে না। হ্যাঁ, ঈদের নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে তাকবীরে তাশরীক একবার বলবে। (আদুররুল মুখতার-২/১৭৫)

১২. নামাযের পর ঈদের দুই খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। যদি খুতবা শোনা না যায়, তাহলে চুপচাপ বসে থাকবে। অনেক লোক সালামের পর খুতবা না শুনেই চলে যায়। যা সুন্নাতের খেলাফ। (আদুররুল মুখতার-২/১৫৯)

১৩. খুতবার মধ্যে মুসল্লীদের কথা বার্তা বলা নিষেধ। এমন কি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চারিত হলে মুখে দরুদ পড়া নিষেধ। তবে অন্তরে পড়তে পারবে। তেমনিভাবে খুতবার মধ্যে দান বাব্ব বা রুমাল চালানোও নিষেধ এবং গুনাহের কাজ। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-১০১৪০, আদুররুল মুখতার-২/১৫৯)

১৪. উভয় খুতবা শেষ হলে ঈদের নামাযের সকল কাজ শেষ হল, এরপর ঈদের আর কোন কাজ বাকী নাই। সুতরাং খুতবা শেষ হলে সকলেই নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে। বর্তমানে দেখা যায় যে ঈদের খুতবার পরে লম্বা মুনাযাত হয়। এটা মুস্তাহাব নয়। তারপর লোকদের মধ্যে মু‘আনাকা বা কোলাকুলীর ভীড় লেগে যায় অথচ ঈদের সুন্নাতের মধ্যে কোলাকুলী করার কথা নাই। সুতরাং এটা ঈদের সুন্নাত মনে করা ভুল। বরং এটা দেখা-সাক্ষাতের সুন্নাত। কোন ভাইয়ের সাথে অনেক দিন পরে সাক্ষাত হলে প্রথমে সালাম বিনিময় করবে। তারপর মুসাফাহা করবে। তারপর কোলাকুলী করবে। সুতরাং ঈদের নামাযের পূর্বে সাক্ষাত হলে তখনই এটা সেরে ফেলবে। আর যদি ঈদের খুতবার পর এরূপ কারোর সাথে সাক্ষাত হয় তাহলে কোলাকুলী করবে। এরূপ করবে না যে, সাক্ষাত হলো নামাযের পূর্বে কিন্তু কোলাকুলী করা হলো খুতবার পরে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৬/৩৮১, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৫৪, সিলসিলাতুল আদাবিল ইসলামিয়াহ (মাকতাবায়ে শামেলা থেকে))



ସମାପ୍ତ